তফসীরে নূরুল কোরআন

পচিশ পারা

২৫

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

পচিশতম খন্ড

https://t.me/islaMic_fdf

তফসীরে নূরুল কোরআন

পঁচিশতম খন্ড

২৫

পঁচিশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্ণরস, সদস্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড, সাবেক ইমাম ও খতীব, লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

পঞ্চম প্রকাশ	ঃ	রমযান-১৪৪৩ হিঃ এপ্রিল-২০২২ চৈত্র-১৪২৮
প্রকাশক	ঃ	মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান
সর্বস্বত্ব	ঃ	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মুদ্রণে	ঃ	নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০
হাদিয়া	ঃ	৩০০.০০

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

আন-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১৩০১৪৮৮৯

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

Tafseer-e Nurul Quran (25): By Hazrat Moulana Mohammed Aminul Islam (R). Published by Al-Balag Publications. 12/17, Sir Sayed Ahmed Road. Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207, Mobile : 01713014889
Price : 300.00

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অনন্ত অসীম শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের ২৫তম খন্ড (২৫ পারা) পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহি বিজামিয়ী মাহামিদিহী, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!

অগণিত দরূদ ও সালাম প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত, যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব, যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক, যাঁর আদর্শ মহান, সার্বজনীন, যাঁর প্রতিটি কথা রয়েছে সংরক্ষিত, যিনি ছিলেন জীবন্ত কোরআন, তাঁর প্রতি এমন দরুদ যা সর্বদা অব্যাহত থাকে।

পবিত্র কোরআন আল্লাহ তাআলার পাক কালাম। মানবতার উৎকর্ষ সাধনের এবং বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যেই এ মহান গ্রন্থ বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কোরআন নিজেই তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করছে, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ পবিত্র কোরআন হলো শেফা ও রহমত। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ. (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২)

'আমি অবতীর্ণ করি কোরআন যা মোমেনদের জন্য (শেফা) আরোগ্য ও রহমত'।

পবিত্র কোরআন হলো মোমেনদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ. (সূরা নমল ঃ ৭৭)

'নিশ্চয় এই কোরআন মোমেনদের জন্যে হেদায়েত এবং রহমত'। আরো এরশাদ হয়েছেঃ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (সূরা বাকারা : ২)

'যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে তাদের জন্যে পবিত্র কোরআন হলো পথ প্রদর্শক'।

আর পবিত্র কোরআন শুধু যে মোমেন এবং মুত্তাকীণদের জন্যেই হেদায়েত এবং রহমত তাই নয়; বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে হলো নসিহত। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ. (সূরা তাকভীর : ২৭)

'আর কোরআন তো শুধু নসিহত সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে'।

অতএব, সমগ্র বিশ্ববাসীর কর্তব্য হলো পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করা এবং তার বিধি-নিষেধের বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা। এতেই রয়েছে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

মুসলিম জাতি যতদিন এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছে তথা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছে ততদিন বিশ্বের নেতৃত্ব মুসলিম জাতির হাতেই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যেদিন মুসলিম জাতি এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে তথা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়েছে, সেদিন থেকেই এ জাতির অবনতি শুরু হয়েছে। কথাটি অপ্রিয় হলেও সত্য, এজন্যেই মরমী কবি বলে বলেছেন ঃ

وہ زمانے مین معزز تھے مسلمان ہوکر ☆ اور تم خوار ہوئے تارک قران ہوکر

'তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ মুসলমান হিসেবে ছিলেন সম্মানিত, আর তোমরা পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে বাদ দিয়ে হয়েছ অপমানিত'।

পবিত্র কোরআন মুসলিম জাতিকে তার দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং পৃথিবীতে মুসলিম জাতির আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও তার উচ্চ মর্যাদার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ. (সূরা আলে এমরান ঃ ১১০)

'হে মুসলিম জাতি! তোমরাই উত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির উপকারার্থেই তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন করবে'।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (পূর্বোক্ত ঃ ১০৪)

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা দরকার যারা মানুষকে কল্যাণকর কাজের দিকে আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (যারা এ দায়িত্ব পালন করবে) তারাই হবে সফলকাম'।

মানব জাতির উন্নতির মূল ভিত্তি হলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক ও বিশ্বনবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান। পক্ষান্তরে, মানবতার চরম অধঃপতন হলো পৌত্তলিকতা এবং নাস্তিকতা। এজন্যে পবিত্র কোরআনে তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়নের এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর রেসালতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধনের পথের প্রধানতম অন্তরায় অংশীবাদ ও ভোগবাদকে পরিহার করার বিশেষ তাগিদ করে। এটিই পবিত্র কোরআনের মূল শিক্ষা। এতদ্ব্যতীত, সমস্ত আসমানী কিতাবে রয়েছে এ সম্পর্কে বিশেষ তাগিদ এবং সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের উম্মতকে ইসলামের মূল শিক্ষার দিকে আহ্বান করেছেন, পবিত্র কোরআন তাঁদের সে আহ্বানের ইতিহাস বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছে। হযরত নূহ (আ.) ঘোষণা করেছিলেনঃ

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. (সূরা ইউনুস ঃ ৭২)

'আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হই'।

আর হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছেনঃ

وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. (সূরা আলে এমরান ঃ ১০২)

'অতএব, তোমরা প্রকৃত মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করোনা'।

আর হযরত ইউসুফ (আ.) দোয়া করেছিলেনঃ

تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ. (সূরা ইউসুফ ঃ ১০১)

'হে আল্লাহ! মুসলমান অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দিও, আর নেককারদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভূক্ত করো'।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আল্লাহ পাক জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করেছেন। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ. (সূরা আলে এমরান ঃ ১৯)

'নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ পাকের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান'। আর এ জীবন-বিধানের পরিপূর্ণতার কথাও পবিত্র কোরআনে এভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ..... (সূরা মায়েদা ঃ ৩)

'আজকের দিনে আমি পরিপূর্ণ করেছি তোমাদের জীবন বিধানকে এবং সম্পূর্ণ করেছি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে জীবন বিধান রূপে পছন্দ করেছি'। শুধু যে ইসলাম আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দনীয় এবং একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান তাই নয়; বরং ইসলামের প্রাধান্য এবং বিজয়ও অবশ্যম্ভাবী।

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ.....عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ. (সূরা তওবা ঃ ৩৩)

'তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত এবং সত্য দ্বীন নিয়ে যেন দ্বীন ইসলামকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট'।

ইতিহাস সাক্ষী! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র ও বরকতময় যুগ থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের সোনালী যুগ পর্যন্ত ইসলাম সারা বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এমনকি এরপর উমাইয়া এবং আব্বাসীয়া যুগেও ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। যখন ইসলাম স্পেনে পৌঁছেছিল, উপমহাদেশে এসেছিল, এক কথায় আলজেরিয়া থেকে সুদূর ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলাম তার স্থান করে নিয়েছিল, মানব-মনে অভূতপূর্ব ইনকেলাব এনেছিল, বিশ্বের চেহারা বদলে দিয়ে বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াভিভূত করেছিল, জুলুম অত্যাচার, অন্যায় অনাচার, অবিচার এবং ব্যাভিচার বিদায় করেছিল। উদারতা মহানভবতা, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করেছিল, কায়েম করেছিল বিশ্ব শান্তি, আর তা সম্ভব হয়েছিল পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ-সুন্দর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার কারণে।

পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার কারণে মুসলিম জাতি যে ঈমানী শক্তি লাভ করেছিল তার মোকাবেলা করা তদানীন্তন পৃথিবীর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। তাই

ইয়ারমুকের রণাঙ্গনে ২ লক্ষ ৪০ হাজার পারস্য সৈন্যকে ৪০ হাজার মোমেনের হাতে পরাজিত হতে হয়েছে। কাদেসিয়ার রণাঙ্গনে মাত্র ৮ হাজার মুসলমানের নিকট ৬০ হাজার কাফেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

এসবই ছিল আল্লাহ পাকের রহমত, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণের ফলশ্রুতি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণের বরকত। ৭০০ বছর স্পেনে মুসলিম জাতি শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে।

ای گلستاں اندلس وہ دن یاد ہیں تجہ کو ☆ تہا تیرے ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا

'স্পেনের বাগান! তোমার কি মনে আছে? আমাদের সেই হারানো দিনগুলোর কথা'?

কিন্তু আজ সেই ঈমানী শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ছিল পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (সূরা আলে এমরান ঃ ১০৩)

'এবং তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে একত্রিত হয়ে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, আর পরস্পর বিভক্ত হয়োনা'। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ (সূরা আনফাল : ৪৬)

'আর তোমরা পরস্পর কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়োনা তাহলে তোমরা সাহস হারা হয়ে যাবে, তোমাদের দাপট কমে যাবে'।

কিন্তু মুসলিম জাতি কি কোরআনের এ নির্দেশে মেনে চলছে? বরং বর্তমান যুগে মুসলিম জাতি শুধু দ্বিধা বিভক্ত নয়; বরং কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত, শুধু তাই নয়, বরং পরস্পর স্থান-কাল বিশেষে যুদ্ধ রতও হয়, এর পরিণাম ভয়াবহ।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন পরিপূর্ণভাবে জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে হচ্ছে তা হয়ত অনুসন্ধান করেও পাওয়া যাবেনা। কী ব্যক্তিগত জীবনে কী সমাজ জীবনে, কী জাতীয় জীবনে বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন কোথায়? এমনকি পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তাও কোন কোন মুসলিম অনুভব করেনা।

বস্তুতঃ পৃথিবীতে সব কিছুরই সীমা আছে, কিন্তু আমাদের গাফলতির কোন সীমা নেই, আমরা সকলেই গাফলতের আবর্তে নিপতিত।

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا ☆ کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

হায় আক্ষেপ! কাফেলার সকল সম্পদ লুণ্ঠিত, এমনকি কাফেলার সদস্যগণ তাদের ক্ষতির অনুভূতি থেকেও বঞ্চিত। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন তো দূরের কথা পবিত্র কোরআনকে শুদ্ধ করে পাঠ করার প্রয়াসও আজ অনুপস্থিত। এ দূরবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমাদের সম্মুখেই উপস্থিত।

পূর্বে যাদের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব ছিল, আজ তারাই মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করতে আসে।

مین تجہ کو بتاتا ہون تقدیر امم کیا ہے ☆ شمشیر وسنان اول طاوس ورباب اخر

'আমি কি বলব তোমায় জাতিগুলোর উত্থান পতনের ইতিহাস'

উত্থান কালে তাদের হাতে থাকে তরবারী আর বর্ষা, পতন কালে তাদের হাতে দেখা যায় হারমোনিয়াম আর তবলা'।

তবে নিরাশ হওয়া উচিত হবে না, পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে পথ-নির্দেশ করেছেঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ. (সূরা যুমার : ৫৩)

'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা'।

বস্তুতঃ প্রকৃত মোমেন কোন দিনও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়না। তত্ত্বজ্ঞানী মরম কবি তাই বলেছেনঃ

جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہین ☆ ادہر نکلے ادہر ڈوبے ادہر نکلے ادہر ڈوبے

পৃথিবীতে মুসলিম জাতি সূর্যের ন্যায় বেঁচে থাকে। সূর্য একদিকে উদিত হয়, আর অন্যদিকে অস্তমিত হয়। এরপর পুনরায় সে অন্য দিক থেকে উদিত হয়। মুসলিম জাতির অবস্থাও অনুরূপ'। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

(সূরা আলে এমরান : ১৩৯)

'আর তোমরা ভীত সন্ত্রস্থ হয়োনা, চিন্তিতও হয়োনা, অবশেষে তোমরাই হবে বিজয়ী যদি প্রকৃত মোমেন হও'।

এ আয়াতে মুসলিম জাতির বিজয়ের তথা হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে একটি শর্তে, আর তা হল প্রকৃত মোমেন হওয়া। এজন্য প্রয়োজন হল পবিত্র কোরআন পাঠ করা, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়নে আত্ম নিয়োগ করা এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করা, এটি নিঃসন্দেহে মুসলিম জাতির পবিত্র কর্তব্য।

আর এ কর্তব্য পালনের লক্ষ্যেই আজ থেকে ১৫ বছর পূর্বে তফসীরে নূরুল কোরআন রচনা শুরু করি।

আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের, যিনি এ মহান গ্রন্থের পঁচিশতম খন্ড পেশ করার তওফিক দিয়েছেন, তাঁর মহান দরবারেই পেশ করি সেজদায়ে শোকরানা। এ বরকতময় গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তওফিকের জন্য তাঁর-ই সমীপে বিনীত আরজী পেশ করি, হে আল্লাহ! কবুল কর অধমের এ সাধনা, আমীন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (সূরা বাকারা : ১২৭)

وصلي الله تعالي علي خير خلقه محمد وعلي اله واصحابه اجمعين

বিনীত
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.)
২৭/৬/৯৬
গ্রন্থকার

সূচিপত্র

বিষয় :	পৃষ্ঠা :
তফসীরুল কোরআন	১৩
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১৩
শুধু আল্লাহ পাকই জানেন কেয়ামত কবে হবে?	১৩
পবিত্র কোরআনে কেয়ামতের বর্ণনা	১৪
মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি	১৮
মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য	১৮
তফসীরুল কোরআন	২০
সূরা শুরা	২৫
সূরায়ে শুরা প্রসঙ্গে :	২৬
নামকরণ	২৬
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	২৬
তফসীরুল কোরআন	২৬
পরম করুণাময়ের দয়া	২৮
তফসীরুল কোরআন	৩২
প্রিয়নবী (দঃ)-এর বৈশিষ্ট্য	৩৪
তফসীরুল কোরআন	৩৯
তিনি অতুলনীয়	৩৯
আল্লাহ পাকের কয়েকটি গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য	৪১
মানব জাতির কর্তব্য	৪২
দ্বীন এক, অভিন্ন	৪২
উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতি বিশেষ দান	৪৩
মুসলমানদের ঐক্য অক্ষুন্ন রাখ	৪৪
প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা	৪৪
দশটি বিষয়ের আদেশ	৪৮
তফসীরুল কোরআন	৫০
পরম দয়ালু আল্লাহ পাক	৫৪
আ'মালুল কোরআন	৫৫
তফসীরুল কোরআন	৫৭
দুনিয়ার প্রাধান্য দোযখের শাস্তির কারণ হয়	৫৭
আয়াতের মর্মকথা	৫৮
তফসীরুল কোরআন	৬২
আয়াতের মর্মকথা	৬৬

তফসীরুল কোরআন..... ৭১
তওবার তাৎপর্য..... ৭২
ঈমানদার ও নেককারদের পুরস্কার ঘোষণা..... ৭৩
শানে নুযুল ৭৫
আসহাবে সুফফা..... ৭৫
প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা..... ৭৬
প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য..... ৭৭
কৃতকর্মের পরিণতি..... ৭৯
তফসীরুল কোরআন..... ৮২
শানে নুযুল ৮৩
তফসীরুল কোরআন..... ৮৭
প্রিয়নবী (দঃ)-এর ক্ষমা এবং ঔদার্য্য..... ৮৯
সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য..... ৯১
তফসীরুল কোরআন..... ৯৪
আয়াতের মর্মকথা..... ৯৬
তফসীরুল কোরআন..... ৯৮
আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর..... ৯৮
প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা..... ৯৯
মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য..... ১০০
সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের..... ১০১
শানে নুযুল ১০২
ওহী প্রসঙ্গে–..... ১০৩
নবুওয়্যত ও ওহীর তাৎপর্য..... ১০৪
তফসীরুল কোরআন..... ১১২
সূরা যুখরুফ..... ১১৫
সূরা যুখরুফ প্রসঙ্গে ১১৬
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক..... ১১৬
আ'মালুল কোরআন..... ১১৭
স্বপ্নের তা'বীর ১১৭
তফসীরুল কোরআন..... ১১৭
পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম ১১৭
প্রিয়নবী (দঃ)- কে সান্ত্বনা..... ১২০
তফসীরুল কোরআন..... ১২৩
চির বিদায়ের সফরকে বিস্মৃত হয়োনা ১২৪
ভ্রমণের দোয়া..... ১২৪
তফসীরুল কোরআন..... ১২৮
প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা..... ১৩০

তফসীরুল কোরআন ১৩২
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৩৩
তফসীরুল কোরআন ১৩৭
শানে নুযুল ১৩৭
দুনিয়ার হাকীকত ১৪০
তফসীরুল কোরআন ১৪৪
আয়াতের মর্মকথা ১৪৫
প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা ১৪৬
তফসীরুল কোরআন ১৪৯
আয়াতের মর্মকথা ১৫০
তফসীরুল কোরআন ১৫৭
তফসীরুল কোরআন ১৬১
কেয়ামতের আলামত ১৬৬
তফসীরুল কোরআন ১৭০
তৌহীদের ঘোষণা ১৭০
পরস্পরের বন্ধুত্ব উপকারী হওয়ার পূর্বশর্ত ১৭২
তফসীরুল কোরআন ১৮০
তফসীরুল কোরআন ১৮৩
শানে নুযুল ১৮৩
সূরা দুখান ১৯০
তরজমা ১৯০
সূরা দুখান প্রসঙ্গে ১৯০
এ সূরার ফজিলত ১৯১
এ সূরার আমল ১৯১
পুর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ১৯১
তফসীরুল কোরআন ১৯১
মোবারক রজনী ১৯২
তফসীরুল কোরআন ১৯৮
কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী ২০০
কেয়ামতের আলামত ২০১
তফসীরুল কোরআন ২০৪
কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা ২০৪
তোমরা আল্লাহ পাকের বিদ্রোহী হয়োনা ২০৬
তফসীরুল কোরআন ২১০
মোমেনের মৃত্যুতে আসমান জমীনের ক্রন্দণ ২১১
বনী ইসরাঈল জাতির নাজাত ২১২
তফসীরুল কোরআন ২১৬

চূড়ান্ত ফয়সালা হবে কেয়ামতের দিন..... ২১৭
শানে নুযুল ২১৮
কাফেরদের শাস্তির বিবরণ ২১৮
তফসীরুল কোরআন..... ২২০
জান্নাতের সুখ-সামগ্রী ২২১
জান্নাতবাসীদের পোষাক..... ২২২
হুর প্রসঙ্গে..... ২২২
জান্নাতীগণ চিরঞ্জীব হবে..... ২২৩
জান্নাতীগণ চিরদিন সুস্থ থাকবে..... ২২৪
প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা..... ২২৫
সূরা জাসিয়াহ..... ২২৭
সূরা জাসিয়াহ প্রসঙ্গে ২২৮
নামকরণ..... ২২৮
সূরা জাসিয়ার আমল..... ২২৮
স্বপ্নের তা'বীর ২২৮
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক..... ২২৮
তফসীরুল কোরআন..... ২২৯
সৃষ্টি জগতে স্রষ্টার নিদর্শন..... ২৩১
তফসীরুল কোরআন..... ২৩৪
শানে নুযুল ২৩৪
কাফেরদের গন্তব্যস্থল-দোযখ..... ২৩৬
তফসীরুল কোরআন..... ২৩৮
শানে নুযুল ২৩৯
নেক আমলই উপকারী হবে..... ২৪২
তফসীরুল কোরআন..... ২৪৫
মানব-জীবনে শরীয়তের বিধানের প্রয়োজনীয়তা..... ২৪৭
পরম সাফল্য লাভের চাবিকাঠি ২৪৮
শানে নুযূল ২৪৯
মোমেন ও কাফেরের পরিণতি এক হতে পারেনা..... ২৪৯
তফসীরুল কোরআন..... ২৫২
শানে নুযুল ২৫৫
তফসীরুল কোরআন..... ২৫৭
নিখিল বিশ্বের প্রভূত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই..... ২৫৮
তফসীরুল কোরআন..... ২৬২
কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা..... ২৬৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

পঁচিশতম খন্ড

পঁচিশ পারা

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ
أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ
يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ
مَحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ
فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾

তরজমা

(৪৭) কেয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে, তাঁর অজান্তে কোন ফল আবরণ থেকে বের হয়না এবং কোন নারী গর্ভধারণ করেনা, প্রসবও করেনা (এসব কিছু) তাঁর জ্ঞাতসারেই হয়। আর যেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে বলবেন, '(আজ) আমার শরীকরা কোথায়'? তারা বলবে, 'আমরা আপনার দরবারে এ আরজী পেশ করছি, আমাদের মধ্যে (এখন) কেউ একথা স্বীকার করেনা'।

(৪৮) পূর্বে তারা যাদের উপাসনা করতো তারা সকলেই উধাও হয়ে যাবে এবং তারা উপলব্ধি করবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই।

(৪৯) ধন-সম্পদের প্রার্থনায় মানুষ ক্লান্তি বোধ করেনা, কিন্তু যখন কোন দুঃখ-দৈন্য তাকে স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যে ভাল কাজ করে তা সে তারই উপকারার্থে করে, আর যে মন্দ কাজ করে তার শোচনীয় পরিণতি কেয়ামতের দিন তাকেই ভোগ করতে হবে, তখন কেউ প্রশ্ন করলো, কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিন কবে আসবে? তারই জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ

'কেয়ামত সম্পর্কীয় জ্ঞান শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে'।

অর্থাৎ কেয়ামত কবে হবে? কোন্ দিন হবে? কোন্ মুহূর্তে হবে তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত কারোই কোন জ্ঞান নেই, যে যত বড় জ্ঞানী-গুণীই হোক না কেন, এ প্রশ্নের জবাবে শুধু বলবে আমি জানিনা, এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ কিছুই জানে না। মক্কার কাফেররা প্রায়ই বিদ্রুপ করে এ প্রশ্ন করতো, যে কেয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে ভয় দেখানা হয় সে কেয়ামত কবে আসবে? তারই উত্তরে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে, এ সম্পর্কে আর কেউ কিছু বলতে পারেনা।[১]

শুধু আল্লাহ পাকই জানেন কেয়ামত কবে হবে?

মূলতঃ এ আয়াতে আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ জ্ঞানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁর জ্ঞান সৃষ্টি জগতের সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। পৃথিবীতে যা কিছু আছে, যা কিছু হয়েছে, যা কিছু হচ্ছে এবং যা কিছু হবে সবই তিনি জানেন, এমনিভাবে কেয়ামত সম্পর্কে শুধু তিনিই জানেন।[২]

আল্লাহ পাকের অজানা কিছুই নেই, সবই তাঁর নখদর্পণে, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ

কোন ফল বা ফসল কখন তার অঙ্কুর থেকে বের হয়, কোন নারী কখন গর্ভ ধারণ করে, কখন তার প্রসবকাল আসবে এসব কিছু আল্লাহ পাক জানেন, এমনিভাবে কেয়ামত

১. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১৩৬
২. তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৬৩

কবে আসবে সে সম্পর্কেও এক আল্লাহ পাকই অবগত। কোন মানুষ বা কোন ফেরেশতা বা কোন সৃষ্টি এ সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাই কেয়ামত অনিবার্য সত্য, কেয়ামত আসবে এবং অবশ্যই আসবে এ বিশ্বাস রাখা এবং সেদিনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করাই হলো একান্ত করণীয় কাজ।[১]

কেয়ামতের দিন তারিখ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা একথার প্রমাণ নয় যে, কেয়ামত সংঘটিত হবেনা। যেভাবে মানুষের এ জীবনের সময় নির্দিষ্ট, ঐ নির্দিষ্ট সময় ফুরিয়ে গেলে মানুষকে চির বিদায় গ্রহণ করতে হয়, তেমনি এ পৃথিবীর সময়ও নির্দিষ্ট, যখন এ সময় শেষ হয়ে যাবে তখন এ পৃথিবীও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এ পৃথিবী থেকে কোন ব্যক্তির বিদায় গ্রহণকে মৃত্যু বলা হয়, আর সমগ্র বিশ্বের পরিসমাপ্তিকে বলা হয় কেয়ামত।

সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে তাই বিশ্ব সৃষ্টিরও লয় আছে, যেদিন এ পৃথিবী লয়ঃ প্রাপ্ত হবে সেদিনই হবে কেয়ামত, তবে কেয়ামতের সেদিন কবে আসবে তা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এমনকি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ফেরেশতাদের সর্দার হযরত জীবরাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেয়ামত কবে আসবে? তিনি জবাবে বলেছিলেন, "জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী জানেনা"। অর্থাৎ এ সম্পর্কে এক আল্লাহ পাকই জানেন, আর কেউ নয়।

পবিত্র কোরআনে কেয়ামতের বর্ণনা

কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا (সূরা নাজেআত ঃ ৪৪)

'কেয়ামত কবে হবে? এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে'। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ (সূরা আরাফ ঃ ১৮৭)

'কেয়ামতের সময় সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ অবগত নয়'।[২] এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

(সূরা বাকারা ঃ ২৮১)

'আর তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে, এরপর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। আর তাদের প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবেনা'।

---

১. ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৬২৫

২. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-২

অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ○ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ.

(সূরা মুমেনুন ঃ ১৫-১৬)

'এ জীবনই শেষ নয়; এ জীবনের পর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে, এরপর তোমাদেরকে অবশ্যই কেয়ামতের দিন হাযির করা হবে'।

এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا (সূরা মরয়ম ঃ ৯৫)

'আর কেয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে একা একা'।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

(সূরা আলে এমরান ঃ ১৮৫)

'প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, আর তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল কেয়ামতের দিন পুরোপুরিই দেয়া হবে, এরপর যে ব্যক্তি দোযখ থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে সে-ই সফলকাম হবে, আর দুনিয়ার জীবন তো ধোকা এবং প্রতারণার বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নয়'।

কেয়ামত সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ○ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. (সূরা মুতাফফিফীনঃ আয়াত-৪-৬)

'তারা কি চিন্তা করেনা যে তারা পুনরুত্থিত হবে এক মহা দিনে, যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ বিশ্ব প্রতিপালকের দরবারে'। এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ. (সূরা ইনফিতারঃ ১৭-১৯)

'কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান? আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান? সেদিন একের অপরের জন্যে কিছু করার সামর্থ থাকবেনা, আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব থাকবে এক আল্লাহ পাকের'।

কেয়ামতের দিনের সংকটময় মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এমনকি, একান্ত আপনজনও কোন প্রকার সাহায্য করতে সক্ষম হবেনা, বরং তারা একে অন্যকে দেখলে পলায়ন করবে। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ○ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ○ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ○ (সূরা আবাসা ঃ ৩৪-৩৭)

'সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা থেকে, তার মাতা এবং তার পিতা থেকে, তার পত্নী এবং সন্তান থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে'।

পবিত্র কোরআনের সূরা হজ্বের প্রারম্ভে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতার বিবরণ এভাবে স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ○ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ. (আয়াত : ১)

'হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, নিশ্চয় কেয়ামতের ভূ-কম্পন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার, যেদিন তোমরা তাকে দেখবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদানকারিনী ভুলে যাবে তার স্তন্যপায়ী শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে এবং তুমি মানুষকে দেখতে পাবে নেশাগ্রস্ত সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়; কিন্তু আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন'।

এ আয়াত সমূহ দ্বারা কেয়ামত সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায় এবং আত্ম সংশোধনের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট।[১]

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا. (সূরা নাবা : ৩৯)

'ঐ দিনটি (কেয়ামতের দিন) ধ্রুব সত্য, অতএব যার ইচ্ছা সে যেন তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করে'।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِيْ ۙ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ

'আর যেদিন তিনি মুশরেকদেরকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, আমার শরীকরা কোথায়? তারা বলবে, আমরা তো তোমার সমীপে আরজ করেছি যে, আমাদের মধ্যে কেউ একথা স্বীকার করেনা'।

---

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২০২-০৬ এবং খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৮৬-১৯০, খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-১৮৫ ও খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১২৮-১৩২

যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করতো না, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করতো তাদেরকে কেয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টিজগতের সম্মুখে ভৎর্সনা করে জিজ্ঞাসা করা হবে, দুনিয়ার জীবনে যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, যাদের পূজা-অর্চনা করতে তারা এখন কোথায়?

মুশরেকরা তখন জবাবে বলবে, আমরা পূর্বেই আরজ করেছি আমাদের মধ্যে কেউ আর এখন শেরকের কথা স্বীকার করেনা, শেরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়না। অর্থাৎ মুশরেকরা যখন দোযখের আযাব স্বচক্ষে দেখবে তখন শেরকের কথা অস্বীকার করবে।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের 'শহীদ' শব্দটিকে 'শাহেদ' অর্থে গ্রহণ করে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ আমাদের মাঝে শেরকে বিশ্বাস করে এমন লোক দেখতে পাইনা, সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেছে, শেরকের দাবীদার বা শেরকে বিশ্বাসী এখন আর কেউ নেই কেননা সত্য সুস্পষ্ট হয়েছে, প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হয়েছে, পরকালীন জীবনের হিসাব-নিকাশের কথা যারা দুনিয়াতে অস্বীকার করতো তারা আজ হিসাব-নিকাশের মুখোমুখি হয়েছে, বাস্তবের কষাঘাত তাদেরকে সত্য কথা বলতে বাধ্য করেছে, তাই সেদিন তারা বলবে, আমাদের মধ্যে শেরকে বিশ্বাসী কেউ নেই।[১]

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيصٍ

'ইতিপূর্বে তারা যাদের ডাকত তারা উধাও হয়ে গেছে এবং তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছে যে তাদের নাজাত নেই'।

কাফের মুশরেকরা আল্লাহ পাকের এবাদতের স্থলে যাদের উপাসনা করতো, যাদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল যে দুর্দিনে তারা কাজে লাগবে, সে উপাস্যরা সেদিন উধাও হয়ে যাবে। তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে, আজ আল্লাহ পাকের আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায়ই নেই। কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে কথাটি এভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

'সেদিন পাপীষ্ঠরা দোযখকে দেখবে এবং একথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে যে তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে, আর দোযখ থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায়ই নেই'।[২]

لَا يَسْئَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ

'উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় কল্যাণের প্রার্থনায় মানুষ কখনো ক্লান্তি বোধ করেনা, আর যদি কোন দুঃখ তাকে স্পর্শ করে তবে সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে'।

---

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩০০
তফসীরে কবীর খ্‌ড-২৭, পৃষ্ঠা-১৩৬-৩৭

২. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-২

মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি

এ আয়াতে মানুষের বিচিত্র প্রকৃতির একটি রূপ প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ যখন একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে তখন তার লোভ বেড়ে যায়, সে অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে এজন্যে প্রার্থনা করতে থাকে, এ পর্যায়ে কোন সংকোচ বা ক্লান্তিবোধ করেনা, সারা পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মালিক হলেও তার "আরো চাই" ভাব কমেনা, কোন অবস্থাতেই সে পরিতৃপ্তি লাভ করেনা, কিন্তু যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, কোন দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করে তখন সে হতাশ হয়ে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে।

মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য

আলোচ্য আয়াতের الانسان শব্দটি সম্পর্কে তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো কাফের, অকৃতজ্ঞ মানুষ, লোভ-লালসায় যার মন পরিপূর্ণ, আর ঐ স্থলে خير শব্দটির অর্থ হলো ধন-সম্পদ, স্বাস্থ্য এবং জাগতিক উন্নতি।

অতএব, আয়াতের মর্মকথা হলো যারা কাফের, যারা অকৃতজ্ঞ তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো এই, সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ পাওয়ার পরও তারা তুষ্ট হয়না অথচ তাদেরকে কোন প্রকার দুঃখ স্পর্শ করলেই তারা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ নিরাশ, ভগ্ন-চিন্তা, দারুণ ক্ষোভ তাদেরকে পেয়ে বসে।

পক্ষান্তরে, মোমেনের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, সর্বাবস্থায় মোমেন থাকে আল্লাহ পাকের প্রতি আস্থাশীল, আল্লাহ পাকের রহমতের আশায় আশান্বিত, আল্লাহ পাকের প্রতি সে পূর্ণ ভরষা রাখে, মোমেন যদি নেয়ামত লাভ করে তবে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার হয়, করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে ওঠে, আর যদি কোন দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করে তখন সে আশা করে যে, আল্লাহ পাক এজন্যে সওয়াব দান করবেন, তাই সে সবর অবলম্বন করে। কিন্তু যারা তৌহীদে বিশ্বাসী নয়, যারা আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করে, তারা কখনো মনের শান্তি লাভ করেনা, মনের শান্তি লাভ হয় মনের মালিক আল্লাহ পাকের স্মরণে, তাঁর আদেশ পালনে। এর কোন বিকল্প নেই।

وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ
مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّلَئِنْ
رُّجِعْتُ إِلٰى رَبِّيْٓ إِنَّ لِيْ عِنْدَهُ لَلْحُسْنٰى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَآ
أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهٖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾
سَنُرِيْهِمْ ءَايٰتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَآ
إِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ أَلَآ إِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٤﴾

তরজমা

(৫০) আর যদি তার দুঃখ স্পর্শ করার পর আমি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তবে সে বলে, এটি তো আমার প্রাপ্যই, আর আমি মনে করিনা যে কেয়ামত আসবে। আর যদি আমার প্রতিপালকের নিকট আমি ফিরেও যাই তবে তাঁর নিকট তো আমার জন্যে কল্যাণই থাকবে। (আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ) আমি কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবো আর তাদেরকে এক কঠিনতম আযাব ভোগ করাবো।

(৫১) আর আমি যখন মানুষকে নেয়ামত দান করি তখন সে (আমার দিক থেকে) বিমুখ হয় এবং দূরে সরে যায়। আর যখন তার কোন অমঙ্গল ঘটে তখন সে দীর্ঘ মোনাজাতে রত হয়।

(৫২) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি এই কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং এরপরও তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?

(৫৩) অচিরেই আমি পৃথিবীতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও আমার নিদর্শন সমূহ তাদেরকে দেখাব। শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটিই সত্য। (হে রসূল!) আপনার সত্যায়নের জন্যে এটি কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার প্রতিপালক সব বিষয়ে অবগত।

(৫৪) জেনে রাখ, এরা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে সন্দিহান, জেনে রাখ যে আল্লাহ পাক সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের বিচিত্র চরিত্রের কথা বলা হয়েছে যে, মানুষকে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে যায়, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ

মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, যদি আল্লাহ পাক মানুষের বিপদ দূরীভূত করে তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন সে অকৃতজ্ঞ হয়ে বলে–

لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ

আমি যা পেয়েছি তা-তো আমার প্রাপ্য এবং ন্যায্য হক্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। এভাবে সে আল্লাহ পাকের দয়া মায়ার কথা ভুলে যায়। সে মনে করে, আমার গুণ-জ্ঞানের কারণেই আমি সব কিছু পেয়েছি। আর আল্লাহ পাকেরই দেয়া আরাম-আয়েশে মুগ্ধ মত্ত হয়ে থাকে। সে ভাবে তাকে প্রদত্ত নেয়ামত চিরস্থায়ী হবে, পুনরায় দুঃখের দিন আসতে পারে একথা সে চিন্তা করতেও প্রস্তুত নয়। সে একথাও বলে,

وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ

'আর আমি মনে করিনা যে কেয়ামত কায়েম হবে'। এভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত হবে।

وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْٓ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ

'আর যদি আমার প্রতিপালকের নিকট আমি ফিরেও যাই তবে তাঁর নিকট তো আমার জন্যে কল্যাণই থাকবে'। অর্থাৎ যদি ঘটনাক্রমে কেয়ামত সত্যও হয় তবে আমার অবস্থা এখানকার তুলনায় সেখানে ভালই হবে, কেননা আল্লাহ পাকের দরবারে অপ্রিয় হলে তিনি কি আমাকে দুনিয়াতে এত নেয়ামত দান করতেন? যেহেতু তিনি দুনিয়াতে আমাকে তাঁর দানে ধন্য করেছেন, তাই আখেরাতেও তিনি আমাকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেবেন না।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের নেয়ামত লাভ করে অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয়ে মানুষ এভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ পাককে ভুলে যায়, এমনকি কেয়ামতকে পর্যন্ত অস্বীকার করে, তার অর্থ-সম্পদই তার জন্যে কাল হয়ে

দাঁড়ায়, তার জীবনের আরাম-আয়েশ, আনন্দ-উল্লাস তার ধ্বংস ডেকে আনে। সে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তার অন্যায়-অসুন্দর কীর্তিকলাপ তার দৃষ্টিতে অতি সুন্দর এবং যুক্তিযুক্ত হয়ে দেখা দেয়। পাপীষ্ঠ লোকদের এটিই হল ধৃষ্টতা যে, কুফর শেরক, দম্ভ অহমিকা এবং অকৃতজ্ঞতা সত্বেও সে আখেরাতে সুখ-শান্তি লাভ করবে বলে আশা করে। কিন্তু যেদিন তাদেরকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির করা হবে এবং তাদের কীর্তিকলাপ সম্মুখে তুলে ধরা হবে, তখন তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে যে, সত্যিই তারা ভাগ্যাহত। আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে পাপীষ্ঠ লোকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ

'আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবো আর তাদেরকে কঠিনতম আযাব ভোগ করাব'।

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ. (সূরা ইনফিতার ঃ ৫)

'তখন প্রত্যেকে জানবে যে, সে কী করে পাঠিয়েছে আর কী পেছনে রেখে এসেছে'।

মানুষকে কেয়ামতের দিন শুধু যে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে তাই নয়; বরং তার যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব হবে, ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি হবে। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ○ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. (সূরা গাশিয়া ঃ ২৫-২৬)

'নিশ্চয় আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, এরপর নিশ্চয় তাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ আমারই কাজ'।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ

'আর আমি যখন মানুষকে নেয়ামত দান করি, তখন সে (আমার দিক থেকে) বিমুখ হয় এবং দূরে সরে যায়, আর যখন তার কোন অমঙ্গল ঘটে তখন সে দীর্ঘ মোনাজাতে রত হয়'।

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এ আয়াতেও মানব চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে। মানুষকে যখন আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেন তখন তার কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার হওয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিন্তু মানুষ এ কর্তব্য পালন করেনা, আল্লাহ পাক যে তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন একথা স্বীকারও করেনা। পক্ষান্তরে, যখন মানুষ কোন রকম বিপদে পড়ে তখন সে আল্লাহ পাককে ডাকতে থাকে এমনকি, সুদীর্ঘ মোনাজাত করতে থাকে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, নেয়ামতের জন্যে শোকর আদায় করা যেমন একান্ত কর্তব্য, বিপদে সবর অবলম্বনও তেমনি একান্ত করণীয় কাজ। বিপদে যার ধৈর্য নেই, সুখ-শান্তিতে যার শোকর নেই এমন লোকদের কথাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ আরো বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত লাভ করার পর যদি ঐ নেয়ামতের জন্যে শোকর আদায় করার তৌফিক হয় তবে বুঝতে হবে ঐ নেয়ামত তার জন্যে কল্যাণকর ও মঙ্গলময়। আর যদি ঐ নেয়ামত লাভের পর শোকর আদায়ের তৌফিক না হয়, বরং গাফলত এবং উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয় তবে বুঝতে হবে যে, এ নেয়ামত তাকে পরীক্ষা স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, মুছিবতের সময় যদি সবর অবলম্বনের তৌফিক হয় তবে বুঝতে হবে যে, এই মুছিবত তার জন্যে রহমত স্বরূপ নাযিল হয়েছে, আর যদি সবর না থাকে এবং অস্থিরতা প্রকাশ পায় তবে বুঝতে হবে যে, ঐ মুছিবত তার জন্যে প্রকৃত অর্থেই মুছিবত। মূলতঃ যত বড় বিপদই আসুক, মোমেন কখনও আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয় না। আর দুনিয়ার নেয়ামত লাভ করলে নেয়ামত দাতাকে ভুলে যায় না। দাতাকে ভুলে গিয়ে তাঁর দান নিয়ে ব্যস্ত-মুগ্ধ হওয়া ভদ্রতা নয়, এমনকি মানবতাও নয়। যে প্রকৃত মানুষ সে মহান দাতা আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সর্বদা কৃতজ্ঞাবনত থাকে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি এই কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং এরপরও তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রয়েছে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে'?

অর্থাৎ হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! এ বিষয়ে কি তোমরা একটু ভেবে দেখেছ যে, পবিত্র কোরআন যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হয়ে থাকে (অবশ্যই তা আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই নাযিল হয়েছে); এমন অবস্থায়ও তোমরা পবিত্র কোরআনের সত্যতাকে অবিশ্বাস কর, আল্লাহর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অমান্য কর, তাঁর এবং পবিত্র কোরআনের বিরোধিতায় তোমরা তৎপর থাক, এমন অবস্থায় তোমাদের চেয়ে বড় জালেম, বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? আর এ অবস্থায় তোমাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হবে তা কি তোমরা ভেবে দেখেছ? আর যখন অন্যায়-অনাচারের কারণে তোমাদের প্রতি আসমানী গজব নাযিল হবে তখন তোমাদেরকে কে রক্ষা করবে? অতএব, তোমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে চিন্তা কর এবং ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আল্লাহ পাকের বিদ্রোহী হয়ে তাঁর গজব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই।

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

'অচিরেই আমি পৃথিবীতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও আমার নিদর্শন সমূহ দেখাব, শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটিই সত্য'।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের সত্যতার দলিল-প্রমাণের কোন অভাব নেই। যারা পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করে তাদের নিজেদের মাঝেও এবং তাদের চারিপার্শ্বে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের বহু নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। পবিত্র কোরআনের এবং তার বাহক প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার প্রকৃষ্ট এবং জ্বলন্ত প্রমাণ সমূহ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, তারা কি লক্ষ্য করেনা যে তাদের শত বিরোধিতা সত্বেও পবিত্র কোরআনের প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে, মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে, মুসলমানদের বিজয়াভিযান অব্যাহত রয়েছে, বদরের রণাঙ্গনে

কাফেরদের ঐতিহাসিক পরাজয় পবিত্র কোরআনের সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ নয় কি? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা প্রমাণের জন্যে কাফেরদের এ অপমানজনক পরাজয় যথেষ্ট নয় কি?

اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ

আলোচ্য আয়াতে পৃথিবীতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও যে নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিকট ও দূর অতীতে যেসব জাতি আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণে কোপগ্রস্ত হয়েছে তাদের ধ্বংসাবশেষ আজো পৃথিবীতে বর্তমান রয়েছে। সেসব ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষগুলো তাদের জন্যে শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে এবং আল্লাহ পাকের নিদর্শন হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মক্কার কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা এবং সামরিক সরঞ্জাম অনেক বেশী থাকা সত্বেও বদরের রণাঙ্গনে তাদেরকে অত্যন্ত অপমানজনক পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। তাদের শিক্ষার জন্যে তা কি যথেষ্ট নয়?

কাতাদা (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো তাদের উপর আপতিত বালা-মসিবত এবং দৈহিক রোগ।

মুজাহেদ (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, পৃথিবীতে নিদর্শন সমূহ হলো মুসলমানদেরকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে বিজয় দান করেছেন তা, বিশেষতঃ মক্কা বিজয়কে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আতা (রঃ) এবং এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন নিদর্শন বলতে আসমান-জমীন, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ইমাম বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেগুলোই তাঁর সত্যতার প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ অতীত কালের যেসব বালা-মসিবত বিভিন্ন অবাধ্য জাতির উপর আপতিত হয়েছে, সেগুলোও তাঁর সত্যতার প্রমাণ। এমনিভাবে বদর এবং মক্কা বিজয়ও তাঁর সত্যতার প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত, মানুষের দৈহিক গঠন, তার সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য এসবও আল্লাহ পাকের কুদরতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এসব দেখেই মানুষ আল্লাহ পাকের একত্ববাদে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতায় বিশ্বাস করতে পারে।

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ.

'শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটিই সত্য'।

অর্থাৎ এসব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখার পর তাদের সম্মুখে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ পাবে যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত মহান বাণী, এটি ধ্রুব সত্য, এতে সন্দেহ করার বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। আর এ সত্যও তাদের নিকট প্রতিভাত হবে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের মদদপুষ্ট, অহরহ তাঁর নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বাণী বাহক ফেরেশতা আসে এবং প্রয়োজনে আসে আল্লাহ পাকের সাহায্য, অথবা এর অর্থ হলো দ্বীন ইসলাম সত্য, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রকাশিত নিদর্শন সমূহে দেখে তারা দ্বীন ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করবে এবং তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি তারা বিশ্বাস করতে পারবে।

أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

'(হে রসূল!) আপনার সত্যায়নের জন্যে এটি কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার প্রতিপালক সব বিষয়ে অবগত'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রকাশিত অগণিত নিদর্শন সমূহ দেখা সত্বেও যদি হতভাগারা পবিত্র কোরআন, দ্বীন ইসলাম এবং আল্লাহ পাকের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতায় বিশ্বাস না করে, তবে এজন্যে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। (হে রসূল!) আপনার নবুওয়্যতের সত্যতার স্বাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ পাক, আর তাঁর সাক্ষী হওয়া কি যথেষ্ট নয়? অতএব, এ কাফেরদের মানা না মানায় কিছুই যায় আসেনা।

অথবা এর অর্থ হলো, (হে রসূল!) আপনার সত্যায়নের জন্যে একথাটি কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার প্রতিপালক সব বিষয় অবগত। আপনার সত্যতার কথাও তিনি জানেন, তিনি আপনার অবস্থা সম্পর্কে অবগত এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল। মানুষের কোন কিছুই আল্লাহ পাকের নিকট গোপন নেই, অতএব তাদের শাস্তি অবধারিত।

মোকাতেল (রঃ) আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, তিনি নিজেই এর সাক্ষী আর তাঁর সাক্ষী হওয়া কি যথেষ্ট নয়?

সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর তৌহীদের যে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন তা আপনার সত্যায়নের জন্যে যথেষ্ট নয় কি? কেননা তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

'জেনে রাখ, এরা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে সন্দিহান, সতর্ক হও যে আল্লাহ পাক সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন'।

অর্থাৎ এত সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ দেখার পরও কাফেররা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হবার ব্যাপারে সন্দিহান রয়েছে। তারা এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছে যে, কেয়ামত হবেনা, তাদের ভাল-মন্দের হিসাব-নিকাশ হবেনা অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাক তাদের সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। কোন কিছুই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়; কোন অবস্থাতেই তারা আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবেনা।

যখন তাদের মৃত্যু হয়, তাদের দেহের অনু-পরমাণু পর্যন্ত তখন মাটির সঙ্গে মিশে যায়। অথবা তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই ভস্মে পরিণত করা হয়, আর তা বাতাসে উড়ে যায়, অথবা তাদের সলিল সমাধি হয়, তবু আল্লাহ পাক তাঁর অসীম শক্তিতে তাদেরকে পুনর্জীবন দান করবেন। কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদেরকে হাযির করবেন। কেননা, আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, তাঁর শক্তি, তাঁর কুদরত অন্তহীন, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন, তাঁর ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২রা মার্চ ১৯৯৬ইং সূরা হা-মীম আস সজদার তফসীর সমাপ্ত হলো।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم

সূরা শুরা

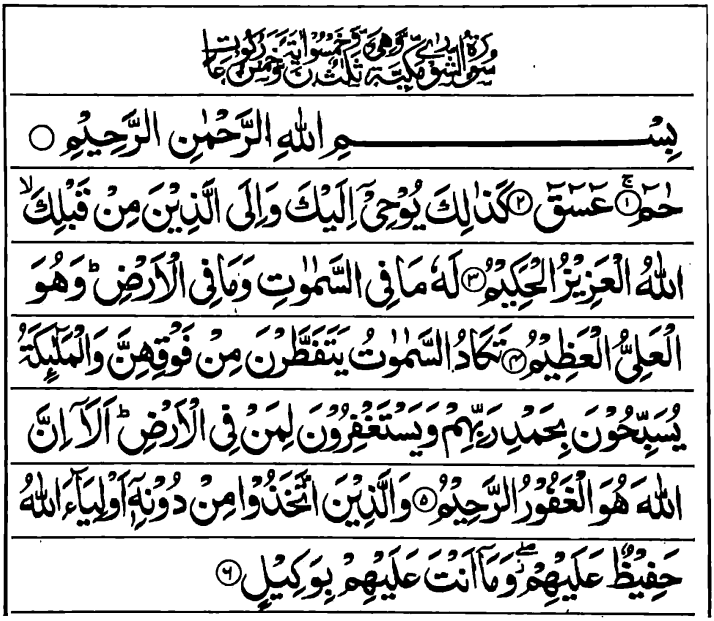

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّخَمْسُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ

اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ

الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٤﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ

يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَلَآ اِنَّ

اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ

حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦﴾

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) হা-মীম।

(২) আইন-সীন-ক্বাফ।

(৩) (হে রসূল!) পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক এভাবেই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন।

(৪) আসমান এবং জমীনের সব কিছু তাঁরই, আর তিনিই সবার উপরে, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান।

(৫) আসমান সমূহ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের হামদের তসবীহ পাঠ করতে থাকে এবং বিশ্ববাসীর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা রত থাকে, মনে রেখ! নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(৬) আর যারা আল্লাহ পাকের স্থলে অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। আর (হে রসূল!) আপনার উপর তাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই।

সূরায়ে শুরা প্রসঙ্গে :

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, চারটি আয়াত মতান্তরে সাতটি আয়াত ব্যতীত সকল আয়াতই মক্কায়ে মোয়াজ্জমায নাযিল হয়েছে। এতে ৫ রুকু, ৫৩ আয়াত, ৮৮৬ বাক্য এবং ৩,৫৮৮ অক্ষর রয়েছে।[১]

নামকরণ

এ সূরাকে সূরায়ে শুরা, এতদ্ব্যতীত সূরা হা-মীম আইন-সীন ক্বাফও বলা হয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় সত্য-বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব এবং তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রমাণ, পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম বর্ণনার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, "কাফেরদের নির্যাতনে ব্যথিত হবেন না"।

তফসীরুল কোরআন

حٰمٓ ○ عٓسٓقٓ

হামীম, আইন-সীন-ক্বাফ হলো হরফে মোকাত্তাআত (এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে)।

এবনে জরীর এ সূরার প্রথম অক্ষরগুলো সম্পর্কে একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়, তখন হযরত হোজায়ফা এবনে ইয়ামান (রাঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। ঐ ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট হামীম, আইন-সীন ক্বাফ-এ অক্ষরগুলোর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি কিছুক্ষণের জন্যে মাথা নীচু করে রাখলেন, এরপর তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয়বারও একই প্রশ্ন করলো, তিনি পুনরায় তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তার এ প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করলেন। সে

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪০৫

তৃতীয়বারও একই প্রশ্ন করলো, কিন্তু তিনি এর কোন জবাব দিলেন না। তখন হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে বলছি, আর আমি জানি তিনি জবাব দেয়া কেন পছন্দ করছেন না, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এক ব্যক্তি সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, যাকে আবদুল এলাহ বা আবদুল্লাহ বলা হয়, সে প্রাচ্যের কোন নদীর তীরে অবতরণ করবে এবং সেখানে দু'টি শহর আবাদ করবে, নদী দু'টিকে ঐ শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। যখন আল্লাহ পাক তার পতনের ইচ্ছা করবেন এবং তারও সময় শেষ হয়ে আসবে, তখন ঐ দু'টি শহরের একটির উপর আগুন জ্বলে উঠবে, আর ঐ শহরটিকে ভস্মীভূত করে দেবে। সেখানকার লোকেরা এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্যন্বিত হবে, তাদের কাছে মনে হবে এখানে কিছুই ছিলনা, অতি প্রত্যুষে সেখানে সকল সত্যদ্রোহী, অহংকারী লোকেরা একত্রিত হবে এবং তখনই আল্লাহ পাক তাদের সহ ঐ শহরকে ধ্বংস করে দেবেন। আর এটিই হবে হা-মীম, আইন-সীন-ক্বাফের অর্থ। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। 'আইন' অক্ষর দ্বারা আদল বা সুবিচারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, সীন অক্ষরটির তাৎপর্য হলো অদূর ভবিষ্যতে হবে, আর ক্বাফের তাৎপর্য হলো একটি ঘটনা ঘটবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীর মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ অক্ষরগুলোর অর্থ শ্রবণ করেছ? তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন এবং বললেন, আমি শুনেছি। 'হা-মীম' আল্লাহ পাকের নাম সমূহের অন্যতম। 'আইনের' তাৎপর্য হলো বদরের যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারী কাফেররা আযাবের স্বাদ ভোগ করেছে। আর 'সীন' এর তাৎপর্য হলো, জালেমরা অদূর ভবিষ্যতে জানতে পারবে তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে। আর 'ক্বাফ' এর তাৎপর্য তিনি বলতে পারেননি। তখন হযরত আবু জর (রাঃ) দন্ডায়মান হলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনিও সেভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন, আর ক্বাফ এর তাৎপর্য হলো, আসমানী গজর আসন্ন যা তাদেরকে সর্বস্বান্ত করবে।[১]

মূলতঃ হামীম আইন সীন ক্বাফ এবং এমনি অন্যান্য মোকাত্তাআত অক্ষরগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে শুধু আল্লাহ পাকই অবগত রয়েছেন, একথা বলাই উত্তম।[২]

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'(হে রসূল!) পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক এভাবেই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন'।

১. তফসীরে তারাবী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-৫
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৫
২. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১৪১

অর্থাৎ (হে রসূল!) যেভাবে আপনার প্রতি এ জ্ঞান-গর্ভ উপদেশপূর্ণ সূরা নাযিল করেছি এবং ইতোপূর্বেও আপনার প্রতি অন্যান্য সূরা নাযিল করেছি, এভাবেই অতীতের নবী রসূলগণের নিকটও ওহী প্রেরিত হয়ে এসেছে। মানব জাতির হেদায়েতের লক্ষ্যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করা এবং তাঁদের নিকট ওহী নাযিল করা আল্লাহ পাকের চির শাশ্বত নিয়ম।

الْعَزِيزُ

এই ওহী প্রেরণ করা হয় মহান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

الْحَكِيمُ

তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়, তাঁর বিধি-নিষেধে কোন ভুল-ত্রুটি থাকেনা, মানব জাতির কল্যাণার্থে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী প্রেরণের ধারা অব্যাহত রয়েছে যুগে যুগে। নিঃসন্দেহে এতে সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত এবং জ্ঞান-মহিমার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

আসমান জমীনে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই, আর তিনিই সবার উপরে, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি মহান, তাঁর শান শুধু যে বর্ণনাতীত তাই নয়; বরং কল্পনাতীতও।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ

'আসমান সমূহ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের হামদের তসবীহ পাঠ করতে থাকে এবং বিশ্ববাসীর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা রত থাকে'।

পরম করুণাময়ের দয়া

সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের, তাঁর অনন্ত মহিমার প্রভাবে আসমান সমূহ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ পাক তাঁর অসীম দয়া মায়ার কারণে তাকে ঠেকিয়ে রাখেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর কুদরতের প্রভাব এবং তাঁর প্রতি ভয়-ভীতির কারণে আসমান বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়। অথবা এর অর্থ হলো, কাফের মুশরেকরা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে, "তাঁর সন্ততি আছে" বলে মন্তব্য করে, তাদের এসব জঘন্য মন্তব্যের কারণে যদি আসমান তাদের উপর ভেঙে পড়ে তবে তা বিস্ময়কর হবে না।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, যেহেতু আসমানে অগণিত ফেরেশতা রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রাণ, আসমানে এক বিঘত স্থানও এমন নেই, যেখানে কোন সেজদাকারী ফেরেশতা সেজদায় রত নেই, তারা সর্বদা আল্লাহ পাকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় তসবীহ পাঠে রত রয়েছে এবং বিশ্ববাসীর জন্যে সর্বদা তারা এস্তেগফার করতে থাকে, এ কারণেই আল্লাহ পাক দয়া করে আসমানকে ভেঙে পড়তে দেন না।

اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'মনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে ফেরেশতাদের দোয়ার বরকতে ক্ষমা করে থাকেন, আর কাফেরদেরকে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। যদি দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তবে এক মুহূর্তেই বিশ্ব-কারখানা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। আর কাফেরদেরকে এ অবকাশ দেয়ার কারণ হলো তারা যখনই তাদের কৃতকর্ম থেকে তওবা করে ঈমান আনে তখন তাদেরকে ক্ষমা করা হয়, পূর্বে কৃত নাফরমানীর জন্যে তাদেরকে রহমত থেকে বঞ্চিত করা হয়না, তাই তারাও আল্লাহ পাকের রহমত লাভ করতে থাকে।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ

'আর যারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। আর (হে রসূল!) আপনার উপর তাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই'।

অর্থাৎ তৌহীদের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে বারংবার আহ্বান জানানোর পরও যারা তৌহীদে বিশ্বাস করেনা; বরং আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কিছুকে শরীক করে এবং দুনিয়াতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, তারা যেন এ ভুল ধারণায় না থাকে যে তারা আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পেয়েছে; কেননা আল্লাহ পাক তাদের কৃতকর্মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ পাক নাফরমানদেরকে কোথাও অগাধ অর্থ-সম্পদ দিয়ে থাকেন, কোথাও রাষ্ট্র ক্ষমতাও তাদেরকে দান করেন, কিন্তু এসবই তাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ, অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বিষয়টিকে এভাবে ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۭ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى. (সূরা তোয়াহা ঃ ১৩১)

'আর (হে রসূল!) আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ দান করেছি, সেদিকে আপনি চোখ তুলে তাকাবেন না, (কেননা) আমি তাদেরকে এর দ্বারা পরীক্ষা করছি, আর আপনার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিযক উত্তম ও চিরস্থায়ী'।

পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ○ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۚ ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (সূরা আলে এমরান ঃ ১৯৬)

'(হে রসূল!) কাফেরদের শহরে বন্দরে গমনাগমন যেন আপনাকে ধোকায় না ফেলে, এ হলো অত্যন্ত সামান্য সম্পদ, এরপর দোযখই হবে তাদের আবাস-স্থল এবং কত নিকৃষ্ট সে আবাস-স্থল'।

বর্তমান যুগেও লক্ষ্য করা হয় কাফের মুশরেক, বে-দ্বীন, নাফরমানদের কাছে থাকে প্রচুর ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের হাতেই দেখা যায় ক্ষমতা, আর এসব দেখে দুর্বলচিত্ত মুসলমানও হতবাক হয়। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাদেরকে সামান্য সম্পদ দেয়া হয়েছে, এতে বিস্মিত হবার কোন ন্যায্য কারণ নেই। কেননা পরকালীন জীবনের জন্যে চিরস্থায়ী শাস্তি তাদের অবধারিত। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ যারা শেরক কুফর ও নাফরমানীতে লিপ্ত রয়েছে তাদের যাবতীয় কর্ম আল্লাহ পাকের সম্মুখেই রয়েছে, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, আর তারা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরেও নয়, যে কোন সময় আল্লাহ পাক তাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ.

'আল্লাহ পাক তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন'।

وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ.

'আর (হে রসূল!) আপনার প্রতি তাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই'।

অর্থাৎ (হে রসূল!) কাফেরদের অন্যায় আচরণের এবং তাদের অপকর্মের কোন দায়-দায়িত্ব আপনার নেই। অতএব, তাদের সম্পর্কে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না, তাদের বিষয় আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমিই তাদের হিসাব গ্রহণ করবো এবং যথা সময়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। অথবা এর অর্থ হলো, (হে রসূল!) আপনাকে তাদের উপর এ ক্ষমতা দেয়া হয়নি যে, আপনি তাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসবেন, এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে।

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَآ
إِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ
الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ۝٧ وَلَوْ
شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ
فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝٨ أَمِ اتَّخَذُوْا
مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٩ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ
إِلَى اللّٰهِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ۝١٠

তরজমা

(৭) আর (হে রসূল!) এভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআনে করীম নাযিল করেছি, যেন আপনি মক্কা মহানগরী ও তার চারপাশের লোকদেরকে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করতে পারেন, যেদিন সম্পর্কে আদৌ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, সেদিন একদল বেহেশতে যাবে, আর একদল দোযখের আগুনে প্রবেশ করবে।

(৮) আর আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে একই শ্রেণীভুক্ত করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ দান করেন। বস্তুতঃ জালেমদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।

(৯) তবে কি তারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে অন্যান্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছে? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকই অভিভাবক, আর তিনিই মৃতকে জীবিত করবেন, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(১০) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে তার ফয়সালা, (বল) তিনিই আমার প্রতিপালক আল্লাহ, আমি তাঁর প্রতিই ভরষা রাখি, আর তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, মক্কার কাফেররা ঈমান না আনলেও (হে রসূল!) আপনার তাতে কোন ক্ষতি নেই। আপনার কাজ হলো তাদেরকে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান করা যা আপনি করছেন, এরপর তাদের ব্যাপারে আপনার কোন দায়-দায়িত্ব নেই, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন।

আর আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের কথা এবং তাঁর দায়িত্বের পরিধি কতটুকু তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ

যেভাবে অন্যান্য নবী রসূলগণের নিকিট আমি ওহী নাযিল করেছি, ঠিক এভাবে (হে রসূল!) আপনার প্রতিও আরবী ভাষায় কোরআনে করীম নাযিল করেছি, যেন আপনি প্রথমতঃ "উম্মুল কোরা" তথা পল্লী-জননী মক্কা মহানগরীর অধিবাসীদেরকে এবং পরে সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভয় প্রদর্শন করেন। আর ভয় প্রদর্শন করেন কেয়ামতের দিনের ব্যাপারে যেদিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, যেদিন প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে এবং নিজ নিজ কৃতকর্ম সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্য وَكَذٰلِكَ-তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে কোরআনে করীম আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, কেননা কোরআনের প্রথম পাঠক ও শ্রোতা আরবী ভাষী। তাঁরা কোরআনে করীমের মর্মবাণী বুঝলে পৃথিবীর অন্য ভাষাভাষী মানুষের নিকটও সে বাণী পৌঁছাতে পারবেন।

لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا.

'যেন আপনি মক্কা মহানগরী এবং তার চতুর্দিক তথা সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভয় প্রদর্শন করেন'।

'উম্মুল কোরা'র শাব্দিক অর্থ হলো পল্লী-জননী। মক্কায়ে মোয়াজ্জমার মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এ নামকরণ করা হয়েছে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন,

سمى اصل كل شيئ امه

'প্রত্যেকটি জিনিষের মূল বস্তুকে তার মাতা বলে আখ্যায়িত করা হয়'।

১. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১৪৭

মাতা থেকেই সন্তান তাই মাকে 'মা' বলা হয়। বিখ্যাত আরবী অভিধাণবিদ ইমাম রাগেব বলেছেন, যে জিনিষ থেকে কোন কিছুর অস্তিত্ব লাভ হয় তাকেই 'মা' বলা হয়। হাদীস শরীফে রয়েছে, কা'বা শরীফের অবস্থান-স্থল থেকেই আল্লাহ পাক পৃথিবীর সৃষ্টি ও বিস্তার দান করেছেন। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যেভাবে রুটি তৈরীর জন্যে আটাকে মন্থন করে গোলাকার রূপ দেয়া হয় এবং এরপর তাকে ছড়িয়ে দেয়া হয়, ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাক কা'বা শরীফের নিম্নদেশকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাকে বিস্তৃত করেছেন।

হাদীস শরীফের ভাষায়ঃ

انه دحيت الدنيا من تحتها

অর্থাৎ কা'বা শরীফের নিম্নদেশ থেকেই পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়েছে, আর এজন্যেই মক্কায়ে মোয়াজ্জমাকে "উম্মুল কোরা" বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকের এবাদতের সর্বপ্রথম কেন্দ্র হলো কা'বা শরীফ, আর তা মক্কা নগরীতেই অবস্থিত। তাই মক্কা নগরীকে "উম্মুল কোরা" বা পল্লী-জননী বলা হয়েছে। কোরআনে করীমেই রয়েছে এর ঘোষণা ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ.

(সূরা আলে এমরান ঃ ৯৬)

'নিশ্চয় পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর যা মানব জাতির কল্যাণার্থে নির্মাণ করা হয়েছে তা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবস্থিত যা অত্যন্ত বরকতময় এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে হেদায়েতের কেন্দ্র'।

وَمَنْ حَوْلَهَا.

'আর মক্কার চতুর্দিকের অধিবাসীদেরকেও যেন আপনি ভয় প্রদর্শন করেন'।

মক্কার চতুর্দিক বলতে সমগ্র বিশ্বকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তফসীরকারগণ একমত। মক্কায়ে মোয়াজ্জমা পৃথিবীর নাভি অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রে বা মধ্যস্থলে অবস্থিত। মক্কায়ে মোয়াজ্জমা সারা পৃথিবীতে সর্বোত্তম স্থান। তিরমিজী, নেসায়ী, এবনে মাজা শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে হাদী এবনে হামরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আমি নিজেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ 'হে মক্কা! আল্লাহর শপথ! আল্লাহ পাকের দরবারে তুমি সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রিয় এবং সর্বোত্তম। আল্লাহর শপথ! যদি আমাকে তোমার নিকট থেকে বের করা না হতো তবে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতাম না'। আর এ শহরের ফজিলতের জন্যে একথাই যথেষ্ট যে, কা'বা শরীফের প্রাঙ্গণে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করলে এক লক্ষ নামাযের সওয়াব হয়।

প্রিয়নবী (দঃ)-এর বৈশিষ্ট্য

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে অন্যান্য সমস্ত নবীগণের উপর বিশেষভাবে পাঁচটি ফজিলত দান করা হয়েছেঃ

১. সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে (অন্যান্য নবীগণ বিশেষ কোন এলাকার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে প্রেরিত হয়েছেন তাই আলোচ্য আয়াতের وَمَنْ حَوْلَهَا দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে)।

২. আমার উম্মতের জন্যে আমার শাফাআতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে (অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কেয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের জন্যে শাফাআত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে)।

৩. এক মাসের পথ সম্মুখের দিকে এবং এক মাসের পথ পেছনের দিকে দুশমনের অন্তরে আমার ভয় প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে, এভাবে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

৪. সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্যে মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন স্থানে এবাদতের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং এর যে কোন অংশ দ্বারা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি দেয়া হয়েছে)।

৫. আমার জন্যে মালে গনিমত বা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদকে হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারো জন্যেই হালাল করা হয়নি।

وَمَنْ حَوْلَهَا শব্দটি দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের পরিধি ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের হেদায়েতের জন্যেই তিনি প্রেরিত।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য নবীগণ যেমন একটি নির্দিষ্ট এলাকাবাসীর হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন, ঠিক তেমনি তাঁদের যুগের জন্যেই তাঁরা নবী ছিলেন, অর্থাৎ যতদিন তাঁরা পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, ততদিনই তাঁদের নবুওয়্যত ছিল। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু যে সমগ্র বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন তাই নয়; বরং সর্বকালের জন্যে তিনি নবী এবং রসূল হিসেবে আগমন করেছেন। যেভাবে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি নবী ও রসূল ছিলেন, ঠিক তেমনি তাঁর যুগ থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত তিনিই নবী, তিনিই রসূল, কেননা তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল। এটি তাঁরই বৈশিষ্ট্য।

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

'যেদিন একদল লোক বেহেশতে যাবে, আর এক দল দোযখের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে'।

অর্থাৎ হে নবী! আপনার কাজ হলো কেয়ামতের কঠিন দিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা, সেদিন মানুষ দু' দলে বিভক্ত হবে, একদল তাদের ঈমান ও নেক আমলের শুভ-

পরিণতি স্বরূপ চির সুখ ও শান্তির কেন্দ্র বেহেশতের যাবে। আর একদল তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি স্বরূপ দোযখের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে, অতএব, এ জীবনেই সংগ্রহ করতে হবে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল।

এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দস্তে মোবারকের দু' মুঠোতে দু'টি কিতাব নিয়ে আগমন করলেন, আর আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান এতে কি রয়েছে? আমরা আরজ করলাম, আমরা জানিনা আপনি বলুন, তখন তিনি তাঁর ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটি হলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের কিতাব, এতে জান্নাতবাসীদের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে তাদের পিতার নাম এবং গোত্রের নাম সহ, এখন আর এ সংখ্যা বাড়বেও না, কমবেও না, এরপর তাঁর বাম হাতের দিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ করলেন, এ হলো দোযখীদের নামের তালিকা, তাদের পিতার নাম এবং গোত্রের নাম সহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতেও কম-বেশী হওয়া সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, তাহলে আমলের কি প্রয়োজন? যখন সব কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা নেক আমল করতে থাক, সঠিক পথে চলতে থাক, যে জান্নাতী হবে তার খাতেমা জান্নাতী আমলের উপর হবে, ইতোপূর্বে যেমন আমলই করুক না কেন, আর যে দোযখী হবে তার খাতেমা দোযখী আমলের উপর হবে, জীবন ভর যা কিছুই করুক না কেন, তখন তিনি আলোচ্য আয়াত–

فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ.

তেলাওয়াত করেন। এরপর তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ন্যায় বিচার হবে (বগভী, তিরমিযী)।[১]

মসনদে আহমদে এ মর্মে আরো একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। আবু আবদুল্লাহ (রাঃ) নামক একজন সাহাবী অসুস্থ হলেন। আমরা তাঁর খবর নিতে গিয়ে দেখলাম তিনি ক্রন্দন করছেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনাকে তো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি তোমার মোচগুলো ছোট কর আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত। তখন তিনি বললেন, একথা ঠিক, তবে আমি কাঁদছি অন্য একখানি হাদীসের কারণে। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি যে, আল্লাহ পাক তাঁর ডান হাতের মুঠোয় একদল লোককে নিয়েছেন এবং এরশাদ করেছেন, এরা হলো জান্নাতের জন্যে, এমনিভাবে বাম হাতের মুঠোয় একদল লোককে নিয়ে বলেছেন, এরা হলো দোযখের জন্যে, আর আমার কোন পরোয়া নেই।

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩০৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৬
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২০৯

(উক্ত সাহাবী বলেন) আমি জানিনা সে মুহূর্তে আমি কোন্ হাতের মুঠোয় ছিলাম, তকদীর সম্পর্কে এমনি আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ.

'আর আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে একই শ্রেণীভুক্ত করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ দান করেন'।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সকলকে এক দ্বীনের মধ্যে একত্রিত করে দিতে পারতেন।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সকলকে দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমতের মধ্যে তথা দ্বীন ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ দান করেন। সকলকে এক দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা-মর্জি এবং হেকমত বিরোধী, কেননা এমন অবস্থায় হেদায়েত কবুল করার জন্যে সকলেই বাধ্য থাকত। মানুষের ইচ্ছা শক্তি কার্যকর হওয়ার কোন সুযোগ হতো না। মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দের পার্থক্য হতো না, আল্লাহ পাকের বিধান হলো যে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের নিদর্শন দেখে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে সে তাঁর প্রিয় ও পছন্দনীয় এবং করুণা-ভাজন বন্দা হবে।

অন্যদিকে, যে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত দেখেও তাঁর প্রতি ঈমান আনবেনা, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকবে, অবাধ্যতা এবং নাফরমানীই হবে তার বৈশিষ্ট্য, এমন ব্যক্তিই জালেম এবং তার শাস্তি অবধারিত, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ.

'আর জালেম তথা কাফেরদের জন্যে কোন অভিভাবক নেই, নেই কোন সাহায্যকারী'।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

'তবে কি তারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে অন্যান্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকই অভিভাবক, আর তিনিই মৃতকে জীবিত করবেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করে বলেছেন, (হে রসূল!) আপনি তাদের ব্যাপারে চিন্তিত

হবেন না, তাদের হেদায়েতের দায়-দায়িত্ব আপনার নেই, তারা ইচ্ছা করুক বা না করুক, সর্বাবস্থায় তাদেরকে হেদায়েত করা আপনার কর্তব্য নয়; যদি সকলকে হেদায়েতের জন্যে বাধ্য করা আল্লাহ পাকের মর্জি হতো তবে তিনি তা নিজেই করতেন, কেননা তিনি সর্বশক্তিমান। এরপর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ এ কাফেররা কি আল্লাহ পাকের পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে? অথচ অবস্থা এই যে, এ ত্রিভূবনে আল্লাহ পাক ব্যতীত প্রকৃত অভিভাবক, প্রকৃত বন্ধু, সত্যিকার সাহায্যকারী কেউ নেই, সাহায্য করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই রয়েছে, আর কারো নয়, সৃষ্টি মাত্রেরই ক্ষমতা সীমিত, কিন্তু মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের ক্ষমতা অপরিসীম, অতএব অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, তিনিই একমাত্র অভিভাবক, আর তিনিই একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য। তাই বাস্তববাদী, কল্যাণকামী বুদ্ধিমান মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাককে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করা, শুধু তাঁরই বন্দেগী করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণ করা। তিনিই তো মৃতকে জীবিত করবেন এবং সমগ্র মানব জাতিকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। ভাল-মন্দের ফয়সালা সেদিনই তিনি করবেন, তিনি সব কিছু করতে পারেন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ.

'আর তোমরা যে কোন বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে তার ফয়সালা'।

অর্থাৎ দ্বীনি ব্যাপারে সত্য-সাধকদের সাথে তোমাদের যে মতভেদ রয়েছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকই তার ফয়সালা করে দেবেন। কে হক্ব পন্থী, আর কে বাতিল পন্থী সেদিনই তার মীমাংসা হবে। এ মতভেদ আকীদা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে হোক বা কোন আদেশ-নিষেধের প্রশ্নে, কিংবা এবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে হোক, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে– সকল বিষয়ের সঠিক সমাধান আল্লাহ পাকই করবেন।

অতএব, আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে মানুষের জন্যে সার্বিক কল্যাণ।

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

'(হে রসূল! আপনি বলুন) আল্লাহ পাকই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর প্রতিই ভরষা করি এবং তাঁর দিকেই আমি মনোনিবেশ করি'।

অর্থাৎ দুশমনদের সকল চক্রান্তের মোকাবেলায়, জালেমদের হামলা প্রতিরোধে, দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় এক কথায় সব কিছুতেই আমি আল্লাহ পাকের প্রতি ভরষা করি। তিনিই একমাত্র সহায়ক, তিনিই একমাত্র অভিভাবক, তিনিই সর্বশক্তিমান।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ
مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ
السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾ شَرَعَ لَكُمْ
مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ
لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ
يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

তরজমা

(১১) তিনিই আসমান জমীনের স্রষ্টা, তিনি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর চতুঃষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তাদের জোড়া, এভাবে তিনি তোমাদের বংশ-বিস্তার করেন। কোন কিছুতেই তাঁর তুলনা নেই; তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু দেখেন।

(১২) আসমান ও জমীনের কুঞ্জিকা তাঁরই নিকট, তিনি যার ইচ্ছা তার রিয্ক বাড়িয়ে দেন এবং যার ইচ্ছা তার সঙ্কুচিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত।

(১৩) আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে সেই জীবন বিধানই প্রবর্তন করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে। (হে রসূল!) যা আমি আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি, আর আমি ইব্রাহীম, মূসা এবং ঈসাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, এই জীবন বিধানকে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখ, আর এতে কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি করোনা। (হে রসূল!) আপনি মুশরেকদেরকে যে বিষয়ের (তৌহীদের) দিকে আহবান করেন, তা তাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বহ ভার, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে, তিনি তাকে হেদায়েত করেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ পাকের গুণাবলীর উল্লেখ ছিল, তাঁর গুণাবলীর পাশাপাশি এ আয়াতে মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া-মায়া এবং এহসানের উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

এ পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করার জন্যে আল্লাহ পাক বিশাল-বিস্তৃত আকাশ মন্ডলী সৃষ্টি করেছেন চাঁদোয়ার ন্যায়। আর জমীনকেও মানুষের বাসোপযোগী করে তৈরী করেছেন। এতে একদিকে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে, অন্যদিকে এটি হলো মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান।

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ

মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের আরো একটি বিশেষ দান হলো, তিনি মানুষের মধ্য থেকেই তার জোড়া বা জীবন-সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে জীবন-সংগ্রামে একে অন্যের পরিপূরক এবং সহায়ক হয়। এটি নিঃসন্দেহে মানব জাতির প্রতি করুণাময় আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এভাবে দয়াময় আল্লাহ পাক মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনে, তার উপকারার্থে চতুঃষ্পদ জন্তুগুলো সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের মধ্য থেকে তাদের জোড়াও সৃষ্টি করেছেন। এভাবে আল্লাহ পাক মানুষকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে যুগ যুগ ধরে মানব জাতির বংশ বিস্তার হচ্ছে, আর এর পাশাপাশি মানুষের সেবায় নিয়োজিত চতঃষ্পদ জন্তুগুলোরও বংশ বিস্তার হচ্ছে। এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। এ সমস্ত দানের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞ থাকা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

তিনি অতুলনীয়

তিনি অতুলনীয়, কোন কিছুতেই তাঁর কোন তুলনা নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, কেননা তিনি মহান স্রষ্টা, আর সবই তাঁর সৃষ্টি। কোন সৃষ্টি তার স্রষ্টার সমতুল্য হতে পারেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, গুণাবলীতে, জ্ঞানে, কুদরত-হেকমতে এককথায় কোন কিছুতেই আল্লাহ পাকের কোন তুলনা নেই।[১]

তাঁর পবিত্র সত্ত্বার কোন দৃষ্টান্ত হওয়া সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। এমনিভাবে গুণাবলীতেও তিনি অতুলনীয়। তিনি তিনিই। তাই তাঁর নির্দেশের ন্যায় কোন নির্দেশ হতে পারেনা।

---

১. তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪০৬

তাঁর প্রদত্ত জীবন বিধানের ন্যায় মানব রচিত কোন জীবন বিধান হতে পারেনা। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। এ গুণ কোন সৃষ্টিরই নেই, আর তাঁর দেখা-শোনাও মানুষের দেখা-শোনার মত নয়। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, কোন সৃষ্টিরই এমন গুণ থাকতে পারেনা। তাঁর মাঝেই সকল গুণ বিরাজমান, এ অবস্থাও কোন সৃষ্টির হতে পারেনা। কোন সৃষ্টি তাঁর দৃষ্টান্ত কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। তিনি সকলের আগে, সকলের শেষেও তিনিই, প্রকাশ্যেও তিনি গোপনেও তিনি আর তিনিই সকল বিষয়ে প্রজ্ঞাময়, সব কিছু উত্তমরূপে জানেন, তাঁর অজানা কিছুই নেই, ভূ-গর্ভে যা প্রবেশ করে তা তিনি জানেন, যা সেখান থেকে বের হয় তা-ও তিনি জানেন। আসমান থেকে যা অবতীর্ণ হয় তা তিনি জানেন এবং আসমানে যা ওঠে তা-ও তিনি জানেন। সমগ্র মানব জাতির যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে তিনি অবগত। মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যা কিছু আসে, সে সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল, মানুষ ভবিষ্যতে যা চিন্তা করবে তা-ও তাঁর অজানা নয় এমনকি, তাঁর অজান্তে কোন ফল তার আবরণ থেকে বের হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ করে না, প্রসবও করোনা, পৃথিবীর সব কিছু তাঁর জ্ঞাতসারেই হয়। তাই তিনি অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, অকল্পনীয়।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

'আসমান ও জমীনের কুঞ্জিকা তাঁরই নিকট, তিনি যাকে ইচ্ছা তার জন্যে রিয্ক বাড়িয়ে দেন এবং সঙ্কুচিতও করেন। নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী'।

ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডলে যে বিশ্ব ভান্ডার রয়েছে তার কুঞ্জিকা এক আল্লাহ পাকের হাতে, তিনি যখন যাকে যতখানি দান করতে ইচ্ছা করেন, তা তাকে ঐ ভান্ডার থেকে দিয়ে থাকেন। যাবতীয় আহার্য, পানীয় তথা জীবনোপকরণ সরবরাহ করা তাঁরই কাজ, কে কতখানি পাবে আর পাবেনা, কে কিসের যোগ্য, আর কিসের অযোগ্য, আল্লাহ পাকই এর বিচার-বিবেচনা করবেন। আর সে বিচারের প্রেক্ষিতেই কারো রিয্ক তিনি বাড়িয়ে দেন, আর কারো রিয্ক হ্রাস করেন। রিয্ক বাড়িয়ে দিলে শোকর গুজারীর পরীক্ষা করা হয় আর রিয্ক পরিমিত আকারে দান করে সবরের পরীক্ষা করা হয়।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আসমান এবং জমীনে সমগ্র বিশ্ববাসীর রিয্কের ভান্ডার রয়েছে। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, কাউকে কম বা বেশী দেয়া তাঁরই ইচ্ছাধীন।

কালবী (রঃ) বলেছেন, আসমানে রয়েছে বৃষ্টি, আর জমীনে রয়েছে সবুজের মেলা, আল্লাহ পাক তাঁর মর্জি মোতাবেক কাউকে স্বচ্ছল জীবন দান করেন, আর কাউকে অভাব-অনটনের মধ্যে রাখেন। উভয় অবস্থাই হয় মানুষের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ, তবে তিনি কারো প্রতি জুলুম করেন না, তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত হয় হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, তিনি সকলের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

আল্লাহ পাকের কয়েকটি গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

আলোচ্য আয়াত সমূহে মহান আল্লাহ পাকের কয়েকটি গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিক উল্লেখ রয়েছেঃ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ

১. তিনিই আমার প্রতিপালক।

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

২. আমি তাঁর প্রতিই ভরষা রাখি এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করি, তাঁর স্মরণেই থাকি তন্ময়।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

৩. আল্লাহ পাকই আসমান জমীনের স্রষ্টা, এতে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি, তিনিই সব কিছুকে লালন-পালন করেন।

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

৪. আল্লাহ পাক দয়া করে তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জীবন-সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যারা হবে তোমাদের জীবন-সংগ্রামের সাথী, সহায়ক, পরিপূরক।

وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ

৫. আল্লাহ পাক মানব জাতির উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন চতুঃষ্পদ জন্তুগুলোকে এবং তিনি সেগুলোর জোড়াও সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের প্রয়োজনের আয়োজনে এসব চতুঃষ্পদ জন্তু ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ পাক মানুষের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী জীব-জন্তুকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন।

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

৬. তিনি অতুলনীয়, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই। যাঁর এত অবদান, এত এহসান, তিনি নিরাকার, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি নজিরবিহীন, তিনি সর্বশক্তিমান, যাঁকে দেখা যায়না, তাঁর কথা কল্পনাও যায় না।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

৭. তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত, তিনি বান্দাদের প্রত্যেকটি কথা শ্রবণ করেন এবং সব কিছু তিনি দেখে থাকেন।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

৮. আসমান জমীনে যে বিশ্ব ভান্ডার রয়েছে তার কুঞ্জিকা আল্লাহ পাকের হাতেই থাকে। তিনি যাকে ইচ্ছা তার রিযক বৃদ্ধি করেন অথবা সঙ্কুচিত করেন। এটি তাঁর মর্জির ব্যাপার, তবে তিনি কারো প্রতি জুলুম করেন না। তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত হয় হেকমত পূর্ণ, যার জন্যে যা সমীচিন, তিনি তার জন্যে তাই করেন।

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

৯. (সকলের প্রতি তিনি সুবিচার করেন, আর তা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ, কেননা) তিনি সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তিনি মহাজ্ঞানী। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিযকদাতা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই সুবিচারক আর তিনি সব কিছুর জ্ঞান রাখেন, অতএব এবাদত হতে হবে একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যেই, তিনি একমাত্র উপাস্য, কোন ঠাকুর-দেবতা, কোন মূর্তি বা অন্য কিছুর মধ্যে উল্লেখিত গুণাবলীর কোনটাই নেই।

মানব জাতির কর্তব্য

তাই সমগ্র মানব জাতির একান্ত কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনা, তাঁর সাথে শেরক না করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা, তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণে সর্বাত্মক চেষ্টা করা, তাঁর বন্দেগী করে জীবনকে ধন্য করা, তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করে এবং প্রতিকূল অবস্থায় সবর অবলম্বন করে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং জীবন-সাধনাকে সার্থক করা।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

'আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে সে জীবন বিধানই প্রবর্তন করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, (হে রসূল!) এবং যা আমি আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি, আর আমি ইব্রাহীম, মূসা এবং ঈসাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, এ জীবন বিধানকে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখ, আর এতে কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি করোনা'।

এ আয়াতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ঘোষণা রয়েছেঃ

দ্বীন এক, অভিন্ন

১. আল্লাহ পাকের দ্বীন চির দিনই এক ও অভিন্ন রয়েছে, মৌলিক বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই, তবে অমৌলিক বিষয়ে যুগে যুগে অবস্থা অনুযায়ী কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) প্রথম মানুষ আর তাঁর পর সর্বপ্রথম রসূল হলেন হযরত নূহ (আঃ)। হযরত নূহ (আঃ)-এর জমানা থেকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যে লক্ষাধিক নবী রসূল আগমন করেছেন, তাঁদের আহ্বান ছিল প্রথমত একটি বিষয়ের প্রতি, তা হল তৌহীদ তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ। হযরত নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী পর্যন্ত সকল নবী রসূলগণের একই কথা– "হে মানব জাতি! এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস কর, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ কর"। এটিই হল দ্বীন ইসলামের সর্ব প্রধান মৌলিক বিষয়। এরপর হল রেসালতে বিশ্বাস অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলকে সত্য মনে করা, আর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং সর্বশেষ নবী একথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।

উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতি বিশেষ দান

২. এ আয়াতে আল্লাহ পাক উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতি তাঁর বিশেষ দানের উল্লেখ করে এরশাদ করেছেন যে, তোমাদেরকে এমন দ্বীন তথা এমন জীবন বিধান প্রদান করা হয়েছে, যার দাওয়াত দুনিয়ার প্রথম নবী রসূল থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল পর্যন্ত সকলেই দিয়েছেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর পর শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নবীরও উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। তাঁরা হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা এবং হযরত ঈসা (আঃ)। তাঁরা সকলেই তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন তা নতুন কিছু নয়; বরং সমস্ত নবী রসূলগণও এ দ্বীনই নিয়ে এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে সত্য একই। আর দ্বীন ইসলাম ব্যতীত যা কিছু রয়েছে তা পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বোঝাতে একটি সমান্তরাল রেখা টানলেন এবং এরশাদ করলেনঃ এটিই হল আল্লাহ পাকের পথ। এরপর ঐ সমান্তরাল রেখাটির ডানে বামে আরও কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এই পথগুলোর প্রত্যেকটির উপর শয়তান বসে আছে, সে মানুষকে নিজের দিকে আহ্বান করছে, এরপর একখানি আয়াত তেলাওয়াত করলেনঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ (সূরা আনআ'ম ঃ ১৫৩)

'আর নিশ্চয় এটি আমার সরল সঠিক পথ, অতএব তোমরা এ পথের অনুসরণ কর'। (আহমদ, দারেমী, নাসায়ী)

মূলতঃ এটিই হল দ্বীন ইসলাম অর্থাৎ এক আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রেরিত নবী রসূলগণকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর তরফ থেকে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ সমূহের সত্যতায় বিশ্বাস করা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখা। আর নবী রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তা মেনে চলা, আল্লাহ পাকের বিধানগুলো মেনে চলা, তাঁর পছন্দনীয় কাজ করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। এসব মৌলিক বিষয়ে ঈমান আনাই হল দ্বীন ইসলামের মূল কথা, সকল শরীয়ত এর উপর একমত।

(৩) আর সকলের প্রতি এ নির্দেশ রয়েছে,

اَنْ اَقِیْمُوا الدِّیْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِیْهِ

'তোমরা দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ, পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়োনা'।

অর্থাৎ যে কোন মূল্যে মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখ, পারস্পরিক বিরোধ থেকে বিরত থাক। মানুষ যখনই হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে প্রয়াসী হয় তখনই আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় পথ থেকে দূরে সরে পড়ে। এজন্যে এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ রয়েছে, দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখ অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে শরীয়ত বা জীবন বিধান তোমাদেরকে দান করেছেন তার উপর

কায়েম থাক, তাতে কোন রকম পরিবর্তন করোনা; বরং যথারীতি তার বিধান মেনে চল, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ কর।

وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيْهِ

মুসলমানদের ঐক্য অক্ষুন্ন রাখ

অর্থাৎ দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ সৃষ্টি করোনা, কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়োনা, হিংসা-বিদ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা-স্বার্থপরতা-হীনমন্যতা প্রভৃতি চারিত্রিক দুর্বলতাকে কাছেও আসতে দিওনা।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, পরস্পর দলাদলি করোনা, পরস্পরের ঐক্য হল রহমত আর ঐক্য ভেঙে যাওয়া হল আযাব।

হযরত আবুযর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল এক বিঘত পরিমাণ বর্জন করলো, (মুসলমানদের ঐক্যকে সামান্যও বিনষ্ট করলো) সে ইসলামের রশিকে নিজের ঘর থেকে সরিয়ে দিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মুসলমানদের দলের উপর আল্লাহ পাকের রহমত থাকে। (তিরমিযী)

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ.

'(হে রসূল!) আপনি মুশরেকদেরকে যে বিষয়ের দিকে (তৌহীদ) আহ্বান করেন, তাদের পক্ষে তা দুর্বহ ভার'।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে অত্যন্ত উদগ্রীব থাকতেন, অথচ তারা সর্বদা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে যে কল্যাণকর পথের দিকে আহ্বান করছেন অর্থাৎ তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপন করে জীবনকে সার্থক সুন্দর করার জন্যে আহ্বান করছেন, কিন্তু তাদের নিকট এ মুবারক আহ্বান অত্যন্ত দুর্বহ বোঝা মনে হয়, তারা কোন অবস্থাতেই এ আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত নয়। তারা মনে করে যেন আপনিই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে তৌহীদের বাণী শোনাচ্ছেন অথচ সকল নবী রসূলগণই যুগে যুগে তৌহীদের বাণী শুনিয়েছেন।

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ.

'আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে, তিনি তাকে হেদায়েত করেন'।

মূলতঃ হেদায়েত শুধু আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। কে হেদায়েতের যোগ্য আর কে অযোগ্য তা আল্লাহ পাকই ভালভাবে জানেন।

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে, তাঁর স্মরণে তন্ময় থাকে, আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েতের সৌভাগ্য দান করেন, তাঁদেরকে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে দেন, যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯)

'আর যারা আমার পথে সাধনা করে, আমি তাদেরকে আমার পথের হেদায়েত দান করি'।

সুফী সাধকগণ এ পর্যায়ে একটি তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেনঃ তাঁরা বলেছেন, যাদেরকে আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেন, তাঁরা হলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান, তাঁরা হলেন নবী সিদ্দীকগণ।

আর যাঁরা আল্লাহ পাকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর স্মরণে নিজেকে বিলীন করে দেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁদেরকে স্বীয় দরবারে হাযিরীর তওফিক এনায়েত করেন, তাঁরা হলেন আউলিয়ায়ে কেরাম, তাঁরাও ভাগ্যবান।[১]

وَمَا
تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَ
اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٤﴾
فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ
وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا
حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

১ .তফসীরে মাজহারী খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩১৩

তরজমা

(১৪) আর তারা নিজেদের নিকট জ্ঞান আসার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর (হে রসূল!) যদি আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সিদ্ধান্ত পূর্বেই স্থির না থাকত, তবে তাদের মীমাংসা হয়ে যেত এবং তাদের পর যারা (আসমানী) কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিপতিত রয়েছে।

(১৫) অতএব, (হে রসূল!) আপনি সেদিকেই (তৌহীদের দিকেই) আহ্বান করতে থাকুন এবং আপনাকে যেরূপ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তার উপর আপনি সুদৃঢ় থাকুন। আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না এবং (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আল্লাহ পাক যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তার প্রতি বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন তোমাদের মাঝে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ পাকই আমাদের ও তোমাদের প্রতিপালক। আমাদের আমল আমাদের জন্যে, তোমাদের কার্যকলাপ তোমাদের জন্যে। আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, আল্লাহ পাকই আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং তাঁরই নিকট সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) কাফের মুশরেকদের আপনি যে সত্যের দিকে আহ্বান করেন তা তাদের পক্ষে দুর্বহ ভার তথা অত্যন্ত কঠিন।

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ

আর এ আয়াতে তৌহীদের আহ্বানে সাড়া দেয়া কাফেরদের পক্ষে কেন কঠিন তার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, তৌহীদের আহ্বানে সাড়া দেয়না, আসমানী কিতাব তাদের নিকট থাকা সত্ত্বেও তা মেনে চলেনা; বরং আসমানী কিতাব সমূহে তাদের ইচ্ছা মাফিক পরিবর্তন করে, আর তারা এ পরিবর্তন তাদের মূর্খতার কারণেও করেনা, বরং তাদের জেদ এবং হঠকারিতার কারণেই করে, পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়, নিজ নিজ মঞ্চ তৈরী করতে থাকে, এসবই তাদের পরস্পরের জেদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের بغيا শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন জেদ। তবে তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অহংকার করে। এ অহংকারই তাদের ধ্বংসাত্মক আচরণের মূল উৎস হয়।

আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ 'কামুসে' بغى শব্দটির অর্থ লেখা হয়েছে "জুলুম করেছে, সুবিচার করেনি, বাড়াবাড়ি করেছে"। যাহোক, কাফের মুশরেক এবং আহলে

কিতাবরা এ সমস্ত অন্যায় করেছে, যার কারণে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেনি।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ তাদের এসব অপকর্মের শাস্তি অনতিবিলম্বেই হতে পারতো, এভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যেত কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাক পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মানুষ যত অন্যায়ই করুক, তাকে মৃত্যু পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হবে, এ সিদ্ধান্তের কারণেই তারা রক্ষা পাচ্ছে, অন্যথায় তাদের উপর আযাব আপতিত হতো, তাদের সকল জেদ ও কলহ-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটতো চিরদিনের জন্যে। যেহেতু আল্লাহ পাক কেয়ামতের ময়দানেই ভাল-মন্দের বিচার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাই তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি তারা এখন পাচ্ছেনা।

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ

'এবং তাদের পর যারা (আসমানী) কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা কোরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিপতিত রয়েছে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, ইহুদী-নাসারারা তাদের জেদের বশীভূত হয়ে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয় এবং নিজ নিজ মঞ্চ তৈরী করতে থাকে, তখন তাদের পরবর্তীরাও পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে এবং সন্দেহে নিপতিত হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই তারা পবিত্র কোরআনের আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, কাফের মুশরেক এবং ইহুদী নাসারারা তাদের পূর্ব পূরুষদের অনুসারী ছিল, আর পূর্ব পুরুষরা ছিল পথভ্রষ্ট তথা ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত ছিল, সত্য ধর্ম সম্পর্কে তারা সন্দেহে নিপতিত ছিল, ফলে তাদের অনুসারীদের মধ্যেও ঈমান ও একীন আসেনি, কাফের-মুশরেক এবং ইহুদী নাসারারাও সন্দেহের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ

'অতএব, (হে রসূল!) আপনি সেদিকেই (তৌহীদের দিকেই) আহ্বান করতে থাকুন এবং আপনাকে যেরূপ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তার উপর আপনি সুদৃঢ় থাকুন, আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না'।

অর্থাৎ (হে রসূল!) কাফের মুশরেকরা যত বিরোধিতাই করুক না কেন এবং পরিস্থিতি যত প্রতিকূলই হোক না কেন, আপনি দ্বীন ইসলামের প্রচারে অবিচল থাকুন, কাফেরদের বিরোধিতার কারণে কখনও বিচলিত হবেন না, আপনাকে যেমন আদেশ দেয়া হয়েছে আপনি তেমনি সুদৃঢ়ভাবে সত্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন, মানুষকে অবিচলিত চিত্তে সত্যের দিকে তথা তৌহীদের দিকে আহ্বান করতে থাকুন। কাফেরদের খেয়াল-খুশির অনুসারী হবেন না; বরং তাদেরকে পবিত্র কোরআন মেনে চলার আহ্বান জানান।

وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۭ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۭ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۭ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۭ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

আর সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করুন, আল্লাহ পাক যে মহান গ্রন্থ নাযিল করেছেন তার প্রতিই আমার বিশ্বাস, আর আমাকে এ আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি তোমাদের মধ্যে সুবিচার কায়েম করি, আর (হে রসূল!) আপনি একথাও ঘোষণা করুন, আল্লাহ পাক আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, তিনিই আমাদের মালিক খালেক, আমাদের কর্মের ফল আমরাই ভোগ করবো, আর তোমাদের কর্মের পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। অতএব, তোমাদের সাথে আমাদের কোন বিবাদ নেই। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, সেদিনই হবে সত্যের ফয়সালা, কে হক্ব এবং কে বাতিল সেদিনই তা প্রমাণ হবে। আর আমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের নিকটই ফিরে যেতে হবে। আমাদের কৃতকর্মের দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি হবেনা, আর তোমাদের কার্যকলাপ দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি হবেনা, আমরা তোমাদের মঙ্গল কামনা করি, তাই তোমাদেরকে সত্য গ্রহণের আহ্বান জানাই।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াত জেহাদের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ পাক দশটি আদেশ দান করেছেনঃ

দশটি বিষয়ের আদেশ

১. (হে রসূল!) আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তা সমস্ত নবী রসূলগণের নিকটই অবতীর্ণ হয়েছে, এটি নতুন কিছু নয়। অতএব (হে রসূল!) আপনি মানুষকে এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার আহ্বান জানান, পবিত্র কোরআনের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করুন।

২. আল্লাহ পাকের বন্দেগী এবং তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসের উপর আপনি সুদৃঢ় থাকুন এবং অন্যদেরকেও সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিন।

৩. কাফেররা পবিত্র কোরআনকে মিথ্যাজ্ঞান করে, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের উপাসনা করে, আপনি কখনও তাদের খেয়াল-খুশী মাফিক চলবেন না।

৪. আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের আকীদা ও বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করুন যে, আমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ সকল আসমানী গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস করি। কোন গ্রন্থকে মানা আর কোন গ্রন্থকে অমান্য করা আমার নীতি নয়।

৫. আমি তোমাদের মধ্যে সে বিধানেরই বাস্তবায়ন করি, যা আল্লাহ পাক আমার নিকট নাযিল করেছেন যার ভিত্তি হল সুবিচার।

৬. আমাদের এবং তোমাদের মা'বুদ এক আল্লাহ পাকই, আর কেউ নয়, তিনিই সকলের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টি তাঁর অনুগত এবং তাঁর মহান দরবারে সেজদারত রয়েছে।

৭. আমাদের কর্ম আমাদেরই জন্যে, আর তোমাদের কৃতকর্মের পরিণতিও তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তোমাদের কর্মের কোন দায়-দায়িত্ব আমাদের নেই, এমনিভাবে আমাদের কর্মেরও কোন দায়-দায়িত্ব তোমাদের নেই।

৮. তোমাদের সঙ্গে কোন বিতর্ক বা ঝগড়ার কোন প্রয়োজন নেই, প্রত্যেককে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে।

৯. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। পলায়ন বা আত্মগোপনের কোন ব্যবস্থা নেই, আর সেদিনই আল্লাহ পাক প্রত্যেকের জন্যে চূড়ান্ত ফয়সালা দেবেন, যার নিকট ঈমান ও নেক আমল থাকবে সে পুরস্কৃত হবে, আর যার নিকট ঈমান ও নেক আমল থাকবে না সে শাস্তি ভোগ করবে।

১০. দুনিয়াতে যে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, অবশেষে প্রত্যেককে অবশ্যই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[১]

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ
دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿١٦﴾
اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ۭ
اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾
اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾

১. তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৯

তরজমা

(১৬) আর যারা আল্লাহ পাককে মেনে নেয়ার পরও তাঁর সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের এ কলহ তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবান্তর, আর তাদের উপর আল্লাহ পাকের গজব এবং তাদের জন্যে করেছে কঠিন শাস্তি।

(১৭) আল্লাহ পাকই নাযিল করেছেন সত্য সহ কিতাব এবং দাঁড়ি পাল্লাও (ইনসাফ), আর (হে রসূল!) আপনি কি জানেন, হয়তো কেয়ামত অতি নিকটেই।

(১৮) যারা তা বিশ্বাস করেনা তারাই তা ত্বরান্বিত করতে চায়, আর যারা তাতে বিশ্বাস রাখে তারা কেয়ামত সম্পর্কে ভয় করে, তারা ভালভাবেই জানে যে নিশ্চয় তা ধ্রুব সত্য। জেনে রাখ, কেয়ামত সম্পর্কে যারা ঝগড়া করে, তারা অবশ্যই বিভ্রান্ত অবস্থায় দূরে পতিত রয়েছে।

(১৯) আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি পরম দয়ালু, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে রিয্ক দান করে থাকেন, আর তিনি অত্যন্ত প্রবল, পরাক্রমশালী।

তফসীরুল কোরআন

ইহুদী নাসারারা মুসলমানদের সঙ্গে গায়ে পড়ে বিবাদে লিপ্ত হতো। তারা বলতো যে, তোমাদের নিকট যে আসমানী কিতাব রয়েছে তা-তো সবে মাত্র নাযিল হয়েছে, আমাদের নিকট বহু পূর্ব থেকেই আসমানী কিতাব রয়েছে, আর তোমাদের নবীর বহু পূর্বে আমাদের নিকট আল্লাহর নবী এসেছেন, অতএব আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম, এভাবে ইহুদী-নাসারারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে মুসলমানদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতো।

আবদুর রাজ্জাক তফসীরকার কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ

(আর যারা আল্লাহ পাককে মেনে নেয়ার পরও তাঁর সম্পর্কে বিতর্ক করে)

কথা দ্বারা ইহুদী ও নাসারাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা ইহুদী নাসারারা মুসলমানদের সঙ্গে এ সম্পর্কে বিবাদ করতো।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ ইহুদীরা মুসলমানদের নিকট এসে বলতো, হযরত মূসা (আঃ) যে আল্লাহর নবী ছিলেন একথা তোমরাও মান, আমরাও মানি অর্থাৎ তাঁর নবুওয়্যত সম্পর্কে এবং তৌরাত যে আসমানী গ্রন্থ এ সম্পর্কে মুসলমান ইহুদী নাসারা সকলেই একমত, কিন্তু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত এবং কোরআন সম্পর্কে তোমরা দাবীদার, অথচ আমরা একমত নই, এমন অবস্থায় যে ধর্মের ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই, সে ধর্ম গ্রহণ করাই উত্তম। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এমন কূট-তর্ককারীদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।[১]

১. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১৫৯

এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ ...

'আর যারা আল্লাহ পাককে মেনে নেয়ার পরও তাঁর সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের এ কলহ তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবান্তর, আর তাদের উপর আল্লাহ পাকের গজব এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব এবং পবিত্র কোরআনের অবতরণের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত এবং প্রমাণিত হয়েছে। যারা পরিণামদর্শী, যারা কল্যাণকামী তারা এ সত্যধর্ম গ্রহণ করে জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করেছেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যেসব দূরাত্মা ইহুদী ভিত্তিহীন কথা বলে বিরোধ সৃষ্টি করে, তাদের উদ্দেশ্যে কঠিন কঠোর এবং ভয়াবহ শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা মুসলমানদের সাথে অহেতুক বিবাদ করতে আসে এবং মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ তাদের কলহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তাদের কঠিন শাস্তি অবধারিত, তাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা যেন মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় বর্বরতার যুগ ফিরে আসে এবং তারা যেন কলহ-দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে, তাই তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের গজব অনিবার্য।

اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ

আল্লাহ পাকই নাযিল করেছেন সত্য সহ কিতাব অর্থাৎ কোরআনে করীম।

'সত্য সহ' কথাটির তাৎপর্য হলো এমন কিতাব যা বাতিল থেকে দূরে, অথবা এর অর্থ হলো যে কিতাবে সঠিক আকীদা ও বিশ্বাসের কথা রয়েছে এবং যা সঠিক বিধি-নিষেধের শিক্ষা দেয়।

وَالْمِيْزَانَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই যেমন পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, তেমনি তিনি দাঁড়ি পাল্লাও প্রেরণ করেছেন।

কাতাদা (রঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'মিজান' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা ন্যায় বিচার উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা মিজান বা দাঁড়ি পাল্লা দ্বারা সঠিকভাবে পরিমাপ করা হয় তথা ইনসাফ বা সুবিচার কায়েম করা হয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানভী (রঃ) 'মিজান' শব্দের এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক সঠিক পরিমাপ করার আদেশ দিয়েছেন, ওজনে কম দেয়া বা ফাঁকি দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, 'মিজান' শব্দটি দ্বারা শরীয়তকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা শরীয়ত দ্বারাই সব কিছুর সঠিক পরিমাপ, সীমা এবং পরস্পরের মধ্যে ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত হয়।[১]

অতএব, আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হলো, আল্লাহ পাক হক্ব ও বাতিলকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন এবং ন্যায় বিচার কায়েম করার বিধানও এ মহান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করে, পবিত্র কোরআনের সত্যতাকে অবিশ্বাস করে এবং কেয়ামতের দিনের সেই কঠিন মুহূর্তকেও অস্বীকার করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

(হে রসূল!) আপনি কি জানেন? হয়তো কেয়ামত অতি নিকটবর্তী, আর কেয়ামতের দিনই তো দাঁড়ি পাল্লায় প্রত্যেকের আমল রাখা হবে, সেদিনই তো যে ঈমানদার এবং নেককার হবে সে সফলকাম হবে, আর যে বেঈমান ও বদকার হবে সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। আর এ পাপীষ্ঠরা জানেনা যে কেয়ামত কত নিকটবর্তী, যদি কেয়ামত এসে পড়ে তখন তাদের অবস্থা কত বিপজ্জনক হবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ. (সূরা আম্বিয়া ঃ ১)

'মানুষের হিসাব নিকাশের সময় সমাগত, কিন্তু তারা বে-খবর, গাফলতের কারণে তারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে'।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. (সূরা কমর ঃ ১)

'কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে'।

যাহোক, এমনিভাবে আরও বহু আয়াতে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ

"যারা কেয়ামতের উপর বিশ্বাস করেনা তারাই তা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা তাতে বিশ্বাস রাখে তারা কেয়ামত সম্পর্কে ভয় করে, তারা ভালভাবেই জানে যে, নিশ্চয় তা ধ্রুব সত্য'।

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩১৬

কেয়ামত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও যারা কেয়ামতের উপর বিশ্বাস করেনা, এমনকি কেয়ামত কী তা বোঝেও না, তারা কেয়ামতের জন্যে তাড়াহুড়ো করে এমনকি, কেয়ামত সম্পর্কে বিদ্রুপ করারও ধৃষ্টতা দেখায়। অন্যদিকে, যারা কেয়ামতের উপর বিশ্বাস করে তারা এ সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে, কেননা তারা জানে, কেয়ামত অনিবার্য এবং আসন্ন।

হাদীস শরীফে রয়েছে, এক ব্যক্তি চিৎকার করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্‌রামের দরবারে এভাবে আরজী পেশ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কেয়ামত করে হবে? এ ঘটনাটি একটি সফরের সময় ঘটেছিল। প্রশ্নকারী ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে একটু দূরে ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রশ্নের জবাবে বললেন, হ্যাঁ কেয়ামত অবশ্যই আসবে, তবে তুমি তার জন্যে কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সে বললো, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বত। তখন তিনি এরশাদ করলেন, যাঁর জন্যে তোমার মহব্বত, তুমি তাঁর সাথেই থাকবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় বলেননি, তবে প্রশ্নকারীকে কেয়ামতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

মূলতঃ কেয়ামতের দিন-ক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেউ কিছু জানেনা।[১]

أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِى ٱلسَّاعَةِ لَفِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ

'জেনে রেখ, কেয়ামত সম্পর্কে যারা ঝগড়া করে তারা অবশ্যই বিভ্রান্ত অবস্থায় দূরে পতিত রয়েছে'।

যারা কেয়ামতে বিশ্বাস করেনা এমনকি, কেয়ামত সম্পর্কে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট, গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং পথভ্রষ্ট অবস্থায় তারা এত দূরে সরে পড়েছে, যেখান থেকে সঠিক পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। যেদিন কেয়ামত তাদের সামনে হাযির হবে তখন অসহায় অবস্থায় ক্রন্দণ করা ব্যতীত তাদের আর কোন গতি থাকবেনা।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বর্ণনা করেন, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েকজন মুশরেক উপস্থিত ছিল। তিনি তাদের সম্মুখে কেয়ামতের আলোচনা করলেন, কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করলো না এবং বিদ্রুপ করে বললো, কেয়ামত কবে আসবে? তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, যেহেতু তারা কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করেনা, তাই কেয়ামত আসার জন্যে তাড়াহুড়া করে।

ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ.

'আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি পরম দয়ালু, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে রিয্‌ক দান করে থাকেন, আর তিনি অত্যন্ত প্রবল, পরাক্রমশালী'।

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-১০

পরম দয়ালু আল্লাহ পাক

আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি পরম দয়ালু, অতীব সদয়, তিনি পরম করুণাময়, তিনি নেককার, বদকার, ঈমানদার ও বেঈমান সকলকে রিয্ক দিয়ে থাকেন। যারা তাঁর সাথে শেরক করে, তাঁর একত্ববাদকে অস্বীকার করে, তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ থাকে, সর্বক্ষণ তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে, তাঁর নবী রসূলগণকে অস্বীকার করে, তাঁর মহান বাণী আসমানী কিতাবকেও অমান্য করে, অহরহ তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত উপভোগ করা সত্ত্বেও তাঁর নাফরমানীতে বিরতি দেয়না, এতদসত্ত্বেও পরম করুণাময় আল্লাহ পাক তাদের জীবিকা বন্ধ করেন না, তাদেরকে রিয্ক থেকে বঞ্চিত করেন না, কখনও তাদের জীবন যাত্রা স্তব্ধ করে দেন না, বরং তাদের প্রতিপালন করতে থাকেন, কেননা তিনি পরম করুণাময়, তাঁর বন্দাদের জন্যে তিনি অনন্ত অসীম দয়ালু।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) لطيف শব্দটির তরজমা করেছেন অত্যন্ত মেহেরবান।

তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হলো আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের কল্যাণকামী, তিনি বন্দাদের কল্যাণই কামনা করেন।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক অত্যন্ত বিনম্র ভাবে সুকৌশলে তাঁর বন্দাদের প্রতিপালন করে থাকেন।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহ পাক ভাল-মন্দ, নেক ও বদ নির্বিশেষে সকল বন্দার প্রতিই দয়া করে থাকেন। কারো অন্যায়-অনাচারের কারণে তাকে ধ্বংস করেন না।

কোন কোন তফসীরকার এর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ পাক মানুষের কল্যাণ সাধনে এবং তাদের বিপদ দূরীকরণে এমন কৌশল অবলম্বন করেন, যা মানুষের অজানা থাকে।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আল্লাহ পাকের জ্ঞান ভান্ডারের কোন সীমা পরিসীমা নেই। তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে কিছুই নেই। তিনি তাঁর বন্দাদের গুণাবলী প্রকাশ করে দেন, আর তাদের দোষগুলোকে গোপন রাখেন। আল্লাহ পাক এত দয়াময় যে, তিনি বন্দার প্রয়োজনের চেয়ে অধিক তাকে দান করেন আর তার সাধ্যের চেয়ে অনেক কম এবাদতের আদেশ দেন। এটি তাঁর দয়ামায়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান, তিনি একজনকে অন্যজনের হাত দিয়ে রিযক পৌঁছিয়ে থাকেন। কোন বন্দাকে তিনি ভোলেন না, ভাল কী মন্দ সকলেই তাঁর মাসোহারা ভোগ করে, এমনকি পবিত্র কোরআনে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ

---

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩১৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-২৭
তফসীরে মাআরোফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২১৮

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.

(সূরা হুদ ঃ আয়াত ঃ ৬)

'পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রাণী মাত্রেরই রিযকের দায়িত্ব আল্লাহ পাক গ্রহণ করেছেন, তিনি তাদের স্থায়ী অস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবগত। সুস্পষ্ট গ্রন্থে সব কিছুই আছে'।

তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বচ্ছল করে দেন, এটি বন্দার প্রতি তাঁর দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছন, বন্দার প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া অগণিত, তাঁর দয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো এই যে, তিনি বন্দাদের হেদায়েতের জন্যে পবিত্র কোরআনের ন্যায় মহান গ্রন্থ নাযিল করেছেন, বন্দাকে সত্য-উপলব্ধি করার জন্যে অনেক সুস্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম দলিল-প্রমাণ এ মহান গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন, এতদসত্ত্বেও যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে সদা ব্যস্ত থাকে, হেদায়েতের কাজে বাধার সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ পাকের আযাবের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু করুণাময় আল্লাহ তাঁর অনন্ত অসীম করুণার কারণে সেই আযাবকে বিলম্বিত করেন, অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির আদেশ প্রদান করেন না; বরং যথেষ্ট অবকাশ দিয়ে থাকেন যাতে করে কেউ যদি তওবা করার ইচ্ছা করে তবে তার সুযোগ থাকে। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাকই তো মানব জাতিকে দান করেছেন তার জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব। তিনিই মানুষকে দান করেছেন বিবেক বুদ্ধি, আত্মোপলব্ধি, তিনিই তার যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজন করে দিয়েছেন এবং তিনিই মানব জাতিকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া।

وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

আর তিনি অত্যন্ত প্রবল, তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

আ'মালুল কোরআন

لطيف এটি আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম সমূহের অন্যতম। এর শাব্দিক অর্থ হলো কোমল অন্তর। এর ব্যাখ্যা করে শেষ করা যায় না। তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, এ পবিত্র নামটি পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া লাভ করা যায়। যে অজু অবস্থায় এ পবিত্র নামটি আগে পরে দরুদ শরীফ সহ একশতবার পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উদ্দেশ্য সফল করে দেন। এ পবিত্র নামটির মধ্যে যে দয়া-মায়ার ভাব আছে, তার বহিঃপ্রকাশ হয়। হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানভী (রঃ) লিখেছেন, প্রত্যেক নামাযের পর اَللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. অধিক পরিমাণে পাঠ করলে আল্লাহ পাক রিযক বৃদ্ধি করে দেন। আল্লামা দায়রাবী (রঃ) এ বরকতময় নামটির

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-১১

অনেক ফজিলত লিখেছেন। অজু অবস্থায় "ইয়া লাতীফু" ১১৯ বার পাঠ করার নিয়ম লিখেছেন তিনি। অবশ্য পূর্বে ও পরে দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে। এ নামের বরকত অতি শীঘ্র প্রকাশ পায়। কিন্তু এজন্যে এর পাঠকের একীন এবং অন্তরের বিনয় ও ব্যাকুলতা, দেহের পবিত্রতা, রসনার সত্যবাদিতা এবং হালাল রিযক পূর্বশর্ত।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ
كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ
مِنْ نَّصِيْبٍ ۝٢٠ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ
مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ
وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٢١ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ
مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۭ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا
يَشَاۗءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۝٢٢

তরজমা

(২০) যে কেউ আখেরাতের ফসল চায় আমি তাকে তার ফসল বর্ধিত করে দেই। পক্ষান্তরে, যে কেউ দুনিয়ার ফসল চায়, আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই, কিন্তু আখেরাতে তার প্রাপ্য কোন অংশ নেই।

(২১) তবে কি তাদের এমন শরীকও রয়েছে, যারা তাদের জন্যে এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ পাক দান করেননি। ফয়সালার জন্যে একটি সিদ্ধান্ত যদি পূর্বেই স্থির হয়ে না থাকত, তবে এখনই তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। আর নিশ্চয় জালেমদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(২২) (হে রসূল!) আপনি দেখতে পাবেন, সীমা লঙ্ঘনকারীরা তাদের কৃতকর্মের জন্যে ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে অথচ তা তাদের উপর আপতিত হবেই হবে, আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা বেহেশতের বাগানে থাকবে, তারা যা কিছু চাইবে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাই রয়েছে। এটিই তো বিরাট মর্যাদা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের দয়া-মায়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ মোমেনের কর্তব্য হলো আখেরাতের সাফল্যের জন্যে অধিকতর চেষ্টা করা, এরশাদ হয়েছেঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا

যে পরকালীন জীবনের সাফল্য চায় আল্লাহ পাক তাকে তা বর্ধিত করে দেন। একের বদলে দশ দেয়ার বিধান রয়েছে, তা সাতশ' গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পক্ষান্তরে, যারা দুনিয়াকেই সব কিছু মনে করে, আর দুনিয়াই তাদের একমাত্র কাম্য হয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়াতেই কিছু দিয়ে দেন, আখেরাতে তারা হয় বঞ্চিত।

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমলের ফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকে তাই পাবে যার নিয়ত সে করে। যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের জন্যে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের জন্যেই হয়। অন্যদিকে যে দেশত্যাগ করে দুনিয়ার লাভের জন্যে অথবা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার এ হিজরত ঐ উদ্দেশ্যেই হবে।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা এ উম্মতকে সুসংবাদ দাও নাম যশ খ্যাতি অর্জনের, বিজয় লাভের এবং দুনিয়াতে ক্ষমতা পাওয়ার, তবে যে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আখেরাতের কাজ করে, আখেরাতে সে কিছুই লাভ করবে না।[১]

দুনিয়ার প্রাধান্য দোযখের শাস্তির কারণ হয়

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনের সাফল্য কামনা করে আল্লাহ পাক তাকে ঐ সাফল্য বর্ধিত করে দেন। আর যে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সাফল্য চায়, আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়া থেকে কিছু দান করেন। যে আখেরাতের উপর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ পাক তার জন্যে আখেরাতে দোযখের শাস্তি ব্যতীত কিছুই রাখেন না।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ যে ব্যক্তি আখেরাতের সাফল্য চায়, আল্লাহ পাক তাকে নেক আমলের তৌফিক বাড়িয়ে দেন এবং নেক আমলের সওয়াবও বর্ধিত হারে দান করেন। পক্ষান্তরে, যার সকল সাধনার উদ্দেশ্য হয় দুনিয়ার এ জীবনের সাফল্য, আখেরাতের প্রতি তার কোন আকর্ষণ থাকেনা, তার দুনিয়া আখেরাত দোজাহান থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কেননা আখেরাতের ব্যাপারে সে নিজেই কিছু আশা

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩১৮-১৯
২. তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬

করেনি, আর দুনিয়ার ব্যাপারে কিছু দেয়া না দেয়া আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে দুনিয়া থেকে কিছু দিয়ে থাকেন, আর আখেরাতে দোযখ তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।[১]

এ আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আখেরাতের সাফল্য কামনা করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে আখেরাতের সওয়াব বা শুভ-পরিণতি বৃদ্ধি করে দেন। অন্যদিকে, যারা শুধু দুনিয়া চায় তাদের দুনিয়ার সম্পদ বৃদ্ধি করে দেয়ার কোন অঙ্গীকার করা হয়নি; বরং দুনিয়ার কিছু দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা আখেরাতের সাফল্যের জন্যে অধিকতর সচেষ্ট হওয়ার তাগিদ রয়েছে। আর যে শুধু দুনিয়ার সাফল্য কামনা করে, আখেরাতে তার কোন অংশ নেই বলেও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা আখেরাতের সাফল্য লাভের জন্যে তথা জান্নাত লাভের জন্যে পূর্বশর্ত হলো ঈমান, আর যে শুধু দুনিয়ার সাফল্যের প্রার্থী সে ঈমান থেকেই বঞ্চিত।[২]

আয়াতের মর্মকথা

মূলতঃ যা কাম্য হওয়া উচিত তা হলো শুধু আখেরাতের সাফল্য, কেননা দুনিয়াতে যা প্রাপ্য তাতো অবশ্যই আসবে, তার জন্যে অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই। যা চাওয়া এবং পাওয়ার প্রয়োজন তা হলো পরকালীন জীবনের সাফল্য। যারা প্রকৃত মোমেন, যারা কল্যাণকামী, পরিণামদর্শী তারা দুনিয়া পরিত্যাগ করেন না, তবে দুনিয়ার লোভে কখনও আখেরাতের কথা ভুলে যান না। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে তারা দুনিয়ার কাজ করেন, দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাক যা দান করেন, সে নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হন, আর সর্বদা আখেরাতের সাফল্যের জন্যে সাধনায় রত থাকেন। এটিই সাফল্যের পথ, আর এটিই কাম্য। এখানে প্রশ্ন হতে পারে তবে কি দুনিয়া পরিত্যাজ্য? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথার জবাব দিয়েছেন এভাবেঃ

اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لأخرتك بقدر بقاءك فيها

"দুনিয়াতে তোমার অবস্থান অনুপাতে দুনিয়ার জন্যে কাজ কর, আর আখেরাতে অবস্থান অনুযায়ী তার জন্যে কাজ কর'।

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, একটি সীমিত সময়ের জন্যে মানুষ দুনিয়াতে আসে, আর আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী, অতএব আখেরাতের জন্যে অধিকতর সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, যেমন কোরআনে করীমেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

'আর আখেরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী'।

---

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-১১
২. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১৬২

সূফী সাধক মওলানা রুমী (রঃ) বিষয়টিকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেনঃ

آب در کشتی ہلاک کشتی است = آب اندر زیر کشتی پشتی است

'পানি ব্যতীত নৌকা চলেনা, কিন্তু যদি পানি ঐ নৌকার ভেতর প্রবেশ করে তবে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে'।

অর্থাৎ দুনিয়ার সম্পদ ব্যতীত জীবন-তরী অচল, কিন্তু দুনিয়ার মোহ যদি মানব অন্তরে প্রবেশ করে, দুনিয়ার লোভ যদি তাকে পেয়ে বসে তবে তার ধ্বংস অনিবার্য। দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন–

کہو نہ جا اس سحر و شام مین ای صاحب ہوش

ایک جہان او بہی ہین کہ جس مین نہ فردا ہے نہ دوش

'হে বুদ্ধিমান! এই সকাল সন্ধ্যায় হারিয়ে যেওনা, তোমার জন্যে আরো একটি বিশ্ব রয়েছে, যেখানে আগামীকালও নেই, গতকালও নেই'। তিনি আরো বলেছেন,

خودی کی یہ ہے منزل اولین = مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں

'তোমার জীবনের এটি হলো প্রথম মঞ্জিল মাত্র, হে মুসাফির! এটি তোমার আবাস-স্থল নয়, তোমাকে যেতে হবে দূরে অনেক দূরে'। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এ সত্যই ঘোষণা করেছেন এভাবেঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى.

(সূরা তোয়াহা ঃ ৫৫)

'এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি (এক নির্দিষ্টকাল অতিবাহিত করার পর) আবার তোমাদেরকে মাটিতেই ফিরিয়ে আনবো এবং (কিছুদিন পর) পুনরায় তোমাদেরকে মাটি থেকে বের করে আনব'।

অতএব, জীবনের পথ-পরিক্রমা এ পৃথিবীতেই সীমিত নয়, তাই পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা একান্ত জরুরী। পক্ষান্তরে, যারা এ সত্য উপলব্ধি করেনা তারা এ ক্ষণস্থায়ী জগতের ক্ষণভঙ্গুর জীবন নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আর এ জগতকেই সব কিছু মনে করে, তাদের দৃষ্টিতে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কোন গুরুত্বই নেই আর এজন্যে কোন প্রস্তুতিও নেই, এ কারণেই আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ

আখেরাতে তার কোন প্রাপ্য অংশ নেই, সেদিন সে হবে রিক্ত হস্ত, হৃতসর্বস্ব।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

'তবে কি তাদের এমন শরীকও রয়েছে, যারা তাদের জন্যে এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ পাক দান করেননি? ফয়সালার জন্যে একটি সিদ্ধান্ত যদি পূর্বেই স্থির হয়ে না থাকত, তবে এখনই তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত'।

আল্লাহ পাক নবী রসূলগণের মাধ্যমে মানব জাতিকে সত্য ধর্ম পৌঁছে দিয়েছেন। দুনিয়া এবং আখেরাতের গুরুত্ব এবং পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। হালাল-হারাম, ভাল-মন্দ এক কথায় সব কিছুই মানব জাতিকে নবী রসূলগণ জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পথভ্রষ্ট লোকেরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত বিধানকে অমান্য করে, হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করে, তাই আলোচ্য আয়াতে এ প্রশ্ন করা হয়েছে, কাফেরদের এমন শরীক রয়েছে কি, যারা আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন বিধান দিতে পারে? যেহেতু কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেখেছেন যে তাদের চূড়ান্ত বিচার এবং শাস্তি কেয়ামতের দিন হবে, তাই দুনিয়াতে অন্যায় আচরণের অবকাশ পাচ্ছে। যদি এ সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের শেষ নিস্পত্তি বহু আগেই হয়ে যেত।

وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

'আর নিশ্চয় জালেমদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'।

সাধারণতঃ পবিত্র কোরআনে 'জালেম' বলে মুশরেকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়, কেননা অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (সূরা লোকমান)

'নিশ্চয় শেরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম'।

তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো এই যে, মুশরেকদের জন্যে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে, আর এ শাস্তি হলো শেরকের কারণে।

পরবর্তী আয়াতেও মুশরেকদের দুর্গতির কথা এভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ

'(হে রসূল!) আপনি কেয়ামতের দিন জালেমদেরকে দেখবেন, তাদের শেরক ও অন্যান্য পাপাচারের শাস্তির ভয়ে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে, অথচ তা তাদের উপর আপতিত হবেই হবে'।

অর্থাৎ কাফের মুশরেকরা যত লম্ফ-ঝম্প দিক না কেন, আর যত বাড়াবাড়িই করুক না কেন, কেয়ামত দিবসে কিন্তু তাদের অবস্থা অন্য রকম হবে, দোযখের আযাবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা কাঁপতে থাকবে। সেদিন তাদের আত্মরক্ষার কোন পথই খোলা থাকবেনা। (হে রসূল!) আজ আপনি কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার, তাদের দম্ভ অহংকার দেখছেন, আর কেয়ামতের দিন তাদের অসহায় অবস্থা অবশ্যই দেখতে পাবেন। আপনি সেদিন দেখবেন যে, তারা থর থর করে কাঁপছে এবং কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কোন অবস্থাতেই তারা রক্ষা পাবে না।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ

'আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা বেহেশতের বাগানে থাকবে, তারা যা কিছু চাইবে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাই রয়েছে। এটিই তো বিরাট মর্যাদা'।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, যখনই কাফের মুশরেকদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে ঈমানদার ও নেককারদের পুরস্কারের ঘোষণাও স্থান পায়। পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের মুশরেকদের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাই এ আয়াতে ঈমানদার ও নেককারদের পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে।

কাফেররা কেয়ামতের দিন কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। তাদের অপরাধ যেমন অমার্জনীয় ছিল, শাস্তি হবে তেমনি কঠিনতর, অন্যদিকে ঈমানদার ও নেককারগণ পরম শান্তি লাভ করবে এবং অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভ করবে, সর্বোত্তম, সুস্বাদু খাবার তাদেরকে পরিবেশন করা হবে। সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক তারা পরিধান করবে। এমনকি, জান্নাতবাসীগণের অন্তরে যখন যে আকাঙ্খার উদ্রেক করবে, সঙ্গে সঙ্গে তা পূর্ণ করা হবে, আর এমন নেয়ামত দান করা হবে, যা পৃথিবীতে কেউ দেখেনি, তার নামও কেউ শোনেনি, এমনকি দুনিয়াতে কেউ এমন নেয়ামতের কথা চিন্তাও করেনি, আর এটিই হলো আলোচ্য আয়াতের ঘোষণাঃ

الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ

অর্থাৎ বিরাট মর্যাদা যা পৃথিবীতে অকল্পনীয়, জান্নাতবাসীদের জন্যে যা অপেক্ষা করছে। এটিই বিরাট সাফল্য, এটিই পরিপূর্ণ নেয়ামত।

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ
قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ
حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ
افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ
اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾

তরজমা

(২৩) এটিই সেই সুসংবাদ, যা আল্লাহ পাক তাঁর ঈমানদার ও নেককার বন্দাগণকে দান করে থাকেন। (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান চাইনা, শুধু আত্মীয়তার সূত্রে সৌহার্দ ব্যতীত। যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্যে কল্যাণ বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অতীব গুণগ্রাহী।

(২৪) তারা কি বলতে চায় যে তিনি আল্লাহ পাক সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছেন, যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে তিনি (হে রসূল!) আপনার অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দিতেন। আল্লাহ পাক মিথ্যাকে মুছে দেন এবং তাঁর মহান বাণী দ্বারা সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি মানুষের মনের কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঈমানদার ও নেককার লোকদের জন্যে চির শান্তির কেন্দ্র বেহেশতের খোশখবরী রয়েছে। এ আয়াতে ঈমান ও নেক আমলের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করে এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ঈমানদার ও নেককারদেরকেই এ সুসংবাদ দান করেন যে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত, নিঃসন্দেহে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সুসংবাদ। তবে এ সুসংবাদের জন্যে পরিপূর্ণ ঈমান এবং ঈমান মোতাবেক নেক আমল পূর্বশর্ত। পবিত্র কোরআন একদিকে পাপীষ্ঠদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে, অন্যদিকে ঈমানদার ও নেককার লোকদেরকে আল্লাহ পাকের অগণিত নেয়ামতের সুসংবাদ দেয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা ঈমান আনয়নে প্রস্তুত না হয় এবং সৎ কর্মে আকৃষ্ট না হয়, তাদের সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, তাদের অন্তর রুগ্ন, তারা ভাগ্যাহত, তারা নবীর আন্তরিকতায় বিশ্বাস করেনা, তিনি যে তাদেরকে সৎ পথে আনার জন্যে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট রয়েছেন এ সত্যও তারা উপলব্ধি করেনা।

قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রকার প্রতিদান চাইনা, শুধু আত্মীয়তার সূত্রে সৌহার্দ ব্যতীত, অতএব তোমরা অন্ততঃ আমার সাথে যে আত্মীয়তা রয়েছে তা স্মরণ রাখ এবং আমার প্রতি যে অকথ্য নির্যাতন করা হয় তা বন্ধ কর। আত্মীয়তার যে সম্পর্ক আমার সাথে তোমাদের রয়েছে, তা বিস্মৃত হয়োনা। বোখারী শরীফে একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে اَلْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى কথাটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সাঈদ এবনে যোবায়ের (রাঃ) বললেন, আলোচ্য আয়াতে اَلْقُرْبٰى শব্দটি দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহলে বায়েতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, তুমি এ প্রশ্নের জবাব প্রদানে তাড়াহুড়া করে ফেলেছ। কথা হচ্ছে এই, কোরায়েশ গোত্রের সকল অংশের সঙ্গেই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তা ছিল, এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি কোরায়শ গোত্রের লোকদেরকে বলুন, আমি যে তোমাদের হেদায়তের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করছি, এর জন্যে আমি কোন প্রতিদান চাইনা, শুধু আত্মীয়তার ভিত্তিতে আমার সঙ্গে তোমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, আমি চাই তোমরা যেন তা বিনষ্ট না কর।

আল্লামা বগভী (রঃ) ইমাম শা'বীর (রঃ) সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখ, আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রেখ। মুজাহেদ (রঃ), একরামা (রঃ), মোকাতেল (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

একরামা (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমি তোমাদেরকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের দাওয়াত দিচ্ছি এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যের সুসংবাদ দিচ্ছি। কিন্তু এর জন্যে আমি কোন প্রকার বিনিময় চাইনা, শুধু এতটুকু চাই যেন তোমরা আমার সঙ্গে তোমাদের আত্মীয়তার যে সম্পর্ক রয়েছে তার হক্ব আদায় কর।

আত্মীয়তার সম্পর্কের হক্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে অবশ্যই আদায় করতে হয়। বস্তুতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সাথে মহব্বত রাখা মোমেন মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ সে পর্যন্ত মোমেন হবেনা যে পর্যন্ত তার নিকট তার পিতা এবং সন্তান থেকে আমি সর্বাধিক প্রিয় না হই।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরো একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিনটি কথা এমন রয়েছে যার মধ্যে এই তিনটি কথা থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ লাভ করবে। (১) আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বত তার অন্তরে সবচেয়ে বেশী হবে। (২) যদি কারো সঙ্গে তার মহব্বত থাকে তবে তা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে থাকবে। (৩) আল্লাহ পাক যখন কুফর থেকে নাজাত দান করেছেন, এরপর দ্বিতীয়বার কুফরীতে প্রবেশ করা এত অপছন্দনীয় হবে যেন অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দেয়া। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

এর আরো একটি ব্যাখ্যা রয়েছে, তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে এর অর্থ হলো তোমরা আল্লাহ পাকের সঙ্গে মহব্বত রাখ এবং বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন কর।

হযরত হাসান বসরী (রঃ)-ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের اَلْقُرْبٰى শব্দটির অর্থ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তাঁর বন্দেগী করে তথা নেক আমলের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হও, আর তাঁর প্রিয় ও পছন্দনীয় হও।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, "আমি তোমাদের হেদায়েতের জন্যে যে পরিশ্রম করছি, তার কোন বিনিময়ই তোমাদের নিকট চাইনা, তবে আমি শুধু এতটুকু চাই যে তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজন ও আমার সন্তানদের সঙ্গে মহব্বত রাখ, আর তাদের ব্যাপারে আমার কথা মনে রাখ। এ ব্যাখ্যা করেছেন সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এবং আমর এবনে শোয়ায়েব (রঃ)। এবনে আবি হাতেম, তেবরানী এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনার আত্মীয়-স্বজন কে? তিনি এরশাদ করেন, আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ) এবং তাদের দু' পুত্র।

এবনে আদি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে মহব্বত রাখা ঈমান, আর তাদের সঙ্গে শত্রুতা রাখা কুফর।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রঃ)-এর সঙ্গে মহব্বত রাখা ঈমানের আলামত আর তাদের সঙ্গে শত্রুতা রাখা কুফর। আনসারগণের (তদানীন্তন মদীনাবাসী মুসলমান) মহব্বত ঈমানের আলামত, আর তাদের সঙ্গে শত্রুতা রাখা কুফর। যে কেউ আমার সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেয়, তার প্রতি আল্লাহ পাকের লা'নত হয়। আর যে তাদের ব্যাপারে আমার কথা মনে রাখবে, আমি কেয়ামতের দিন তার কথা মনে রাখব। (এবনে আসাকের)

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আনসারদের সঙ্গে মহব্বত ঈমানের চিহ্ন, আর আনসারের সঙ্গে শত্রুতা রাখা মুনাফেকীর লক্ষণ।

(নাসায়ী)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ কোরায়শের সঙ্গে মহব্বত রাখা ঈমান, আর তাদের সঙ্গে দুশমনী রাখা কুফর। এমনিভাবে, আরবদের সঙ্গে মহব্বত রাখা ঈমান আর তাদের সঙ্গে দুশমনী রাখা কুফর। (তেবরানী)

কোন কোন তফসীরকার قربى শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সেই আত্মীয়-স্বজনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাদের জন্যে যাকাত গ্রহণ করা অবৈধ অর্থাৎ বনী হাশেম এবং বনী মোত্তালেব।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন– قربى শব্দটির দ্বারা হযরত আলী (রাঃ), হযরত আকীল (রাঃ), হযরত জাফর (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর তাঁদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি তোমাদের মাঝে দু'টি অত্যন্ত ভারী জিনিষ রেখে যাচ্ছি (১) আল্লাহ

পাকের কিতাব কোরআনে করীম যার মধ্যে হেদায়েত এবং নূর রয়েছে, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধর। (২) আমার আহলে বায়েত, আমি তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহলে বায়েত কে? তিনি বললেন, হযরত আলী (রাঃ), হযরত আকীল (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধরগণ।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর আহলে বায়েত বা একান্ত আপনজনদের সঙ্গে মহব্বত রাখার কথা বলেছেন, তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আহলে বায়েতের সঙ্গে কেউ মহব্বত রাখলে তা দ্বারা সে ব্যক্তিই উপকৃত হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দ্বারা উপকৃত হন না এবং তাঁর এর কোন প্রয়োজনও নেই। তিনি আল্লাহ পাকের প্রিয়তম এবং সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য বন্ধু, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃত, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, সমস্ত নবী রসূলগণের দলপতি, তবে যে তাঁর সঙ্গে মহব্বত রাখে, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়। এজন্যে অধিকাংশ তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন যে, "তোমাদের নিকট আমি শুধু এতটুকুই চাই, আমার আত্মীয়-স্বজন এবং আমার আহলে বায়েতের সঙ্গে তোমরা মহব্বত রাখ"।

যেহেতু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবীর আর্বিভাব হবেনা, তাই তাঁর দ্বীনের প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতের ওলামায়ে কেরামের প্রতি, আর তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, উম্মতের আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী হয়। তাই আল্লাহ পাক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মতকে আপনার আহলে বায়তের সঙ্গে মহব্বত রাখার হেদায়েত করুন।

ইমামুল মুসলেমীন হযরত আলী (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আধ্যাত্মিক সিলসিলার উত্তরসূরী, তাঁর বংশধরগণ বেলায়েতের উচ্চ মর্তবায় উন্নীত ছিলেন, আর এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

انا مدينة العلم وعلى بابها

'আমি এলমের শহর, আর আলী (রাঃ) হলো তার ফটক'।

আর এ কারণেই আউলিয়ায়ে কেরামের সিলসিলা হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। যেমন ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ), ইমাম জাফর সাদেক (রঃ), হযরত গওসুল আজম (রঃ) পিতৃ এবং মাতৃকূল– দু'দিক থেকে ইমাম হাসান (রাঃ) এবং হোসায়েন (রাঃ)-এর বংশধর।

এমনিভাবে, হযরত শেখ বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (রঃ), সৈয়দ মওদুদ চিশতী (রঃ), খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ) এবং সৈয়দ আবুল হাসান শাজলী (রঃ) প্রমুখ আউলিয়ায়ে কেরাম-তাঁরা সকলেই ছিলেন সৈয়দ বংশীয়। যাহোক, আলোচ্য বাক্যের মর্মকথা হলো, আমি তোমাদের নিকট কোন প্রকার বিনিময় চাইনা তবে তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার যে সম্পর্ক রয়েছে, তার কথা আমি তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আর আমি চাই যে, তোমরা আমার আহলে বায়েতের সঙ্গে মহব্বত রাখ।

আয়াতের মর্মকথা

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে যা বলেছেন তার দৃষ্টান্ত হলো হযরত মূসা (আঃ)-এর একটি কথা, যা তিনি তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ. (সূরা সফ ঃ ৫)

'হে আমার জাতি! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূল'। ঠিক এভাবেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার কোরায়শদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে সার্বিক কল্যাণ এবং সাফল্যের পথের দিকে আহ্বান করছি, যদি তোমরা ঈমান আন, নেক আমল কর তবে তোমাদেরকে জান্নাতের খোশখবরী দিচ্ছি। আমি যা কিছু করছি তা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করছি। আমি এজন্যে তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাইনা তবে শুধু এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার আত্মীয়তার কথাটুকু স্মরণ রেখ। যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আন তবে অন্ততঃ আমাকে কষ্ট দিওনা। তোমাদের সঙ্গে বংশীয় সূত্রে যে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করেই তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও। অন্যদের নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছাতে বাধা দিওনা। আত্মীয়তার দাবী ছিল এই যে, তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দেবে, কিন্তু তোমরা তাতে রাজী হওনি, তবে অন্ততঃ আমাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাক। তোমাদের কাছে আমি শুধু এতটুকুই চাই।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) যা বলেছেন, এতটুকুই তার মর্মকথা।[১]

وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

'যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্যে কল্যাণ বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অতীব গুণগ্রাহী'।

---

১. তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২২২-২৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-৩০-৩১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭

অর্থাৎ আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথাও বলেছেন যে, হে নবী! আপনি তাদেরকে আরো জানিয়ে দিন, যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, আল্লাহ পাক তার শুভ পরিণতি বাড়িয়ে দেবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যদিও حسنة শব্দটির অর্থ নেক আমল, তবে এ আয়াতের এ শব্দের দ্বারা একটি বিশেষ নেক আমলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর তা হলো প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আল-আওলাদের এবং তাঁর ওয়ারিষানদের মহব্বত।

মূলতঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যখন কারো মহব্বত বৃদ্ধি পায় তখন তা আল্লাহ পাকের মহব্বতে রূপান্তরিত হয়। এজন্যে সুফী সাধকগণ বলেন, 'ফানা ফিশ শেখ' অর্থাৎ পীর ও মুর্শেদের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়া, এ মর্তবা যখন অর্জিত হয়, তখন সে ব্যক্তি "ফানা ফির রসূল" এর মকামে উন্নীত হয়, অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বতে সে নিজেকে বিলীন করে দেয়। এ মর্তবা অর্জিত হবার পরই ফানা ফিল্লাহর মর্যাদা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) বলেছেন, আমি যখন প্রথমবার হজ্জে যাই তখন শুধু আল্লাহ পাকের ঘর কা'বা শরীফকেই দেখি, আল্লাহ পাকের নৈকট্য উপলব্ধি করিনি। দ্বিতীয়বার যখন হজ্জে যাই, তখন আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ দেখি এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্যও উপলব্ধি করি। এরপর যখন তৃতীয়বার হজ্ব করি, তখন কাবা শরীফ দেখিনি, তবে আল্লাহ পাকের নৈকট্যই উপলব্ধি করেছি। আর এটিই হলো ফানা ফিল্লাহর মকাম।

যেমন হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শেরক কি? তিনি বলেছিলেন,

طلب الجنة واعراض عن ربها

'জান্নাত চাওয়া আর জান্নাতের মালিক থেকে বিমুখ হওয়াই হলো শেরক'।

যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ পাকের মহব্বতে নিজেকে বিলীন করে দেয়, তারা 'ফানা ফিল্লাহ'র মকামে অবস্থান করে। এজন্যে মওলানা রুমী বলেছেনঃ

تو در او گم شو وصال اینست = گم شدن گم کن کمال اینست بس

'তুমি তাঁর মাঝে হারিয়ে যাও, এটিই মিলন। আর নিজের হারিয়ে যাওয়ার কথাটিও ভুলে যাও, এটিই হলো পরিপূর্ণতা বা আধ্যাত্মিক জগতের পরিপূর্ণ সাফল্য'। এজন্যেই আধ্যাত্মিক সাধনায় রত এক বুযুর্গ বলেছেন–

دست از طلب بازندارم تاکام من براید = یاتن رسد بجانان یاجان زتن براید

'আমি সে পর্যন্ত আমার সাধনা অব্যাহত রাখবো, যে পর্যন্ত আমার মকসুদ পূর্ণ না হয়। হয় প্রিয়তমের নিকট আমার দেহ পৌঁছবে, অথবা দেহ থেকে আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে'।

এজন্যেই আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য ব্যক্তিগণ আল্লাহ পাকের জিকর ব্যতীত জীবিত থাকাকে অপমান মনে করেন।

شرمندہ ام کہ بے تو زندہ ام

অর্থাৎ তোমার জিকর ব্যতীত জীবিত থাকার কারণে আমি লজ্জিত।

যাহোক, যারা আল্লাহ পাকের রসূলের মহব্বতে এবং আল্লাহ পাকের মহব্বতে নিজেকে বিলীন করে দেয় তাদের জন্যে বিশেষ সুসংবাদ রয়েছে পরবর্তী আয়াতাংশে।

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অর্থাৎ যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মহব্বত রাখে, তাঁর আহলে বায়েতের সঙ্গে মহব্বত রাখে, আল্লাহ পাক তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত গুণগ্রাহী, অর্থাৎ যারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে এবং এর বরকতে যারা আল্লাহ পাকের মহব্বত লাভেও ধন্য হয়, আল্লাহ পাক তাদের মহব্বতের কদর করেন, তিনি তাদের গুণগ্রাহী হন, তাঁর মহান দরবারে এমন বন্দাদের মর্তবা উন্নীত হয় অনেক বেশী।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ

'তারা কি বলতে চায় যে, তিনি আল্লাহ পাক সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছেন? যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি আপনার অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দিতেন, আল্লাহ পাক মিথ্যাকে মুছে দেন এবং তাঁর মহান বাণী দ্বারা সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন'।

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়া-প্রার্থী ও আখেরাতের সাফল্য অন্বেষণকারীদের উল্লেখ ছিল, এর সঙ্গে সঙ্গে একথাও ছিল যে, নবী রসূলগণ নিঃস্বার্থভাবে দ্বীন ইসলামের প্রচার করে থাকেন, যাতে করে আল্লাহ পাকের বন্দাগণ হেদায়েত কবুল করে দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ লাভ করতে পারে। কিন্তু দূরাত্মা অহংকারীরা নবী রসূলগণের হেদায়েত কবুল করা তো দূরের কথা, বরং তারা নবী রসূলগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের ধৃষ্টতা দেখায়। তারা বলে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক সম্পর্কে এবং পবিত্র কোরআন সম্পর্কে যা বলেন তা সত্য নয়; বরং এসব কিছু আপনারই উদ্ভাবন (নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক)। এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছুই হতে পারেনা, যা এ কাফেররা বলে। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ

অর্থাৎ (হে রসূল!) কাফেররা কি একথা বলে যে, আপনি আল্লাহ পাকের সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছেন? আপনা আপনিই নবুওয়াতের দাবী করেছেন? এমন অবস্থায়

فَإِنْ يَّشَإِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ

আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আপনার অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দিতে পারতেন এবং আপনার অন্তরে ওহীর প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ পাক তাতো করেননি, আপনার নিকট ওহীর অবতরণ অব্যাহত রয়েছে, কোন কল্যাণকামী মানুষের পক্ষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে এমন কথা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। মূলতঃ সেদিন দূরে নয়, যখন তাদের মিথ্যাবাদিতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে, সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ

কেননা আল্লাহ পাক মিথ্যাকে মুছে দেন এবং সত্যকে তাঁর মহান বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। (হে রসূল!) আল্লাহ পাক আপনার প্রতি তাঁর মহান দান অব্যাহত রাখবেন, ইসলামের শত্রুদের মুখোশ খুলে দেবেন। তখন সকলেই দেখবে, কে মিথ্যাবাদী আর কে সত্যবাদী। সবচেয়ে বড় মিথ্যা হল শেরক ও কুফর, আল্লাহ পাক তা মুছে দেবেন, আর সবচেয়ে বড় সত্য হলো তৌহীদ, আল্লাহ পাক তা সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে (হে রসূল!) আপনার অন্তরে সবর মোহরাঙ্কিত করে দিতেন। এমন অবস্থায় কাফেরদের তরফ থেকে যে নির্যাতন করা হয় তা আপনার পক্ষে অসহনীয় হতো না, আর কাফেরদের ব্যাপারে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন না।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন, তবে পবিত্র কোরআন ভুলিয়ে দিতেন। তাই আপনি তাদেরকে বলুন, যদি আমি আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা উদ্ভাবন করতাম তবে আল্লাহ পাক আমাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিতেন, কেননা আল্লাহ পাকের বিধান হলো এই যে, তিনি মিথ্যাকে মুছে দেন এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।[১]

اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

'নিশ্চয় তিনি মানুষের মনের কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট কারো কোন কথা গোপন নেই, এমনকি মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যেসব কথা গোপন থাকে, আল্লাহ পাক সে সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অবগত। অতএব, এ কাফেররা আল্লাহ পাকের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে যা বলে আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তাই তাদের শাস্তি বিধানে কোন প্রকার অসুবিধা হবার কথা নয়।

---

১. তফসীরে তাবারী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩২৪-২৫

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা, শুধু আত্মীয়তার সূত্রে সৌহার্দ ব্যতীত) নাযিল হয় তখন কিছু লোকের মনে এ কু-ধারণার উদ্রেক হলো যে, হয়তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওফাতের পর তাঁর আত্মীয়-স্বজনের অনুসরণ করার জন্যে আমাদেরকে বাধ্য করতে চান। এর সঙ্গে সঙ্গেই হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হাযির হলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কিছু লোক আপনার সম্পর্কে এই কু-ধারণা পোষণ করে আর আল্লাহ পাক মানুষের মনের গোপন কথা জানেন বলেই আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করছেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেন, যাদের মধ্যে এ কু-ধারণার উদ্রেক হয়েছিল, তারা তওবা করলো। তাই পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাতে ঐ সকল লোকদের তওবা কবুল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ
وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ
بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ
مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ
مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾ وَ
مِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ
وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا
كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ
فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾

তরজমা

(২৫) আর তিনিই তো সেই আল্লাহ পাক, যিনি তাঁর বন্দাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করেন। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ পাক তা ভাল করেই জানেন।

(২৬) এবং তিনি ঈমানদার ও নেককারদের দোয়া কবুল করেন আর নিজের দয়ায় তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ আরো বাড়িয়ে দেন, আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

(২৭) আল্লাহ পাক যদি তাঁর সকল বন্দার জীবিকা প্রশস্ত করে দিতেন তবে পৃথিবীতে অবশ্যই তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক পরিমাণেই রিয্ক দান করে থাকেন, নিশ্চয় তিনি তাঁর বন্দাগণের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তিনি তাদের অবস্থা লক্ষ্য করে থাকেন।

(২৮) তারা যখন নিরাশ হয়ে পড়ে তখনই আল্লাহ পাক বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁর রহমত বিস্তার করেন। আর তিনিই অভিভাবক, তিনি সকল প্রশংসার অধিকারী।

(২৯) আর আল্লাহ পাকের অন্যতম নিদর্শন হলো আসমান জমীন এবং তাতে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুর সৃষ্টি। যখন ইচ্ছা তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করতে সক্ষম।

(৩০) তোমাদের উপর যেসব বিপদাপদ আপতিত হয় তা তোমাদেরই কৃতকর্মের পরিণতি স্বরূপ, আর তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করতে থাকেন।

(৩১) আর তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবেনা। আর আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবকও নেই, সাহায্যকারীও নেই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিল। পরে তারা তওবা করে, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ

'আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ পাক তা ভাল করেই জানেন'।

عَنْ عِبَادِهٖ (তাঁর বন্দাদের)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা আউলিয়ায়ে কেরাম এবং আল্লাহ পাকের অনুগত বন্দাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর অনুগত বন্দাদের তওবা তিনি কবুল করেন।

তওবার তাৎপর্য

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, আন্তরিকভাবে পাপাচার বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প করা, কার্যতঃ পাপাচার পরিহার এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করার নামই হল তওবা।

সাহল এবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, মন্দ অবস্থা পরিহার করে ভাল অবস্থার দিকে ফিরে আসাই হল তওবা।

ইমাম বরযাভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ পূর্বে কৃত গুনাহ থেকে তওবা করার তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক।

(১) ফরজ এবাদত বিনষ্ট হওয়ার জন্যে অনুতপ্ত হওয়া,

(২) ফরজ এবাদত দ্বিতীয় বার আদায় করা,

(৩) মানুষের কোন হক্ব থাকলে তা দিয়ে দেয়া,

(৪) যেভাবে প্রবৃত্তিকে আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল, তেমনি তাকে আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে প্রস্তুত করা।

(৫) যেভাবে ইতোপূর্বে পাপাচারের মাধ্যমে প্রবৃত্তি স্বাদ ভোগ করেছিল, ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করা।

(৬) যেভাবে ইতোপূর্বে হাসি-ঠাট্টা করেছিল এভাবে এখন ক্রন্দন করবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) শরহে সুন্নাহ'তে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ তওবা হল কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া, আর যে গুনাহ থেকে তওবা করে সে বে-গুনাহ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়।

মুসলিম শরীফে হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি তোমাদের মধ্যে কেউ জনশূণ্য মরুভুমিতে থাকে আর তার উষ্ট্রীর দানা-পানি তথা সফর-সামগ্রী থাকে, এরপর সে উষ্ট্রীটি হারিয়ে যায় (অর্থাৎ এ ব্যক্তি নিদ্রিত হলে উষ্ট্রীটি কোন দিকে চলে যায়, অনেক অনুসন্ধানের পরও তাকে না পায়)। অবশেষে সে নিরাশ হয়ে কোন বৃক্ষের ছায়ায় তার দেহটি এলিয়ে দেয়। যখন তার নিদ্রা ভঙ্গ হয় তখন সে দেখে তার হারানো উষ্ট্রীটি দাঁড়ানো রয়েছে। এ উষ্ট্রীটি পেয়ে উষ্ট্রীর মালিক যত আনন্দিত হয়, কোন গুনাহগার বন্দা যখন গুনাহ থেকে তওবা করে আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে আসে তখন আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বন্দা যখন তার কৃত অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা করে, আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করেন।

আর মুসলিম শরীফে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে তওবা করবে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করবেন।

এবনে মাজা এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, পাপাচার থেকে তওবাকারী ব্যক্তি নিঃস্পাপ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়।

وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক গুনাহ সমূহ মাফ করে দেন, সে গুনাহ সগীরা হোক বা কবীরা। এটি আল্লাহ পাকের মর্জির ব্যাপার। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করেন, আর কাউকে তওবা না করলেও মাফ করেন।

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ

'আর তোমরা যা কিছু কর তিনি তা ভাল করেই জানেন'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ বাক্যটিতে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কাফের মুশরেক, অবাধ্য অকৃতজ্ঞ এবং পাপীষ্ঠ লোকদের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তোমাদের অপকর্ম আল্লাহ পাকের অজানা নয়, তিনি যে কোন সময় তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন। আর এতে সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের জন্যে এ মর্মে যে, কাফের মুশরেকরা আপনাকে বিশ্বাস করুক বা না করুক, তাতে আপনার কিছু যায় আসেনা। আপনার কাজ হলো শুধু তাদের কাছে আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া। তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ পাক গাফেল নন, সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে রয়েছে।[১]

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

'এবং তিনি ঈমানদার ও নেককারদের দোয়া কবুল করেন, আর নিজের দয়ায় তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ আরো বাড়িয়ে দেন এবং কাফেরদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি'।

ঈমানদার ও নেককারদের পুরস্কার ঘোষণা

যারা ঈমানদার ও নেককার, আল্লাহ পাক তাদের এবাদত ও দোয়া কবুল করেন, শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ পাক তাদের প্রতি দয়া করে তাদের সওয়াব তাদের যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশী বাড়িয়ে দেন, অথবা এর অর্থ হলো তারা যা চায় তার চেয়ে বেশী তাদেরকে দান করেন। ঈমানদার ও নেককারদের প্রতি এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ মেহেরবানী, অনন্ত করুণা।

পক্ষান্তরে, যারা কাফের তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

يَسْتَجِيْبُ

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩২৫-২৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-১৬
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একথাটির অর্থ হলো يثيب (আল্লাহ পাক সওয়াব দান করেন)।

ইমাম বয়যাভী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো এবাদতের সওয়াব দেয়া।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ঈমানদার ও নেককার বন্দাগণকে এবাদতের সওয়াব দান করেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফে রয়েছে, সর্বোত্তম দোয়া হলো আলহামদুলিল্লাহ (তিরমিযী, নেসায়ী, এবনে মাজা)।

বিখ্যাত সুফী সাধক হযরত ইব্রাহীম এবনে আদহামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল, আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি কিন্তু আমাদের দোয়া কেন কবুল হয়না? তিনি তার জবাবে বলেছেন, এর কারণ হলো আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাঁর এবাদতের এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তোমরা সে আদেশ পালন করোনি, তাই তোমাদের দোয়া কবুল হয়না।

وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ

আল্লাহ পাক তাঁর দয়ায় তাদের সওয়াব বাড়িয়ে দেবেন অর্থাৎ তাদের নেক আমল তো কবুল করবেনই, উপরন্তু নিজ করুণায় তাদের সওয়াবও বৃদ্ধি করে দেবেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একথার তাৎপর্য হলো ঈমানদার ও নেককার লোকদের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে তাদের সুপারিশ কবুল করবেন।

হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ঐ নেককারগণ তাদের ভ্রাতাদের পক্ষে সুপারিশ করলে আল্লাহ পাক তা কবুল করবেন। নেককারদের মর্যাদা বর্ণনার পর কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে এ আয়াতে যে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, মোমেনদের সওয়াব এবং কাফেরদের আযাব একই সঙ্গে ঘোষণার তাৎপর্য হলো, মোমেনদেরকে যত সওয়াব দেয়া হবে, কাফেরদেরকে ততই আযাব দেয়া হবে।[১]

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۭ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ

'আল্লাহ পাক যদি তাঁর সকল বন্দার জীবিকা প্রশস্ত করে দেন তবে পৃথিবীতে তারা অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করতো, কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক পরিমাণে রিযক দান করে থাকেন, নিশ্চয় তিনি তাঁর বন্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তিনি তাদের অবস্থা লক্ষ্য করে থাকেন'।

---

১. তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩২৭-২৮

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত খোবাব (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা দেখেছি, বনী কোরায়জা, বনী নজীর, বনী ক্বিনকা নামক ইহুদী গোত্রগুলোর নিকট অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল, তাদের সম্পদ দেখে আমাদের অন্তরেও সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

আসহাবে সুফফা

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত আসহাবে সুফফা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একদল লোক ছিলেন, যারা দ্বীনি এলম হাসিল করার লক্ষ্যে সর্বদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির থাকতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা তাঁরা সংরক্ষণ করতেন। তাঁদের কোন ঘর-সংসার ছিলনা, তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির থাকার মধ্যেই জীবন-সাধনার সাফল্য দেখতে পেতেন। তাঁদের সকলেই ছিলেন দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের বাগান থেকে খেজুরের ছড়া এনে মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেধে রাখতেন। ঐ খেজুর খেয়ে তাঁরা জীবন-ধারণ করতেন। একবার তাঁদের অন্তরে সম্পদশালী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

হাকেম, তেবরানী এ পর্যায়ে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান বাণীর উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীকে অপমানিত করে, সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে তৈরী হয়, আমি আমার ওলীদের জন্যে ভীষণ রাগান্বিত হই, আমার মোমেন বন্দা আমার তরফ থেকে আরোপিত ফরজ আদায়ের মাধ্যমেই আমার নৈকট্য লাভ করে। আর নফল এবাদতের মাধ্যমে মোমেন বন্দা আমার নৈকট্য-ধন্য হতে থাকে, এমনকি এক সময় আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি, আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কর্ণ, চক্ষু এবং হস্ত হয়ে যাই (অর্থাৎ সে যা চায় তাই আমি করে দেই)। এক কথায় আমি তার সাহায্যকারী হই, যদি সে আমার নিকট দোয়া করে, আমি তার দোয়া কবুল করি, আমার নিকট সে যা চায় আমি তাই তাকে দান করি, যদি আমার কোন বন্দার নিকট মৃত্যু পছন্দনীয় মনে হয়, তাকে দুঃখ দেয়া আমারও পছন্দনীয় হয়না, কিন্তু মৃত্যু ব্যতীত কোন গত্যন্তরও নেই (এজন্যে তাকে তার রূহ কবজ করার কষ্ট দিয়ে থাকি)।

আমার এমন কিছু বন্দা আছে যারা আমার নিকট এবাদতের দ্বার উন্মুক্ত করার আরজী পেশ করে, কিন্তু আমি তাকে বিরত রাখি, যেন তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি না হয় এবং তার অবস্থা বিনষ্ট না হয়।

আমার এমন কিছু বন্দাও আছে, অর্থ-সম্পদ থাকলে তার ঈমান ঠিক থাকে, যদি আমি তাকে পরমুখাপেক্ষী করে দেই তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।

আর আমার এমন কিছু বন্দাও রয়েছে, দারিদ্র্যের কারণেই তার ঈমান ঠিক থাকে, যদি তাকে আমি সম্পদশালী করি তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।

আমার কিছু বন্দা এমনও রয়েছে, যারা সুস্থ থাকলেই ঈমানও ঠিক থাকে, যদি আমি তাকে অসুস্থ করি তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।

আমার কিছু বন্দা এমনও রয়েছে, যদি আমি তাদেরকে সুস্থ করে দেই তবে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। আমি আমার বন্দাদের অবস্থা সম্পর্কে আমার এলম মোতাবেক ব্যবস্থা করি। আমি তাদের অন্তরে গোপন কথা জানি। আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত, তাদের সব কিছু তিনি লক্ষ্য করে থাকেন'।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্যে কোন কল্যাণ নেই, ক্ষেত্র বিশেষে অর্থ অনর্থেরও মূল হয়ে থাকে। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য কোন কোন ক্ষেত্রে ঈমানী জিন্দেগীর ব্যাপারে চরম ক্ষতির কারণ হয়, তাই আল্লাহ পাক প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে অর্থ-সম্পদ দান করে থাকেন। কার কি যোগ্রতা, কে কিসের যোগ্য, কার কত প্রয়োজন, কত পরিমাণ অর্থ-সম্পদে কার কল্যাণ রয়েছে? এসব বিষয় একমাত্র আল্লাহ পাকই অবগত। তিনি মহাজ্ঞানী, অতএব যাকে যা দান করা হয়েছে তার উপর পরিতৃপ্ত থাকা এবং মহান দাতা আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হওয়া একান্ত কর্তব্য।

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

'আর তিনিই তো মানুষের নিরাশ হওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন, আর তিনিই অভিভাবক, তিনি সকল প্রশংসার অধিকারী'।

পূর্ববর্তী আয়াতে এমন পাপীষ্ঠ লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা স্বয়ং আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, এরপর তাদের শোচনীয় পরিণতির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত ও দানের উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিভাবে আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যখন মানুষ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

একদিকে এভাবে আল্লাহ পাক নেককার বন্দাদের প্রতি তাঁর দানের কথা ঘোষণা করেছেন, অন্যদিকে আরো একটি বিষয়ের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু কাফের মুশরেকরা শুধু যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রতি এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রতি ঈমান আনত না তাই নয়, বরং তাঁকে এবং তাঁর

সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দিত এবং এই জালেমদের ঈমানের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম প্রায় নিরাশ হয়ে পড়তেন, তাই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, যেভাবে অনা-বৃষ্টির কারণে মানুষ যখন সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাক রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ঠিক তেমনি কাফের মুশরেকদের চরম অন্যায় অনাচারে নিরাশ হতে নেই, কেননা আল্লাহ পাক এ অবস্থাতেও তাদেরকে হেদায়েত নসীব করতে পারেন এবং তাদেরকে ইসলামের সহায়ক শক্তিতেও পরিণত করতে পারেন। এটি শুধু আল্লাহ পাকের রহমত, তাঁর অনন্ত করুণার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, তিনি মৃত, শুষ্ক জমীনকে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দেন। ঠিক এমনিভাবে তিনি অবাধ্য, পাপীষ্ঠ লোকের অন্তরকেও হেদায়েতের নূর দ্বারা আলোকিত করেন এবং তাকে ইসলামের খেদমত করার তৌফিক দান করেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ

মানুষ যখন বৃষ্টিপাত সম্পর্কে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে পড়ে এবং অনাবৃষ্টির ভয়াবহ পরিণতির জন্যে ভীত শঙ্কিত হয়, তখন আল্লাহ পাক তাঁর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেন। এটি তাঁর অনন্ত করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়, এজন্যে কখনও আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হতে নেই। নিরাশা কাফের মুশরেকদের বৈশিষ্ট্য, এটি কুফরী ও নাফরমানীরই অন্যতম নিদর্শন।

প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য

প্রকৃত মোমেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সে সর্বদা আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করে থাকে, কখনও আল্লাহ পাকের রহমত থেকে সে নিরাশ হয়না, চরম দুর্দিনেও এক আল্লাহ পাকের রহমতের আশায় সে সংগ্রামে এগিয়ে যায়, কেননা আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

'(হে রসূল!) আপনি আমার একথা জানিয়ে দিন, (হে আমার বন্দাগণ!) যারা পাপাচারের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়োনা'।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এক ব্যক্তি খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললো, হে আমীরুল মোমেনীন! দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এখনতো লোকেরা বৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেছে। হযরত ওমর (রাঃ) তখন বললেন, তুমি যেতে পার, ইনশাআল্লাহ এখন বৃষ্টি অবশ্যই হবে। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ

'তিনিই অভিভাবক, আর তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারী'।

অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিজগৎ এক আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, তিনিই তাদের অভিভাবক, তাদের কল্যাণ সাধন করা তাঁরই কাজ। সৃষ্টির কী প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজনের আয়োজন কিভাবে করতে হয় তা এক আল্লাহ পাকই জানেন, অতএব তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং ভরষা রাখা এবং তাঁর রহমতের আশা করা মোমেন মাত্রেরই কর্তব্য। আর তিনিই স্বয়ং প্রশংসিত, তাঁর প্রশংসার জন্যেও তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

অথবা এর অর্থ হলো, তাঁর প্রতিটি কাজই প্রশংসনীয়, সর্বত্র অভিনন্দিত, মানব জাতির সৃষ্টি, তার লালন-পালন, জীবন-যাপন, তার সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধন এক কথায় সব কিছুই এক আল্লাহ পাকের মহান দান।

অতএব, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর বন্দেগীতে মশগুল থাকাই মানুষের একান্ত কর্তব্য।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ

'আর আল্লাহ পাকের অন্যতম নিদর্শন হলো আসমান জমীন এবং তাতে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুর সৃষ্টি। যখন ইচ্ছা তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করতে পারেন'।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, মানুষ যখন অনাবৃষ্টির কারণে বিপদের সম্মুখীন হয়, বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ পাকের রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়, মানুষের রিযকের ব্যবস্থা করেন তিনি। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক শুধু যে মানুষের জীবিকার উপকরণ সমূহ সৃষ্টি করেন তাই নয়; আর এসবই তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের নিদর্শন তা-ও নয়; বরং বিশাল আসমান, বিস্তৃত জমীনের ন্যায় বিরাট সৃষ্টি এবং আসমান জমীনের মধ্যে যে অগণিত সৃষ্টিকে তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন তা-ও আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের জ্বলন্ত নিদর্শন। যিনি বিশাল সৃষ্টিকে এভাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছেন, তিনি যখন ইচ্ছা তাকে গুটিয়েও ফেলবেন, তাঁর জন্যে এটি অত্যন্ত সহজ কাজ। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ

'যখন ইচ্ছা তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করতে সক্ষম'।

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

'তোমাদের উপর যেসব বিপদাপদ আপতিত হয় তা তোমাদেরই কৃতকর্মের পরিণতি স্বরূপ, আর তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করতে থাকেন'।

পাপাচারের কারণেই বিভিন্ন সময় মানুষের উপর বিপদাপদ আপতিত হয়। আর মানুষের অনেক কিছু আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেন, অন্যথায় কেউ রক্ষা পেত না।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ সেই আল্লাহ পাকের! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ। মানুষের যে কোন

কষ্ট হয়, যেমন হোচট খায়, তার দেহে কোন প্রকার ব্যথা হয় তা কোন গুনাহ ব্যতীত হয়না। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, মোমেন যখনই কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, আল্লাহ পাক তার বদলে মোমেনের গুনাহ মাফ করে দেন এমনকি, কোন কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার বিনিময়েও। যখন এ আয়াত–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (সূরা যিলযাল)

নাযিল হয় তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আহার করছিলেন, তিনি এ আয়াত শ্রবণ করে খাবার বর্জন করলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তবে কি প্রত্যেকটি ভাল-মন্দ কাজেরই বদলা দেয়া হবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ শোন, যা কিছু মন মেজাজের খেলাফ হয় (কষ্টদায়ক) এসবই মন্দ কাজের বদলা, আর যত নেক আমল করা হয় তা আল্লাহ পাকের নিকট জমা থাকে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেনের রোগ তার গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়। (হাকেম, বায়হাকী)

কৃতকর্মের পরিণতি

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের যা রোগ বা বিপদাপদ হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আর যে গুনাহর জন্যে এসব বিপদ হয় আখেরাতে তার জন্যে পুনরায় শাস্তি দেয়া হবেনা। এটি অনন্ত অসীম করুণাময় আল্লাহ পাকের শানের খেলাফ। (আহমদ)

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে পাপীষ্ঠ লোকদেরকে, আর এ আয়াতের হুকুমও তাদের জন্যেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, যারা নেককার তাদেরকেও কখনও কখনও বিপদগ্রস্ত হতে দেখা যায়, আর সে বিপদ কোন্ গুনাহর কারণে হয়? আল্লামা বয়যাভী (রঃ) আরো লিখেছেন, বিপদাপদ শুধু যে গুনাহর জন্যে হয় তা-ও নয়; কখনও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় বন্দাকে পরীক্ষা করা, যদি বন্দা বিপদে সবর করে তবে আল্লাহ পাক তাকে অশেষ সওয়াব দান করেন এবং তার মর্তবা বুলন্দ করেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) তফসীরকার একরামা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোন বন্দার যদি কোন দুঃখ-কষ্ট হয় তবে তার একাধিক কারণ হতে পারে (১) হয়তো যে কষ্টটি তার হয়েছে, তা ব্যতীত আল্লাহ পাক তাকে মাফ করবেন না, তাই তাকে ঐ কষ্ট দেয়া হয়। (২) অথবা ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক কোন উচ্চ মর্তবা দান করতে চান, তাকে যে দুঃখ দেয়া হয় তার বিনিময়ে তাকে সওয়াব দান করা হয়, ফলে তাকে সে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছানো হয় এক কথায় বিপদাপদের কারণে গুনাহ মাফ হয়, অথবা মর্তবা উন্নীত করা হয়।

হযরত এমরান এবনে হোসায়েন (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন, তাঁকে লোকেরা দেখতে গেলেন, হযরত হাসান বসরী (রঃ) বললেন, আপনার এ কষ্ট সহনীয় নয়। তখন তিনি বললেন, এমন কথা বলোনা, এসব হলো গুনাহর কাফ্ফারা, অথচ আল্লাহ পাক অনেক গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

আবুল বেলাদ (রঃ) বলেন, আমি হযরত আলী এবনে বদর (রঃ)-কে বলেছিলাম, আমি যখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক তখন অন্ধ হয়ে যাই, এ অবস্থা কার অপরাধে? আমার দ্বারা তো তখন গুনাহ হয়নি। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতার গুনাহর বদলায় এ অবস্থা হয়েছে।

হযরত যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআন মুখস্ত করার পর যে ভুলে যায়, মনে করতে হবে, তাকে কোন গুনাহর কারণেই পাকড়াও করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ পাকের মহান বাণী কণ্ঠস্ত করার পর ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড় বিপদ আর কিছুই হতে পারেনা।

মূলতঃ যেভাবে আল্লাহ পাকের নেয়ামত তাঁর তরফ থেকে বিভিন্নজনের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে আসতে থাকে, তেমনি তাঁর তরফ থেকেই বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্টও নেমে আসে। সাধারণতঃ এর কারণ হয় পাপাচার, যেভাবে পানাহারের নিয়ম ভঙ্গ করলে স্বাস্থ্যের নেয়ামত হারাতে হয়, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করলে শুধু যে আল্লাহর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে হয় তাই নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষ বিপদগ্রস্তও হতে হয়। অতএব, গুনাহ হলো সকল দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ, আর কখনও আল্লাহ পাক কারো মর্তবা বৃদ্ধির জন্যেও তাকে বিপদগ্রস্ত করেন, সে যদি ঐ বিপদে সবর অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ পাক তাকে উচ্চ মর্তবা দান করেন।

وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

'আর তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবেনা। আর আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবকও নেই, সাহায্যকারীও নেই'।

অর্থাৎ যেসব বিপদাপদ তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারবেনা, আল্লাহ পাকের মোকাবেলায় কেউ তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেনা, কেউ তোমাদের বিপদ দূর করতে পারবেনা।[১]

১ . তফসীরে মাজহারী খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৩০-৩১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-১৮-১৯

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ
فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾ وَّيَعْلَمَ
الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾ فَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ
مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ
كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩২) আল্লাহ পাকের অন্যতম নিদর্শন হল সমুদ্রের বক্ষে পর্বত সদৃশ চলমান নৌযান সমূহ।

(৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্থির করে দিতে পারেন, পরিণামে নৌযান সমূহ সমুদ্র-পৃষ্ঠে অচল হয়ে থাকে, নিশ্চয় এতে রয়েছে বহু নিদর্শন সবর অবলম্বনকারী কৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে।

(৩৪) অথবা তিনি ইচ্ছা করলে মানুষের কৃতকর্মের পরিণামে নৌযানগুলোকে বিনষ্ট করে দিতে পারেন, অবশ্য অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন।

(৩৫) আর যারা আমার নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তারা যেন জানতে পারে যে কোথাও তাদের নিষ্কৃতি নেই।

(৩৬) প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র, পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের নিকট যা রয়েছে তা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও স্থায়ী, সেসব লোকদের জন্যে যারা ঈমানদার ও যারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরষা করে।

(৩৭) এবং যারা গুরুতর পাপ এবং অশ্লীলতা পরিহার করে চলে ও ক্রোধের সময় ক্ষমা করে থাকে।

তফসীরুল কোরআন

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ○ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের কিছু নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। পর্বতের ন্যায় নৌযান সমূহ সমুদ্র বক্ষে চলমান থাকে। সমুদ্রের বুক চিরে তারা এদিক সেদিক গমণাগমণ করে। যে বাতাস এই বড় বড় জাহাজগুলোকে সমুদ্রবক্ষে চলাচল করতে সাহায্য করে তা নিতান্ত আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের জীবন্ত নিদর্শন। তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে স্থির করে দিতে পারেন। এর পরিণামে সমুদ্র-পৃষ্ঠে নৌযানগুলো অচল হয়ে থাকবে। তখন ঐ নৌযানের আরোহীদের অবস্থা কত শোচনীয় হবে তা সহজেই অনুমেয়।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ

"নিশ্চয় এতে রয়েছে বহু নিদর্শন সবর অবলম্বনকারী কৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে'।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ঈমানের দু'টি ভাগ রয়েছে, অর্ধেক রয়েছে সবরে, আর অর্ধেক রয়েছে শোকরে। (বায়হাকী)

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ

'আর আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সমুদ্র বক্ষে ভাসমান ঐ নৌযানগুলোকে মানুষের অপকর্মের শাস্তি স্বরূপ বিনষ্ট করে দিতে পারেন'।

অন্যায়কারীদের অন্যায়ের পরিণতিতে তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু তা তিনি করেন না, কেননা আল্লাহ পাক কথায় কথায় মানুষকে পাকড়াও করেন না, তিনি অনেক কিছুই ক্ষমা করে থাকেন, কেননা তিনি অনন্ত অসীম দয়াময়, আর এজন্যেই মানুষ রক্ষা পাচ্ছে।

মূলতঃ আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র ক্ষমতা আসমান জমীনে তথা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

তাঁর ইচ্ছা ও মর্জিকে কেউ বাধা দিতে পারেনা। বাতাসকে স্তব্ধ করা, নৌযানগুলোকে নিমজ্জিত করা এবং আরোহীদেরকে ধ্বংস করা আল্লাহ পাকের পক্ষে আদৌ কঠিন কিছু নয়। কিন্তু তিনি করুণাময়, অনন্ত অসীম দয়াময়, তাই তিনি অনেককে ক্ষমা করেন।

وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ

'আর যারা আমার নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তারা যেন জানতে পারে যে, কোথাও তাদের নিষ্কৃতি নেই'।

অর্থাৎ যদি আল্লাহ পাক বায়ু প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে চলমান নৌযানগুলোকে বিনষ্ট করে আরোহীদেরকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করেন তবে আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জ্ঞানকারীরা জানতে পারবে যে, তাদের বাঁচার কোন পথ নেই।

বস্তুতঃ মানুষ তার কৃত অন্যায় অনাচারের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য। কোথাও আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। যারা আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতকে অস্বীকার করে তাঁর নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় তারা এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে যে, তাদের আত্মরক্ষার কোন পথই নেই।

অথবা এর এ অর্থও হতে পারে যে, যারা পবিত্র কোরআনকে মিথ্যা জ্ঞান করে এবং আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনা, কেয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হবে, তখন তারা উপলব্ধি করবে যে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই।[১]

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

'প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্পদ মাত্র, পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের নিকট যা রয়েছে তা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও স্থায়ী সেসব লোকদের জন্যে যারা ঈমানদার ও যারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরষা করে'।

শানে নুযুল

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) একবার তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ পাকের রাহে দান করেন, নিজের জন্যে কিছুই তিনি রাখেননি, তাই কোন কোন লোক তাঁর সমালোচনা করে, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষের সুখ-সম্পদ, ঐশ্বর্য দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। দুনিয়ার এ জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী, এ জীবনের যাবতীয় সুখ-সামগ্রীও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী।

মূলতঃ আখেরাতের জীবনই চিরস্থায়ী ও উত্তম, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى "আর আখেরাত হল উত্তম ও চিরস্থায়ী"।

অবশ্য আখেরাতের জীবন উত্তম শুধু তাদের জন্যে যারা ঈমানের সম্পদের অধিকারী, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ভরষাকারী।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। দুনিয়ার প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এটি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। যে কোন সময়ে এ জীবনের অবসান ঘটতে পারে, এমন অবস্থায় দুনিয়ার সব সত্যই মিথ্যায়

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৩২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩

পরিণত হয়। এখানকার সম্পদ, শক্তি-সামর্থ, সুখ-সামগ্রী, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, ক্ষমতা, জনপ্রিয়তা, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য সবই অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। দ্বিতীয়তঃ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার সব কিছু অতি সামান্য। আখেরাতের নেয়ামত বর্ণনাতীত এমনকি, কল্পনাতীত। আখেরাতের নেয়ামত অফুরন্ত, অথচ দুনিয়ার নেয়ামত সীমিত। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে, আখেরাতের নেয়ামত চিরস্থায়ী। আখেরাতের জীবনের ক্ষয় নেই, লয় নেই। তাই বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হল, দুনিয়ার জীবনে প্রয়োজনের আয়োজন করা, আর আখেরাতের সাফল্যের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা, যা স্থায়ী, তাকে অস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়া।

পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চির সাফল্য লাভের পথ-নির্দেশ করে এরশাদ হয়েছেঃ

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

অর্থাৎ আখেরাতের নেয়ামত লাভের জন্যে পূর্ব শর্ত হল ঈমানদার হওয়া। যারা ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত তারা আখেরাতের নেয়ামত থেকেও বঞ্চিত, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ.

'নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে সে মোমেনগণ, যারা তাদের নামাযে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে'।

وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

অর্থাৎ যারা ঈমানদার হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ভরষা রাখে।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হল, আল্লাহ্ পাকের প্রতি যাদের ঈমান মজবুত থাকে তারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দ উল্লাস না থাকার কারণে সবর করতে পারে, কেননা তারা নিশ্চিতভাবে জানে, দুনিয়ার এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে যদি সুখ-সামগ্রী না-ও থাকে, পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত। আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরষার মাধ্যমে ঈমানের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং ঈমান সুদৃঢ় হলেই আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করা এবং আল্লাহ্ পাকের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকা সহজ হয়, এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ

'আর যারা গুরুতর পাপ এবং অশ্লীলতা পরিহার করে চলে এবং ক্রোধের সময় ক্ষমা করে থাকে'।

অর্থাৎ আখেরাতের নেয়ামত লাভের জন্যে আরো একটি শর্ত হলো, কবীরা গুনাহ থেকে নিজেকে দূরে রাখা, অশ্লীল কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা, অন্যায়-অনাচার-ব্যভিচার পরিহার করে চলা।

সুদ্দী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, ইসলামী শরীয়তে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তাই হলো কবীরা গুনাহ্, যারা কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে তারাই আখেরাতের নেয়ামত লাভ করবে।[১]

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

'আর ক্রোধের সময় যারা ক্ষমা করে থাকে'।

অর্থাৎ আখেরাতের নেয়ামত লাভে যারা ধন্য হবে, তাদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ পরিহার করে চলে এবং মানুষকে ক্ষমা করে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যারা ব্যক্তিগতভাবে কষ্ট দিয়েছে, তিনি কখনও তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, বরং ক্ষমা করেছেন এমনকি, তাঁর প্রাণের শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করতে দ্বিধাবোধ করেননি এবং মানুষের সঙ্গে সর্বাবস্থায় বিনম্র ব্যবহার করেছেন; রাগান্বিত অবস্থাতেও তাঁর জবান মুবারক থেকে কোন অশালীন উক্তি বের হয়নি, এটি তাঁরই বৈশিষ্ট্য।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (সূরা কলম ঃ ৪)

'(হে রসূল!) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ গুণটি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.

(সূরা আলে এমরানঃ ১৫৯)

'(হে রসূল!) আল্লাহ পাকের রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন, যদি আপনি রুঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার পার্শ্ব থেকে সরে পড়ত'।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি দশ বছর যাবত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি, কিন্তু তিনি কখনও একথা বলেননি যে, তুমি এমন কাজ কেন করলে? অথবা তুমি এ কাজ কেন করলে না?

যারা আখেরাতের সাফল্য কামনা করে তাদের এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করা একান্ত কর্তব্য।

---

১. কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১-২৮

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى
بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ
الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ
فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾
وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ
سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾ ؕ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ
يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৩৮) আর যারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ পালন করে এবং নামায কায়েম করে, আর তাদের পরস্পরের মধ্যে পরামর্শক্রমে কর্তব্য স্থির করে এবং আমার প্রদত্ত রিযক থেকে কিছু পরিমাণ (আল্লাহর রাহে) ব্যয় করে থাকে।

(৩৯) আর যারা অক্রান্ত হলে বদলা নিয়ে থাকে।

(৪০) মন্দের পরিবর্তে অনুরূপ মন্দই সমীচিন তবে যে ক্ষমা করবে এবং মীমাংসা করবে, আল্লাহ পাকের নিকট তার পুরস্কার সুনিশ্চিত। নিশ্চয় আল্লাহ পাক জালেমদেরকে পছন্দ করেন না।

(৪১) আর যারা মজলুম হওয়ার পর প্রতিশোধ নিয়ে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

(৪২) প্রকৃত অভিযোগ শুধু তাদের বিরুদ্ধেই, যারা জনগণের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় উৎপাত করে, অশান্তি সৃষ্টি করে, তারাই সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৪৩) অবশ্য যারা সবর অবলম্বন করে এবং ক্ষমা করে (তাদের কথা স্বতন্ত্র), নিশ্চয় এটি অত্যন্ত বড় সৎ সাহসের কাজ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে দু'টি কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

১. দুনিয়ার জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, এ জগত ও জীবনের যাবতীয় সুখ-সামগ্রীও ক্ষণস্থায়ী, অতএব কেউ যেন দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে ভুলে না যায়, কেননা অবশেষে প্রত্যেককে যেতেই হবে পরপারে এবং এখানকার কর্মের ফলই তাকে ভোগ করতে হবে।

২. যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং ঈমানের দাবী মোতাবেক তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে, পাপাচার পরিহার করে জীবন-যাপন করে এবং ক্ষমা ও ঔদার্য্যের গুণ অর্জন করে, তাদের জন্যেই আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য সুনিশ্চিত।

আলোচ্য আয়াত সমূহে এমনি আরো কিছু গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে যা আখেরাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত লাভের জন্যে অত্যাবশ্যকীয়, এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করে, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে কখনো গাফলত করেনা এবং যারা যথা নিয়মে নামায কায়েম করে, কেননা নামায সর্বোত্তম এবাদত, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হবে।

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

'আর তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে কর্তব্য স্থির করে'।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার নিমিত্তে পরস্পরের পরামর্শ এবং সমঝোতা একান্ত জরুরী। কোরআনে করীমে এ বিষয়টির উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, এর প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব কত বেশী তা উপলব্ধি করা যায় একটি নির্দেশের মাধ্যমে, তা হলো আল্লাহ পাক স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ (সূরা আলে এমরান ঃ ১৫৯)

'(হে রসূল!) আপনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন'।

আর একথা সর্বজন-বিদিত যে, যখন কোন মোমেন ব্যক্তি অন্য মোমেনের সঙ্গে কোন বিষয়ে পরামর্শ করে তবে সে যেন এমন পরামর্শ দেয় যাতে ঐ ব্যক্তির দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত থাকে।

এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে আমানতদার হতে হবে অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির শুভাকাঙ্ক্ষী হতে হবে। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), সংকলিত হয়েছে মুসলিম শরীফে ও তিরমিযী শরীফে।

তেবরানী হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, তার আমানতদার হওয়া উচিত অর্থাৎ নিজের জন্যে সে যা পছন্দ করে তাই যেন পরামর্শপ্রার্থীর জন্যেও পছন্দ করে।

তেবরানী হযরত সামুরা এবনে জুন্দব (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয় তার আমানতদার ও বিশ্বস্ত হওয়া উচিত, সে পরামর্শ দিক বা না দিক।

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

'আর আমি তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে'।

অর্থাৎ যারা পরকালীন জীবনের সাফল্য কামনা করে তাদের কৃপণ হওয়া উচিত নয়; বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মানবতার কল্যাণে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা উচিত।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ

'আর যারা আক্রান্ত হলে বদলা নিয়ে থাকে'।

অর্থাৎ যদি কেউ তাদের প্রতি জুলুম করে তবে তারা সে জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করে কিন্তু এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেনা, বরং জুলুমের পরিমাণ মোতাবেকই বদলা নেয়, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

'আর মন্দের পরিবর্তে অনুরূপ মন্দই সমীচিন'।

فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

'তবে যে ক্ষমা করবে এবং মীমাংসা করবে আল্লাহ পাকের নিকট তার পুরস্কার সুনিশ্চিত, নিশ্চয় আল্লাহ পাক জালেমদেরকে পছন্দ করেন না'।

বস্তুতঃ ইসলাম জুলুমের বদলা নেয়ার অনুমতি দেয়, কিন্তু সীমালঙ্ঘনের অনুমতি দেয়না, যারা বদলা নিতে গিয়ে জুলুম করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না।

তফসীরকার এবনে যায়েদ বলেছেন, মোমেনদেরকে দু' দলে বিভক্ত করা হয়েছে, (এক) যারা জালেমদের থেকে তাদের জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করে, (দুই) যারা জালেমদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তাদেরকে মাফ করে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমোক্ত দলের কথাই বলা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যারা নিজের অপমানকে পছন্দ করেনা, তারা জালেম থেকে বদলা নেয়া জরুরী মনে করে। এক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ হলো কোন অবস্থাতেই যেন সীমালঙ্ঘন না করা হয়। আর যদি ক্ষমা করা হয় তবে তার গুরুত্ব সমধিক। আল্লাহ পাক তার পুরস্কার প্রদান করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা তাঁর প্রতি চরম জুলুম করেছিল, তাঁকে হত্যার জন্যে

অরণ্যের অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু আল্লাহ পাকের রহমতে যখন তিনি মিশরের ক্ষমতা লাভ করেন, তখন ঐ জালেম ভ্রাতারা তাঁর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ে হাযির হয়। কোন প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ তো দূরের কথা, তিনি তাদেরকে একটি ধমকও দেননি; বরং তাদের জন্যে দোয়া করেছেন এবং বলেছেন, আমি তো তোমাদেরকে মাফ করেছি, আল্লাহ পাকও যেন মাফ করেন তোমাদেরকে।

প্রিয়নবী (দঃ)-এর ক্ষমা এবং ঔদার্য্য

এমনিভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ পবিত্র জীবনেও ক্ষমা এবং ঔদার্য্যের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কাবাসী কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে অপরাধী হয়ে দন্ডায়মান হয় তখন তারা একথা ভাবতেও পারেনি যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করবেন, কেননা তারা জানতো যে সুদীর্ঘ তেরটি বছর যাবত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের (রা.) প্রতি তারা চরম নির্যাতন চালিয়েছিল, তাই তারা প্রমাদ গুণছিল কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের সকল আশঙ্কা দূরীভূত করে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন, 'আজ তোমরা মুক্ত', আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই'।

এ ঘোষণাটি সেদিন মক্কার কাফেরদের নিকট ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর, অভাবনীয়, অকল্পনীয়, কিন্তু যাঁর আবির্ভাবই হয়েছে রহমতুল্লিল আলামীন রূপে, তাঁর আদর্শিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

ষষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ৮০ জন কাফের মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল, মুসলমানগণ তাদেরকে বন্দী করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির করলে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন। ৪র্থ হিজরীতে অনুষ্ঠিত 'যাতুর রেকা'র যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের পাদদেশে বিশ্রামরত ছিলেন, গওস এবনে হারেস নামক এক ব্যক্তি তাঁকে একাকী বিশ্রামরত পেয়ে তরবারি হাতে নিয়ে তাঁর প্রতি হামলায় উদ্যত হয়। আল্লাহ পাকের রহমতে তিনি তখনই জাগ্রত হন এবং তাকে হামলা রত অবস্থায় দেখতে পান। তখন তরবারীটি তার হাত থেকে পড়ে যায়, তিনি তা হাতে নিয়ে নেন, এরপর তাকে তিনি ক্ষমা করেন।

লবীদ এবনে আসম নামক ইহুদী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যাদুটোনা করেছিল, তিনি নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি; বরং তাকে ক্ষমা করেছেন।

সপ্তম হিজরীতে খায়বরের যুদ্ধের পর যয়নব নাম্নী এক ইহুদী মহিলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তার বাড়ীতে দাওয়াত দিয়েছিল এবং সে তাঁর খাবারে বিষ মিশ্রিত করেছিল, যে গোশ্তে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছিল সে গোশ্ত আল্লাহ পাকের

কুদরতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছিল, তাই তিনি ঐ খাবার গ্রহণ করেননি; পরবর্তীতে ঐ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে অপরাধ স্বীকার করে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকেও ক্ষমা করেছেন।

এমনি আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ক্ষমা ও ঔদার্য্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে গালি দিচ্ছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসছিলেন, যখন ঐ ব্যক্তি অনেক বেশী গালি দেয়, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তার প্রদত্ত কিছু গালি তাকে ফিরিয়ে দেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পেছনে ছুটে আসেন এবং আরজ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি আমাকে গালি দিচ্ছিলো ততক্ষণ আপনি সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু যখন আমি তার কোন কোন গালি তাকে ফিরিয়ে দেই তখন আপনি উঠে আসেন, এর কারণ কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আপনার সঙ্গে একজন ফেরেশতা মোতায়েন ছিল, যে আপনার পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তির গালির জবাব দিচ্ছিল, আপনি যখন তার কোন কোন কথা তাকে ফেরত দিয়ে দিলেন অর্থাৎ সে যে গালি আপনাকে দিচ্ছিল, আপনিও তাকে অনুরূপ গালি দিয়েছিলেন, তখন আপনাদের মাঝে শয়তান এসে পড়েছিল, আর আমি শয়তানের সঙ্গে বসতে পারিনা, তাই উঠে এসেছি। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হে আবু বকর! তিনটি কথা রয়েছে, আর প্রত্যেকটি কথাই সত্য। (১) যদি কোন বন্দার প্রতি কেউ জুলুম করে, আর সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাকে মাফ করে, তখন আল্লাহ পাক এই ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি করেন এবং তাকে সাহায্য করেন। (২) যে ব্যক্তি দান খয়রাতের দ্বার উম্মুক্ত করে দেয়, আল্লাহ পাক তার মকসুদ পূর্ণ করেন, তার অর্থ-সম্পদের উন্নতি দান করেন। (৩) যে ব্যক্তি মানুষের নিকট এজন্যে অর্থ সম্পদ চায় যেন এভাবে সে অর্থ সম্পদশালী হয়, আল্লাহ পাক এভাবে তার রিযক কমিয়ে দেন। (আহমদ)

এতে একথা প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি প্রথম জুলুম করে, সে অত্যন্ত বড় জালেম, আর সে জুলুমের বদলা নেয়ার অনুমতি রয়েছে। আর যে কারো জুলুমকে মাফ করে দেয় এবং পরস্পর মীমাংসা করে নেয়, আল্লাহ পাকের নিকট তার জন্যে রয়েছে অশেষ সওয়াব।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন কেয়ামত হবে তখন একজন ঘোষক এ ঘোষণা করবে, আল্লাহ পাকের জিম্মায় কারো কোন সওয়াব থাকলে সে দন্ডায়মান হোক। এ ঘোষণার পর এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হবে এবং সে দুনিয়াতে তার প্রতি জুলুমকারীকে ক্ষমা করেছিল, এরপর হাসান বসরী (রঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক জালেমদেরকে পছন্দ করেন না'।

অর্থাৎ যারা জুলুম অত্যাচারের সূচনা করে তাদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না, অথবা যারা মানুষকে গাল-মন্দ দেয়ার সূচনা করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না।

অথবা এর অর্থ হলো, কারো প্রতি জুলুম করার পর তারা যদি জুলুমের বদলা নিতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে, এমন লোকদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না।[১]

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক সাহাবায়ে কেরামের বিশেষতঃ প্রথম যুগের মোহাজেরীনদের গুণাবলী সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের বৈশিষ্ট্যের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন।

সর্বপ্রথম মোহাজেরীনদের গুণাবলীর উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছেঃ

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

'যারা ঈমানের সম্পদের অধিকারী এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরষাকারী, তাদের জন্যেই রয়েছে আখেরাতের অফুরন্ত নেয়ামত'। কেননা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের পর কাফেরদের দ্বারা অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেছেন, এরপর এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরষা করে তারা ইসলামের জন্যে, সত্যের জন্যে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে বাড়ী-ঘর ছেড়ে, সর্বস্ব ত্যাগ করে হিজরত করেছেন। এর দ্বারা তাঁদের সুদৃঢ় ঈমান এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ভরষার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়, কেননা হিজরতের পরও তাঁরা বহু দিন যাবত চরম আর্থিক কষ্ট ভোগ করেছেন, কিন্তু আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানে সম্পূর্ণ অটল অবিচল ছিলেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্বের বিনিময়ে, তাঁরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ, জীবনের সকল সুখ-সম্পদ, বিষয়-বৈভব, আত্মীয়-স্বজন-প্রিয়জন এককথায় সব কিছুকে বর্জন করেছেন ইসলামের খাতিরে। এরপর সাহাবায়ে কেরামের নৈতিক মানের উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ

১ . তফসীরে মাজহারী খন্ড- (১০), পৃষ্ঠাঃ ৩০৭

যারা পাপাচার পরিহার করে চলে, যারা ন্যায় বিচার কায়েম করে, যারা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করে, তারাই আখেরাতের চিরসুখের অধিকারী হয়। সাহাবায়ে কেরাম মোহাজের হোক অথবা আনসার-সকলেই এ গুণের অধিকারী ছিলেন।

এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দেয়, আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করে, এর দ্বারা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেননা তিনিই সর্ব প্রথম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন। আর হয়তো এ কারণেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওফাতের পূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে তাঁর স্থলে ইমাম হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ আখেরাতের জীবনে সাফল্য লাভকারী নেককার মোমেনগণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শক্রমে তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে।

এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি, কেননা তাঁর খেলাফত কালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল পরামর্শ করা, তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

অর্থাৎ তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

এর দ্বারা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেননা ইসলামের প্রচার-প্রসারে এবং প্রতিষ্ঠায় হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আর্থিক সহযোগিতা অসামান্য। আল্লাহর রাহে দান করাই ছিল হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ

'আর যারা আক্রান্ত হলে বদলা নিয়ে থাকে'।

এর দ্বারা চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেননা তাঁর খেলাফতকালে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাঁকে জেহাদ করতে হয়েছে।[১]

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ

১. তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮-৩৯

আর যারা মজলুম হওয়ার পর বদলা নিয়ে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, তাদেরকে মন্দও বলা হবেনা, আর বদলা নেয়ার জন্যে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

'প্রকৃত অভিযোগ শুধু তাদের বিরুদ্ধেই, যারা অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় উৎপাত করে, অশান্তি সৃষ্টি করে, তারাই সেসব লোক যাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা অত্যাচারিত-উৎপীড়িত, তারা যদি পরিমিত প্রতিশোধ গ্রহণ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অবশ্য একথা সত্য যে, ক্ষমার আদর্শ সর্বকালেই মহৎ, প্রশংসনীয় এবং অভিনন্দিত হয়।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, প্রকৃত অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে যারা অন্যায়-অনাচার-অত্যাচারে লিপ্ত হয়, অথবা যারা অত্যাচারিত হবার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে যায় এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করে এমন লোকদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত। আর এ শাস্তি শুধু দুনিয়াতেই হবেনা; বরং আখেরাতেও তারা জুলুম অত্যাচারের জন্যে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

'তবে যারা সবর অবলম্বন করে এবং ক্ষমা করে (তাদের কথা স্বতন্ত্র), কেননা এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সৎ সাহসের কাজ'।

যে জালেমের জুলম সহ্য করে শুধু তাই নয়; বরং তাকে ক্ষমাও করে, এটি অত্যন্ত উত্তম কাজ। যারা এমন কাজ করে তারা মানুষের মাঝে অত্যন্ত উত্তম।

জুযাজ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো সবর অবলম্বনকারীকে তার সবরের জন্যে সওয়াব প্রদান করা হবে, আর এটি যে অত্যন্ত মহৎ এবং সৎ সাহসের কাজ একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ
لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۴﴾ وَتَرٰىهُمْ
يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ
وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿۴۵﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ
مِنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۶﴾

তরজমা

(৪৪) আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন, এরপর (সুপথে আনয়নে) তার কোন সাহায্যকারী নেই। আর (হে রসূল!) আপনি (আখেরাতে) সেই জালেমদেরকে দেখতে পাবেন যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন আপনি তাদেরকে বলতে শুনবেন, হায়! যদি কোনভাবে পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম!

(৪৫) (হে রসূল!) আপনি আরও দেখতে পাবেন তাদেরকে অত্যন্ত অপমানিত অবস্থায় অবনত দৃষ্টিতে দোযখের সম্মুখে হাযির করা হচ্ছে, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় আড় চোখে তাকাচ্ছে। আর মোমেনগণ কেয়ামতের দিন বলবে, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে এবং তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তারাই নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত, মনে রেখ! পাপীষ্ঠরা চিরকাল আযাবের মধ্যে থাকবে।

(৪৬) আল্লাহ পাক ব্যতীত তাদের এমন কোন সহায়ক থাকবেনা, যে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে, মূলতঃ আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন উপায়ই নেই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মোমেনদের গুণাবলী এবং শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হযেছে। আর এ আয়াত থেকে কাফের মুশরেক পাপীষ্ঠ দূরাচারীদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ

অর্থাৎ যাদের মধ্যে সঠিক পথে চলার কোন ইচ্ছাই থাকেনা, কখনও তারা সত্যের সন্ধান করেনা, এমন পথভ্রষ্ট লোকদের জন্যে কোন সহায়ক বা অভিভাবক থাকেনা যে তাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসবে।

মূলতঃ আল্লাহ পাকের দয়ায় মানুষ হেদায়েত লাভ করে, ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ অর্জন করে চরিত্র-মাধুর্য লাভ করে জীবনকে সার্থক করে, কিন্তু যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, তাঁর অফুরন্ত নেয়ামতকে অস্বীকার করে, তাঁর দয়া মায়াকে অবিশ্বাস করে তাদেরকে তাদের অধঃপতন থেকে কে রক্ষা করবে, এমন ভাগ্যাহত লোকদের কোন অভিভাবক নেই।

وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ

(হে রসূল!) আপনি কেয়ামতের কঠিন দিনে এ কাফেরদেরকে দেখতে পাবেন তারা মহা সংকটে বিপন্ন, বিপদগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে, অনন্যোপায় হয়ে তারা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে, যদি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করার কোন উপায় থাকত তবে আমরা ঈমানদার ও নেককার হয়ে ফিরে আসতাম, কিন্তু তাদের এ আকাঙ্খা কখনও পূর্ণ হবেনা, দুনিয়ার জীবন একবারই, এ সীমিত জীবনে যারা জীবনের মালিক আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলে, তাঁর অসংখ্য নেয়ামতের শোকর আদায় করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে তারাই হয় সফলকাম, তারাই লাভ করে আখেরাতে আল্লাহ পাকের অফুরন্ত নেয়ামত। পক্ষান্তরে, যারা দুনিয়ার এ জীবনের দিনগুলোকে গাফলতের অবস্থায় অতিবাহিত করে তথা আখেরাতের কথা ভুলে থাকে, জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে খেলা-ধূলায়, আনন্দ-উল্লাসে অতিবাহিত করে পরকালীন জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ না করে, আখেরাতে আক্ষেপ করা ব্যতীত তাদের কিছুই করার থাকবে না।

যেমন সূরা ওয়াল ফাজরে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ

'সে বলবে, হায় আক্ষেপ! যদি এ জীবনের জন্যে কিছু করে পাঠাতাম'।

আর এজন্যেই সূরায়ে মোজ্জাম্মিলে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ

'আর তোমরা তোমাদের মঙ্গলের জন্যে যা কিছু সৎ কাজ করে পাঠাবে আল্লাহ পাকের দরবারে তার সওয়াব বা শুভ-পরিণতি অবশ্যই পাবে আর তা হবে পুরস্কার হিসাবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর'। আর এজন্যে সূরা হাশরে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

'হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর প্রত্যেকের দেখা উচিত যে সে আগামী কালের জন্যে তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য কী করে পাঠিয়েছে (আয়াত ঃ ১৮)'।

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

অর্থাৎ (হে রসূল!) যে কাফেররা আজ সত্যের বিরোধিতা করছে, আপনাকে অবিশ্বাস করছে, কেয়ামতের দিনে তাদের অপমান লাঞ্ছনা দেখার মত হবে। ভীত-সন্ত্রস্ত আসামীর ন্যায় তাদেরকে হাযির করা হবে, অত্যন্ত অপমানিত অবস্থায় তাদেরকে দোযখের সম্মুখে একত্রিত করা হবে। অপমানে, লজ্জায়, আযাবের ভয়ে তারা চোখ তুলে তাকাবার সাহস করবেনা, এজন্যে তারা আড়চোখে দেখবে, কিন্তু তারা দোযখের যে শাস্তিকে ভয় করবে তা থেকে রক্ষা পাবেনা (আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

কাফেরদের এ অবর্ণনীয় দুর্গতি দেখে মোমেনগণ বলবে, প্রকৃত সর্বহারা সেসব লোকই যারা নিজেদের অপকর্মের কারণে শুধু যে নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে তাই নয়, বরং নিজেদের কুফরী ও নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ নিজেদের পরিবার-পরিজনকেও ধ্বংস করেছে।

اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ

'মনে রেখ, নিশ্চয় জালেমরা তথা কাফেররা আযাবের মধ্যে চিরকাল পড়ে থাকবে'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'জালেম' শব্দ দ্বারা কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা চিরস্থায়ী শাস্তি শুধু কাফেররাই ভোগ করবে। গুনাহগার মোমেনদেরকে কিছুকাল শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে জান্নাত দান করা হবে।[১]

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

'আর আল্লাহ পাক ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, যে তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করতে পারে'।

মূলতঃ এমন লোকদের জন্যে দুনিয়াতে সত্যের সন্ধান লাভের যেমন কোন পথ নেই, তেমনি আখেরাতেও জান্নাত লাভের কোন পথ নেই।

আয়াতের মর্মকথা

বস্তুতঃ দুনিয়ার জীবনে হেদায়েত লাভ করাই হল আখেরাতে জান্নাত লাভ করার পথ, যারা দুনিয়ার জীবনে হেদায়েতের পথ প্রত্যাখ্যান করে, প্রকৃত অবস্থায় তারা জান্নাতের পথই প্রত্যাখ্যান করে। আর এজন্যেই কোরআনে করীমের সূরা ফাতেহায় হেদায়েতের তৌফিকের জন্যে দোয়া চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে এভাবেঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

১. তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৭৫

'হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও'। এরপর সূরা বাকারার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে,

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

'এই কিতাব কোরআনে করীম হেদায়েত দানকারী সেসব লোকদেরকে যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় রয়েছে'।

অতএব হেদায়েত লাভের জন্যে ঈমান ও আল্লাহ পাকের ভয় পূর্বশর্ত। যদি এ শর্ত পাওয়া যায় তবেই তারা কোরআনে করীম থেকে হেদায়েত লাভ করবে, আর সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

'(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনিই সরল সঠিক পথে রয়েছেন'।

একথার তাৎপর্য হল হেদায়েত লাভের দু'টি মাধ্যম রয়েছে (১) পবিত্র কোরআন (২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ পবিত্র কোরআনকে মেনে চলতে হবে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। যারা এ দু'টি মাধ্যম গ্রহণ করবে তারাই হেদায়েত লাভ করবে। আর যারা দুনিয়াতে হেদায়েত লাভ করবে তারাই আখেরাতে জান্নাত লাভ করবে। যারা এ মাধ্যম অবলম্বন করবে না তারাই পথভ্রষ্ট হবে। আর যারা পথভ্রষ্ট হবে তাদের জন্যে জান্নাত লাভের কোন উপায় থাকবেনা। এটিই আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা।

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ
مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا
فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا
الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ
قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ
حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٥١﴾

তরজমা

(৪৭) (হে মানব জাতি!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ মেনে চল, সেদিন আসার পূর্বে যা আল্লাহ পাকের বিধানে সম্পূর্ণ অপ্রতিরোধ্য, যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়-স্থল থাকবেনা, আর যেদিন তোমাদের ব্যাপারে কেউ আল্লাহ পাককে নিবৃত্তকারীও থাকবেনা।

(৪৮) (হে রসূল!) এরপরও যদি তারা বিমুখ হয় (ঈমান আনয়নে বিরত থাকে তবে আপনি চিন্তিত হবেন না) আপনাকে আমি তাদের রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করিনি। আপনার দায়িত্ব তো শুধু আমার বাণী পৌঁছে দেয়া। আর নিশ্চয় আমি যখন মানুষকে আমার কোন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে তাতে আনন্দিত হয় আর যদি তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তাদেরই কৃতকর্মের পরিণামে, তখন মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

(৪৯) আসমান জমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে পুত্র সন্তান দান করেন।

(৫০) অথবা তিনি দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি করে দেন বন্ধ্যা, নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সর্বশক্তিমান।

(৫১) মানুষের এমন সাধ্য নেই যে আল্লাহ পাক তার সঙ্গে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতীত, অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে, অথবা তিনি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, সে আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী বাণী পৌঁছে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সবার উপরে, তিনি মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ঈমানদার ও নেককার মোমেনদের উদ্দেশ্যে চির শান্তির কেন্দ্র জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। এরপর এ সুসংবাদ জানা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনি, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস করেনি এবং পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহের আদেশ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّ مَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ

আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর

অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন কর, সেই মহা সংকটময় দিন আসার পূর্বেই তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও। মহা বিপদের দিন তথা কেয়ামতের দিন আসার পূর্বে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে আত্মরক্ষার

সর্বাত্মক চেষ্টা কর, কেননা কেয়ামতের দিন হল সম্পূর্ণ অপ্রতিরোধ্য, তা আসবেই আসবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ পাক ব্যতীত সেদিন কেউ আশ্রয় দিতে পারবেনা। নিজেদের পাপাচারের কথা সেদিন অস্বীকার করার উপায় থাকবেনা। আর অস্বীকার করলেও তার কোন ফল পাওয়া যাবেনা। কেননা সেদিন মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সাক্ষ্য দেবে। যে অঙ্গ দ্বারা দুনিয়াতে যে পাপকার্য করা হয়েছে সে অঙ্গই ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে। পবিত্র কোরআনের সূরা ইয়াসীনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

'আমি আজ তাদের মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের পাগুলো সাক্ষ্য দেবে'। অতএব, পাপাচারের কথা অস্বীকার করেও কোন লাভ হবেনা, আর কেয়ামতের কঠিন দিনে কোথাও আত্মগোপন করেও থাকা যাবেনা (আয়াত ৬৫)।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۭ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ

'(হে রসূল!) এরপরও যদি তারা বিমুখ হয় (ঈমান আনয়নে বিরত থাকে তবে আপনি চিন্তিত হবেন না), আপনাকে আমি তাদের রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করিনি'।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, (হে নবী!) কাফেরদের দৌরাত্মে আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না, কেননা তারা যদি আপনার প্রতি ঈমান না আনে, তবে এতে আপনার কোন ক্ষতি নেই, আল্লাহ পাক আপনাকে তাদের রক্ষক রূপে প্রেরণ করেননি। আল্লাহ পাকের মহান বাণী তাদের নিকট পৌঁছে দেয়াই আপনার দায়িত্ব আর সে দায়িত্ব আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার প্রতি অর্পিত হয়নি, অতএব তাদের ব্যাপারে আপনার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তাদের অন্যায় অনাচারের জন্যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ

'আর নিশ্চয় আমি যখন মানুষকে আমার কোন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে তাতে আনন্দিত হয়, আর যদি তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তাদেরই কৃতকর্মের পরিণামে, তখন মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে'।

এ আয়াতে মানুষের বিচিত্র চরিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক যখন মানুষের প্রতি রহমত নাযিল করেন তখন তার আনন্দ-উল্লাসের অন্ত থাকেনা। কিন্তু যদি

মানুষের উপর কোন দুঃখ-কষ্ট আপতিত হয় তখন সে অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে, সে সারা জীবনে যা কিছু নেয়ামত ভোগ করেছে তা ক্ষণিকের মধ্যে বিস্মৃত হয়। আলোচ্য আয়াতের رحمة শব্দটি দ্বারা দুনিয়ার নেয়ামত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর سيئة শব্দ দ্বারা দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ এবং রোগকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ যদি মানুষ দুনিয়াতে অর্থ-সম্পদ লাভ করে, তখন সে আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং এ নেয়ামত তাকে কে দান করলেন তা আদৌ চিন্তা করেনা।

পক্ষান্তরে, যখন মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়, অসুস্থ বা অভাবগ্রস্ত হয় তখন সে ইতোপূর্বে আল্লাহ পাকের যে নেয়ামত ভোগ করেছে সব ভুলে যায় এবং সব কিছুকে অস্বীকার করে। আর একথা চিন্তা করেনা যে এ বিপদ কেন আপতিত হয়েছে? মানুষ মাত্রকেই এ বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, আর সে চিন্তার পথ উন্মুক্ত করেছে আলোচ্য আয়াতের একটি বাক্য- بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ (তাদেরই কর্মফলের কারণে)

অর্থাৎ মানুষের উপর যে বিপদাপদ আসে তার অন্যতম কারণ হলো মানুষের কৃতকর্ম, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ.....(সূরা শুরা ঃ ৩০)

(তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আপতিত হয় তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণেই) অতএব এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার করা তথা ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া একান্ত কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ কোন অবস্থাতেই মানুষের অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়, কেননা মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের অফুরন্ত নেয়ামত রয়েছে এমনকি, যে বিপদগ্রস্ত তার উপরও আল্লাহ পাকের অনেক নেয়ামত রয়েছে।

মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে انسان শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই কাফেরদের উদ্দেশ্যে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যখন কোন কাফেরকে নেয়ামত দেয়া হয় তখন সে ঐ নেয়ামতকে আল্লাহর দান মনে করেনা, বরং তার নিজের প্রাপ্য এবং অর্জিত মনে করে, এজন্যে সে আনন্দিত হয়। পক্ষান্তরে, মোমেন যখন কোন নেয়ামত লাভ করে তখন তাকে আল্লাহ পাকের নেয়ামত মনে করে তাঁর শোকর গুজারীতে মশগুল হয়। এমনিভাবে যখন মোমেনের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তখন সে সবর করে। ঐ সবরের জন্যে সে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে সওয়াব লাভ করে। কিন্তু কাফের আল্লাহ পাকের আরও বেশী অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে না-শোকরী বা অকৃতজ্ঞতা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। হাদীস শরীফে আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা সদাকা কর, আমি তোমাদের অধিক সংখ্যককে দোযখে দেখেছি। একজন

সাহাবী জিজ্ঞেসা করলেন, কি কারণে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমাদের অধিক সংখ্যক অভিযোগের কারণে এবং তোমাদের স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতার কারণে।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ

'আসমান জমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে পুত্র সন্তান দান করেন'।

সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের

অর্থাৎ আসমান জমীনের সর্বত্র আল্লাহ পাকের আধিপত্য এবং একচ্ছত্র ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি যেমন ইচ্ছা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করে থাকেন, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে পুত্র সন্তান দান করেন।

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

'অথবা তিনি দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি করে দেন বন্ধ্যা, নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সর্বশক্তিমান'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই স্রষ্টা, পালনকর্তা, তিনিই রিযকদাতা, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, যেমন হযরত আদম (আঃ)-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, পিতাও নেই মাতাও নেই, আর হযরত হাওয়া (আঃ)-কে হযরত আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন।

এমনিভাবে আল্লাহ পাক কাউকে জমজ সন্তান দান করেন, আর কাউকে বন্ধ্যা বা নিঃসন্তান রাখেন, তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সকলের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত, আর তিনি সর্বশক্তিমান। অতএব, আল্লাহ পাকের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করার শক্তি কারোই নেই। সুখ, দুঃখ সকল অবস্থায় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর স্মরণে তন্ময় থাকা এবং জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলা একান্ত কর্তব্য।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, সারা পৃথিবীতে সর্বত্র আল্লাহ পাকের কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। হযরত লুত (আঃ)-কে শুধু কন্যা সন্তান দান করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে শুধু পুত্র সন্তান দান করেছেন। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তানই দান করেছেন। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিই সর্বত্র কার্যকর হয়। যেভাবে তিনি কাউকে জমজ সন্তান দান করেন এবং কাউকে বন্ধ্যা ও নিঃসন্তান করেন, ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাক কোন মানুষকে সর্বপ্রকার কল্যাণ দান করেন, আর কোন মানুষের মধ্যে কোন প্রকার কল্যাণ থাকেনা, এটিও আল্লাহ পাকের কুদরতের একটি নমুনা।

وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ

'মানুষের এমন সাধ্য নেই যে, আল্লাহ পাক তার সঙ্গে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতীত অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, সে আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী বাণী পৌঁছে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সবার উপরে, তিনি মহাজ্ঞানী'।

এ সূরার প্রারম্ভে ওহীর কথা ছিল, আর এখন সূরার পরিসমাপ্তিতেও ওহীর আলোচনা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রমাণ, তৌহীদের যুক্তি এবং পরকালীন জিন্দেগীর অবস্থা, কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতা, পাপীষ্ঠদের শাস্তি এবং নেককার মোমেনগণের পুরস্কারের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরার শুরু এবং শেষে ওহীর কথা বর্ণিত হওয়ার মাধ্যমে কোরআনে করীমের একটি মোজেযা প্রকাশ পেয়েছে।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে, ইহুদীরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেছিল, মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁর দীদারও হাসিল করেছেন, যদি আপনিও সত্য নবী হন তবে আল্লাহ পাকের সঙ্গে কথা কেন বলেন না? তাঁর দীদার কেন হাসিল করেন না? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

ইহুদীদের ঐ প্রশ্নের জবাব এ আয়াতে রয়েছে। তাদের এ প্রশ্ন যে অবান্তর তা ঘোষণা করে আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেন যে, সরাসরি আল্লাহ পাক মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন, আর মানুষ তা সহ্য করবে– এ অবস্থা অসম্ভব, অকল্পনীয়, মানুষের সাধ্যাতীত। মানব জাতির সৃষ্টির কাঠামোই এর যোগ্য নয়। তাই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মানুষের কাছে যে ওহী আসত, তার তিনটি পন্থা ছিলঃ

১. পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ পাকের কালাম সরাসরি শ্রবণ করা, হযরত মূসা (আঃ) এভাবেই তূর পর্বতে আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণ করেছিলেন।

২. ফেরেশতার মাধ্যমে এভাবে যে আল্লাহ পাকের মহান বাণী নিয়ে ফেরেশতা অবতরণ করতেন এবং সে বাণী আল্লাহর নবীর অন্তরে পৌঁছে দিতেন। কিন্তু ফেরেশতা স্ব-শরীরে আল্লাহর নবীর সম্মুখে উপস্থিত হতেন না। আলোচ্য আয়াতে ওহী শব্দ দ্বারা এ পন্থাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৩. কখনও ফেরেশতা স্বয়ং স্ব-শরীরে আত্মপ্রকাশ করতেন, অথবা অন্য কোন মানুষের আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হতেন এবং মহান আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণী পৌঁছে দিতেন।

শুধু এ তিনটি পন্থাতেই আল্লাহ পাকের নবীগণ তাঁর বাণী বা ওহী প্রাপ্ত হতেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে ইহুদীদের কথা সত্য নয়, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ

পাকের দীদার লাভ করেননি এবং আল্লাহ পাকের সঙ্গে সরাসরি কথাও বলেননি, আর আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ পাকের সাথে সরাসরি কথা বলা মানুষের সাধ্যাতীত।[১]

ওহী প্রসঙ্গে–

বিখ্যাত আরবী অভিধাণবিদ ইমাম রাগেব (রঃ) ওহী শব্দটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ওহীর শাব্দিক ব্যাখ্যা হলো ঃ اشارة سريعة فى خفية (একটি গোপন দ্রুতগতির ইঙ্গিত)। এতে একথা প্রমাণিত হয়, প্রকাশ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ওহীর সম্পর্ক নেই, এটি সম্পূর্ণ বাতেনী তথা গোপনীয় বিষয়, যা মানব-মনের সঙ্গেই সম্পর্কীত, আর দ্রুতগতির যে বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তার তাৎপর্য হলো, মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোবারক ক্বলবে ওহী পৌঁছত, আর যেহেতু এটি গোপন থাকত সেজন্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে ওহী নাযিল হতো, অথচ তাঁরা তা দেখতেও পারতেন না, খবরও পেতেন না। আর কখনো এমনও হতো যে, ফেরেশতা কোন আগন্তুক মানুষের আকৃতি ধারণ করে আসতেন, যেমন ঈমান সম্পর্কীয় হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে জীব্রাঈল (আঃ) এসেছিলেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ওহী শুধু নবী রসূলগণের নিকটই আসত, এটি তাঁদেরই বৈশিষ্ট্য। অতএব, ওহী হলো আল্লাহ পাকের মহান বাণী যা নবী রসূলগণের নিকট আল্লাহ পাক প্রেরণ করতেন। আর এ বাণী তিনটি পন্থায় প্রেরিত হতো যা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হারেস এবনে হিশাম (রাঃ) হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজী পেশ করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে? তখন তিনি এরশাদ করেছিলেন, কোন কোন সময় এমন হয় যে, আমি একটা ঘণ্টার ধ্বনি (টুনটুন শব্দ) শ্রবণ করি, ঐ ধ্বনিটি আমাকে ইহজগৎ থেকে উদাসীন করে অর্ন্তজগতের দিকে আকৃষ্ট করে, তখন আল্লাহ পাকের মহান বাণী আমার মনস্পটে অবতরণ করতে থাকে, আর তা আমার কণ্ঠস্ত হয়ে যায়। এ প্রকারের ওহী আমার জন্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। আর কখনো ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে আমার নিকট উপস্থিত হয় এবং আল্লাহ পাকের মহান বাণী আমাকে পৌঁছে দেয়, আর সে বাণী আমার মুখস্ত হয়ে যায়।

প্রথম প্রকারের ওহীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে কষ্ট হতো, তার কিছুটা বিবরণ উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (আঃ)-এর কথায়ও রয়েছে। তিনি বলেন, তুহীন শীতের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল এবং তাঁর চেহারা মোবারক থেকে ঘর্ম নিঃসৃত হচ্ছিল (বোখারী শরীফ সহ সমস্ত হাদীস গ্রন্থ)।

---

১. তফসীরে কুরতবী খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৫৩

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন ওহী নাযিল হতো, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হতেন এবং তাঁর চেহারার বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যেত। (মুসলিম শরীফ)

নবী রসূলগণের সঙ্গে আল্লাহ পাকের যে কথা হয়েছে, তা পৃথিবীতে তিন প্রকারেই হয়েছে। (১) ওহীর মাধ্যমে নবীর মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে আল্লাহ পাক তাঁর মহান বাণী পৌঁছে দিয়েছেন (২) পর্দার অন্তরাল থেকে (৩) ফেরেশতার মাধ্যমে। আর শবে মেরাজে যখন আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর দীদার নসীব করেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে, এ পন্থায় শুধু একবারই কথা হয়েছে, আর হযরত মূসা (আঃ) যখন কোহেতূরে ছিলেন তখন পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ পাক তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। ওহীর দ্বিতীয় পন্থা আল্লাহ পাকের সঙ্গে মূসা (আঃ)-এর এই ঘটনা ব্যতীত আর কোথাও নেই। যেমন শবে মেরাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যেভাবে কথা হয়েছে তারও কোন দৃষ্টান্ত নেই। একমাত্র সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, নবী রসূলগণের দলপতি, আল্লাহ পাকের সর্বোত্তম সৃষ্টি, সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃত এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই এ সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

নবুওয়্যত ও ওহীর তাৎপর্য

মানুষের মধ্যে দু'টি শক্তি কার্যকর রয়েছে, একটি দৈহিক আরেকটি আধ্যাত্মিক, চিকিৎসকগণ যেভাবে দৈহিক রোগের নিরাময়ের জন্যে চেষ্টা করে থাকেন, ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাক যুগে যুগে মানুষের অন্তরের চিকিৎসার জন্যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে, তিনিই তার দেহ ও মনের রোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তাই মানব অন্তরের রোগ সমূহ দূরীভূত করার লক্ষ্যে তিনি মানব জাতির মধ্যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন যুগে যুগে এবং তাঁর মহান বাণী বা ওহী প্রেরণ করেছেন মানব জাতির উপকারার্থে। নবী রসূলগণকে আল্লাহ পাক যখন যা প্রয়োজন তার নির্দেশ দিয়েছেন, এ নির্দেশই হলো ওহী। অতএব, ওহীকে বুঝতে হলে নবুওয়্যতকে উপলব্ধি করতে হবে, একটির সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

নবুওয়্যতের তাৎপর্য এবং মর্মার্থ যথাযথভাবে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। নবুওয়্যত এমনি একটি বিষয় যা মানুষের চিন্তা-গবেষণা এবং বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তির অনেক উর্ধ্বে। যেখানে বুদ্ধিবৃত্তির সীমা শেষ হয়, সেখান থেকে নবুওয়্যতের সীমা শুরু হয়। তাই নবুওয়্যতের তাৎপর্য এবং এর সত্যিকার মর্মার্থ একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুই জানেন। তিনি বিশ্বমানবের হেদায়তের জন্যে তথা সমগ্র মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

কিন্তু তবু ইসলামের তত্ত্বজ্ঞানীগণ বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান ও অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ এবং তাঁর পূত-পবিত্র জীবন-ধারার ব্যাপারে গবেষণা করে নবুওয়্যতের তাৎপর্য সম্পর্কে যা কিছু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তা তাঁরা তাঁদের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ পর্যায়ে ইমাম আবুল হাসান আশআরী,

ইবনে হজম জাহেরী, আবু ইসহাক, আবু ইয়ালা, আবুল মায়ালী, ইমামুল হারামাইন, আবদুল করীম সহ্‌রুস্তানী, ইমাম গাযযালী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইবনে খলদুন, ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম প্রমুখ মনীষী ৩য় হিজরীর মাঝামাঝি সময় থেকে ৮ম হিজরী পর্যন্ত এ বিষয়ে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। পরবর্তীতে যাঁরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র প্রথম খন্ডে নবুওয়্যতের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা, আর নবীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এমনিভাবে ইমাম গাযযালী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমোনকেজু মিনাদদলাল' এবং 'মাআরিজুল কুদুস' গ্রন্থে অত্যন্ত মনোজ্ঞ পন্থায় বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। এছাড়া ইমাম রাযী (রঃ) 'তফসীরে কবীরে' এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুন্নবুয়্যতে' এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের জন্যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে যে দোয়া করেছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ.

'হে আল্লাহ! আমার বংশধরদের মধ্যে এমন একজন রসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদের নিকট তোমার আয়াত সমূহ পাঠ করবেন, তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের মনকে পবিত্র করবেন, তাদের কৃলবের সংশোধন করবেন'।

এতে নবীর তিনটি দায়িত্বের কথা উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমত, আল্লাহর বাণী সমূহকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া; দ্বিতীয়ত, তাদেরকে শিক্ষা দেয়া; তৃতীয়ত, তাদের অন্তরের সংশোধন এবং পবিত্রতা অর্জনের ব্যবস্থা করা।

অতএব, নবীর দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে শুধু মানুষের এ জীবনই নয়; বরং মানুষের রূহ বা আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে তথা নবুওয়্যতের তাৎপর্য বর্ণনার পূর্বে রূহ বা আত্মার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে-যা একটা স্বতন্ত্র এবং অত্যন্ত জটিল অধ্যায়।

এ বিষয়ে আবুল আব্বাস আহমদ সরখসি (মৃত্যু ৩৮৬ হিজরী), সাদাকা ইবনে মনজা আদ্দামাশকি (মৃত্যু ২৬০ হিজরী), বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাসউদী (মৃত্যু ৩৪৬ হিঃ), ইমাম গাযাযালী (মৃত্যু ৫০৫ হিঃ), ইমাম রাযী (মৃত্যু ৬০৬ হিঃ), ইবনুল কাইয়ুম (মৃত্যু ৭৫২ হিঃ) প্রমুখ ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষত, ইমাম গাযযালী (রহঃ) তাঁর 'মাআরিজুল কুদুস' গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম (র.) তাঁর 'কিতাবুর রুহ' গ্রন্থে এবং বকায়ী তাঁর 'সিররুর রূহে' এবং হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) তাঁর 'আলতাফুল

কুদুস' গ্রন্থে এ বিষয়ে বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজন করেছেন। কিন্তু এ স্বল্প পরিসরে সে-সব বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এতটুকু বলতে হবে যে, নবী কাকে বলে? নবীর প্রতি আমাদের কি দায়িত্ব? নবীর আগমনের উদ্দেশ্য কি?

'নবী' শব্দটি 'নাবাউন' থেকে নিষ্পন্ন আর 'নাবাউন'-এর আভিধানিক অর্থ হলো এমন খবর, যাতে মানুষের উপকার হয়। আর সেই উপকারও সাধারণ নয়, বরং বিরাট এবং অসাধারণ; আর খবরের শ্রোতা সে খবরের মাধ্যমে জ্ঞান এবং শান্তি লাভ করতে সক্ষম হন।

অতএব, কোরআন মজীদে 'নবী' এমন এক ব্যক্তির জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে, যিনি মানুষকে আল্লাহর তরফ থেকে এমন গুরুত্বপূর্ণ খবর দেন, যাতে মানুষের বিরাট উপকার হয়। মানুষের বুদ্ধির দীপ্তি যেখানে কার্যকর নয়, আর এ খবরের ভিত্তিতে মানুষ লাভ করে অন্তরে অনাবিল শান্তি, নিবারণ করে তাদের জ্ঞান পিপাসা, চির-শান্তি চিরমুক্তির জন্যে নির্দিষ্ট পথের সন্ধান পায় এবং জীবনকে গড়ে তুলতে পারে তার আলোকে। তাই আল্লাহ তা'আলা যখন কোন মানব-গোষ্ঠীর হেদায়েত করার ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর মনোনীত নবীকে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। যেমন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে ফেরাউনের নিকট এবং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে নমরুদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

এমনিভাবে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে আল্লাহ তাআলা মানব জাতির কল্যাণার্থে লক্ষাধিক নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, যাঁরা সে যুগের মানুষকে সরল-সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছেঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ..... فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ

'এবং আমি ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর জাতির নিকট (স্বীয় যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার জন্যে) এ দলিল প্রদান করলাম। আমি যাকে ইচ্ছা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকি, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক বিজ্ঞানময় ও মহাজ্ঞানী। আর আমি তাকে (ইব্রাহীমকে) ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করেছি। তাদের আমি হেদায়েত দান করেছি। আর তাঁর (ইব্রাহীমের) পূর্বে আমি নূহকে হেদায়েত দান করেছি এবং তাঁর (ইব্রাহীমের) বংশ থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব এবং ইউসুফকে, মূসা ও হারুনকে হেদায়েত দান করেছি। নেককার লোকদেরকে আমি এভাবেই বিনিময় দান করে থাকি। আর আমি জাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও হেদায়েত দান করেছি। তারা প্রত্যেকেই ছিল নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। আমি ইসমাঈল, আলয়াসা, ইউনুস এবং লূতকে হেদায়েত দান করেছি এবং তাঁদের প্রত্যেককে পৃথিবীতে (সমকালীনদের উপর) বিশেষ মর্যাদা দান করেছি। তাঁদের পূর্ব পুরুষদের মধ্য থেকে, তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে এবং তাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমি তাঁদেরকে নির্বাচন করেছি এবং তাঁদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি, এটিই আল্লাহ তাআলার হেদায়েত। স্বীয় বন্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন। যদি তারা আল্লাহর সাথে শেরক করতো, তাহলে তাদের

যাবতীয় সৎ কাজ বিনষ্ট হয়ে যেতো। এসব লোককেই আমি দান করেছি আমার কিতাব, সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা এবং নবুওয়্যত। এরপর এসব লোক (বর্তমানে যারা তাদের অনুসারী হওয়ার দাবীদার) ঐ নেয়ামত সমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণে ঐগুলো আমি এমন লোকদের (মুসলমানদের) নিকট সোপর্দ করেছি যারা সে নেয়ামত সমূহের অমর্যাদা করেনা। এদেরকেই আল্লাহ পাক হেদায়েত দান করেছেন। অতএব আপনিও তাঁদেরই পথ অনুসরণ করুন (সূরা আনআমঃ আয়াতঃ ৮৩-৯০)'।

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন নবীর উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কার্যাবলীর বিবরণ দান করেছেন। নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ও নবীগণের দায়িত্ব সম্পর্কেও এরশাদ করেছেন।

উপরোল্লিখিত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং অপরাপর আম্বিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্যে তাঁদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। এরপর আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্বমানবের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছেন। তাই তিনি সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে আল্লাহর প্রিয়নবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ তাআলার হাবীব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'ইতিপূর্বে নবীগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হতেন, আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র বিশ্বমানবের নিকট'।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা আরাফের (আয়াত ১৫৮) ঘোষণা আরও সুস্পষ্ট, এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রসূল'।

বস্তুতঃ অন্যান্য নবীগণ হলেন নবুওয়্যতের আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায়, আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন সূর্যের ন্যায়। সূর্য উঠলে হলে যেমন নক্ষত্রের প্রয়োজন থাকেনা, তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নবীর প্রয়োজনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। যদি কেউ সূর্যের আলো থেকে দূরে থাকতে এবং দিবাকালে নক্ষত্রের আলো পেতে ইচ্ছুক হয়, তবে যেমন তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়না, ঠিক তেমনি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর আর কোন নবীর নিকট হেদায়েত ও নাজাতের পথও পাওয়া যাবে না; বরং সকলকেই নবুওয়্যতের আকাশের সূর্য হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই অনুকরণ করতে হবে। তাঁরই সমীপে হাযির হতে হবে। হেদায়েতের জন্যে এমনকি যদি আল্লাহর কোন নবীও ফিরে আসেন, তবে তাঁর একান্ত কর্তব্য হবে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। তাই তিনি এরশাদ করেছেনঃ 'যদি মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, আমার অনুকরণ ব্যতীত তাঁর গত্যন্তর থাকতো না'। আর এজন্যেই ঈসা আলাইহিস সালাম পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবেন। বস্তুতঃ সমগ্র

বিশ্ব মানবের সামগ্রিক কল্যাণের মূর্ত প্রতীক হয়েই আগমন করেছেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাই কল্যাণকামী, মুক্তি-পিপাসু মানুষ মাত্রকেই তাঁর প্রতি পূর্ণ ভক্তি বিশ্বাস রাখতে হবে, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতে হবে।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, উম্মতের প্রতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তিনটি হক্ব বা অধিকার রয়েছে। প্রথমত, তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবী। যেহেতু তিনিই আমাদের পথ-প্রদর্শক, তিনিই আমাদের রাহবার, তাই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে একমাত্র তাঁরই অনুসরণ করতে হবে আর যেহেতু আমাদের প্রতি তাঁর এহসান অগণিত, তিনি আমাদের জন্যে আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান ও রহমত। তাঁকে ভালবাসতে হবে প্রাণ দিয়ে, প্রাণের চেয়েও বেশি করে। আর শুধু এভাবেই মানব-জীবন সফলকাম হবে। এভাবেই মানুষ আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত লাভ করতে সক্ষম হবে। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ، وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. (সূরা আলে এমরান ঃ ৩১)

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমেই লাভ হয় আল্লাহর রহমত, আল্লাহর মহব্বত এবং মাগফেরাত। আর মানব জীবনের চরম চাওয়া ও পাওয়া এ বস্তু সমূহ থেকে বড় আর কিছুই নয়।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানব জাতির সত্যিকার কল্যাণ সাধন করেন আল্লাহর নবীগণ। তাঁরাই মানুষকে সৎ কার্যে উদ্বুদ্ধ করেন। উন্নতি-অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির পথে পরিচালনা করেন। মনের পবিত্রতা, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করেন। মানুষের মাঝে সুপ্ত শক্তি বা প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটান। হযরত খালেদ (রা.)-এর বীরত্ব ও সৎ সাহস, হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর রাষ্ট্র পরিচালনা, হযরত আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর দানশীলতা, হযরত আলী রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর বীরত্ব ও সরলতা এবং হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর দৃঢ়তার যে খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে তার নেপথ্যে আছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুকরণ ও অনুসরণের ফল। যদি তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে সক্ষম না হতেন, অথবা তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণে সচেষ্ট না হতেন তবে হয়তো বিশ্ববাসী তাঁদের নামও জানতো না।

অতএব, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি-অনুরক্তি, তাঁর অনুকরণ-অনুসরণই মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের চাবিকাঠি। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা, কার্য-বিবরণী আজও সম্পূর্ণ সংরক্ষিত, যাতে করে দুনিয়ার সকল মানুষ তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তাঁর অনুসরণে সক্ষম হয়। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত। তাই তিনি এরশাদ করেছেনঃ

"আমি আল্লাহর রহমত যা মানব জাতিকে আল্লাহ হাদীয়া স্বরূপ দান করেছেন"।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কোরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন মানব জাতির প্রতি আল্লাহর মহান দান। তাঁকে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেছেন। এরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ.

(আলে এমরান ঃ ১৬৪)

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিরাট উপকার সাধন করেছেন, যখন তিনি তাদের মাঝ থেকেই তাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করেছেন', যিনি তাদের নিকট আল্লাহ তাআলার আয়াত সমূহ পাঠ করেন এবং তাদের সংশোধন করেন, আর তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দান করেন, অথচ ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতায় পতিত ছিল।

অতএব, সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, আলো-আঁধার, হেদায়েত এবং গোমরাহীর একটি মাত্র মানদন্ড হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুকরণ-অনুসরণ, অর্থাৎ যে কাজ এবং কথায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা হবে তাই সত্য, ন্যায়, সুন্দর, আলো এবং হেদায়েত। পক্ষান্তরে, যে কথা ও কাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুকরণ করা হবেনা তা নিঃসন্দেহে অসত্য, অন্যায়, অসুন্দর, গোমরাহী এবং অন্ধকার, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানব জাতির জন্যে আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আলোক-দিশারী, পথপ্রদর্শক।

সারা বিশ্ব যখন গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মানবতা যখন বিলুপ্ত এবং মনুষ্যত্ব যখন দলিত-মথিত, অন্যায়-অবিচার যখন সর্বত্র বিদ্যমান, হিংসা-বিদ্বেষ, খুন-খারাবী, চুরি-ডাকাতি, রাহজানী যখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, জুলুম, অত্যাচার, মদ্যপান ও ব্যভিচার এবং নারী হরণের ন্যায় ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় পাপ কার্য সমূহকে যখন পাপ মনে করা হতো না, মানুষ যখন আত্মবিস্মৃত, বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত, নারী জাতি যখন গৃহপালিত পশুর পর্যায়ে অবনমিত, মানবতার কলঙ্ক পৌত্তলিকতা যখন মানুষের মনে স্থায়ী আসন পেতে বসে আছে, এমনকি এক আল্লাহর এবাদতের জন্যে নির্মিত কা'বা শরীফে যখন ৩৬০টি মূর্তি স্থান পেয়েছে। ভ্রান্ত পথে, ভ্রান্ত মতে মানুষ যেন সেদিন চেতনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। পতনোন্মুখ বিশ্বমানব গ্রহণ করেছে অশান্তি, অকল্যাণের পথ, দোযখের পথ।

এভাবে মানুষ যখন নিজেই তার লোভ-লালসা ও ক্ষমতা-লিপ্সার কারণে উচ্ছৃংখলতা ও অরাজকতার মাধ্যমে নিখিল-বিশ্বকে মানুষের বাসের অযোগ্য করে তুলেছিল, যখন বিপন্ন মানবতার সকরুণ আর্তনাদ আহাজারী শ্রবণের জন্যে, দুর্গত জর্জরিত নিরুপায় মানবতাকে রক্ষা করার যখন কেউ ছিল না, বিশ্ব-মানবের এমনি চরম দুর্দিনেই আগমন করলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, যাঁকে আল্লাহ তাআলা 'রহমতুল্লিল আলামীন' বা সমগ্র বিশ্বজগতের জন্যে রহমত বলে ঘোষণা করলেন। আর তাঁর প্রতি যে বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, তাকে বলা হয়েছে 'যিকরুল্লিল-আলামীন'।

অতএব, বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ জাল্লা শানুহু বিশ্ব সভ্যতার বিকাশের জন্যে, বিশ্ব-মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন যাতে করে বিশ্ব-মানব তার কল্যাণের, শান্তি ও মুক্তির পথ তথা সরল সঠিক পূণ্য-পন্থা বা সীরাতুল মুস্তাকীম লাভ করতে সক্ষম হয়। অন্য কথায় রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে আগমন করেছেন রহমতুল্লিল আলামীন। তিনি সঙ্গে এনেছেন 'যিকরুল্লিল-আলামীন'।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব এবং বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল হবার পর গোমরাহীর অন্ধকার কেটে গিয়েছিল। তাই পৃথিবীর চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল, বিশ্বমানব ফিরে পেয়েছিল তার কল্যাণের পথ, চির শান্তি ও চির সুখের পথ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে তথা পবিত্র কোরআন নাযিল হবার পূর্বের যুগকে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বা বর্বরতার যুগ বলা হয়। আর আরবের এ মূর্খ দুর্ধর্ষ পৌত্তলিকরা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হলো, পবিত্র কোরআনের আলোকে নিজেকে আলোকিত করলো, তখন তাঁদের নাম হলো 'সাহাবায়ে কেরাম' (রাদিআল্লাহু আনহুম আজমায়ীন)। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– তাঁরা নক্ষত্র পুঞ্জের ন্যায়। তাঁদের মধ্যে যাকেই অনুসরণ করবে হেদায়েত লাভ করবে। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

خير القرون قرنى. الحديث

'সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, এরপর তার নিকটবর্তী যুগ, এরপর তার নিকটতম পরবর্তী যুগ'।

বস্তুতঃ পাহাড়-পর্বতকে তার স্থান পরিবর্তনে বাধ্য করা, লৌহকে গলিত পদার্থে পরিণত করা সহজ; কিন্তু মানুষের মনের অবস্থা পরিবর্তন করা এবং মানুষের মনোজগতে বিপ্লব সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন। এ কঠিন কাজই সম্ভব হয়েছিলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে, বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

মাত্র ২৩ বছরের সামান্য সময়ের মধ্যে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। মানব জাতির ইতিহাস নতুন করে রচিত হয়, পৃথিবীর মানচিত্রের পরিবর্তন হয়। সমগ্র বিশ্ববাসী পরিত্রাণ লাভ করে। কালাম মজীদে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

'আজকের দিনে আমি পরিপূর্ণ করেছি তোমাদের জীবন-বিধানকে, সম্পূর্ণ করেছি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সমূহকে এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে জীবন-বিধান রূপে মনোনীত করেছি'। (সূরা মায়েদা ঃ ৩)

গতকাল যে ছিল মরু বেদুইন, ছন্নছাড়া যাযাবর আজ সে রাষ্ট্র পরিচালনায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। গতকাল যে ছিল দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, আজ সে বিরাট ঐশ্বর্য ভান্ডারের মালিক। গতকাল যে ছিল মজলুম, অত্যাচারিত, ভীত-সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত, আতঙ্কিত, আজ সে শুধু যে নির্ভীক তাই নয়, বরং এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক। গতকাল যে ছিল জালেম, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, আজ সে বিনম্র স্বভাবের অধিকারী, বিনয়ের প্রতীক, ক্ষমা ও ঔদার্যের প্রতীক। গতকাল যে ছিল লোভগ্রস্ত, মোহে অন্ধ এবং ঘৃণ্য, অর্থ-লিপ্সা চরিতার্থ করতে ব্যস্ত, আজ সে ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং কোরবানীর, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির মহান আদর্শের ধারক বাহক। গতকাল যে ছিল অশিক্ষিত, মূর্খ, জ্ঞান-বিবর্জিত, আজ সে শুধু সুশিক্ষিতই নয়, শুধু সুরুচিসম্পন্নই নয়, বরং অন্যদের জন্যে অদ্বিতীয় শিক্ষক, জ্ঞানের ফল্গুধারা তারই নিকট থেকে প্রবাহিত।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ বিস্ময়কর পরিবর্তন কিসের বদৌলতে? কোন্ চাবি কাঠির বরকতে? এ অভাবিত পরিবর্তন, কল্পনাতীত বিপ্লব কোন্ সোনালী হস্তের স্পর্শে সম্ভব হলো? এসব প্রশ্নের একই জবাবঃ পবিত্র কোরআনের শিক্ষা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের বাস্তবায়নেই এ অসম্ভব সম্ভব হলো, ইতিহাসের এ কল্যাণমূলক বিপ্লবের পথ সুগম হলো। বিশ্ব-সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটলো।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তা হলো কোরআনে করীমে ওহী শব্দটি আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত অন্যদের সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন–

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى. (সূরা কাসাস ঃ ৭)

'আর আমি মূসার মায়ের নিকট এই সংবাদ দিলাম'।

কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় ওহী সেই বাণীকে বলা হয় যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁর নবীর নিকট প্রেরণ করা হয়।

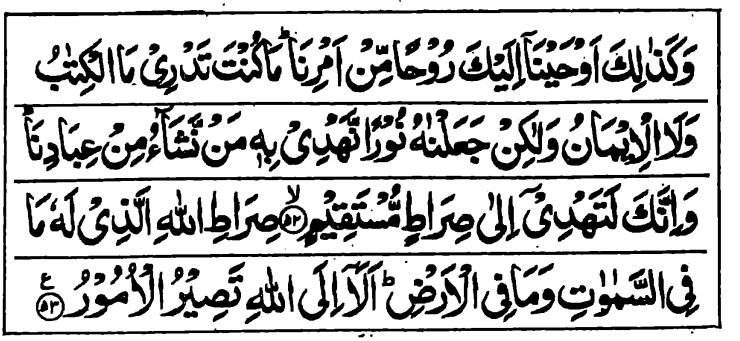
وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۭ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ
وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِنَا ۭ
وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ۝

তরজমা

(৫২) আর (হে রসূল!) এভাবেই আমি আপনার নিকট আমার হুকুমে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করি, আপনি তো জানতেন না, কিতাব কি? এবং ঈমানই বা কি? কিন্তু আমি এই কোরআনকে করেছি নূর, যা দ্বারা আমি আমার বন্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করে থাকি, আর নিশ্চয় আপনি সরল সঠিক পথের দিকে হেদায়েত করছেন।

(৫৩) আর তা হলো সেই আল্লাহ পাকের পথ, যিনি আসমান জমীন এবং তার মধ্যকার সব কিছুর মালিক। মনে রেখ, সমস্ত বিষয় সেই আল্লাহ পাকেরই মহান দরবারে প্রত্যাবর্তিত হবে।

তফসীরুল কোরআন

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا

যেভাবে অন্য নবী রসূলগণের নিকট ওহী প্রেরণ করেছি, ঠিক এভাবেই (হে রসূল!) আপনার নিকটও ওহী প্রেরণ করলাম।

আলোচ্য আয়াতের 'রুহ' শব্দটির অর্থ ফেরেশতা এবং কোরআন উভয়ই হতে পারে। কালবী (রঃ) এবং মালেক এবনে দীনার (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে রুহ শব্দটির দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, যেভাবে দেহ রুহ দ্বারা জীবনের স্পন্দন লাভ করে, ঠিক এভাবেই কোরআনে করীম দ্বারা মৃত অন্তরগুলো জীবনী-শক্তি লাভ করে। এজন্যে আলোচ্য আয়াতের 'রুহ' শব্দ দ্বারা কোরআনে করীমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলাই সমীচিন। অন্তরের জন্যে কুফর হলো মৃত্যুর নামান্তর, আর যখন কোরআন করীমের হেদাযেত লাভ হয় তখন অন্তর জীবিত হয়। অথবা এভাবে বলা যায়, পবিত্র কোরআন দ্বারা মানব অন্তর এমন কিছু লাভ করে যা জীবনের ন্যায় অর্থাৎ সঠিক জ্ঞান।

তফসীরকার রবী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'রুহ' শব্দ দ্বারা ফেরেশতাদের দলপতি জীব্রাঈল (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর اوحينا শব্দটি ارسلنا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ আমি জীব্রাইলকে প্রেরণ করেছি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'রুহ' শব্দ দ্বারা নবুওয়্যতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাঁর আরেকটি উদ্ধৃতি রয়েছে, তিনি বলেছেন, 'রুহ' শব্দ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা রহমত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর নবুওয়্যত ও রহমতের প্রতীক হলো কোরআনে করীম। মানবতা যখন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল তখন পবিত্র কোরআন নাযিল হয় এবং পবিত্র কোরআনের সঞ্জীবনী সুধা পান করে মৃত-প্রায় মানবতা নবজীবন লাভ করে। কুফর, শেরক, অন্যায়-অনাচার পরিত্যাগ করে মানব জাতি সত্য, ন্যায় এবং কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়। ইতিহাস সাক্ষী! পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে মানব জাতির যে দুর্দিন ছিল তা আজ আঁচ করাও সম্ভব নয়, মানুষ

ছিল তখন পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত, গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এ ছিল মানব জাতির ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

মানব-ইতিহাসের এমনি ক্রান্তিলগ্নেই নাযিল হয় পবিত্র কোরআন। এখানেই আলোচ্য আয়াতের রুহ শব্দটির তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়। পবিত্র কোরআনের অবতরণের মাধ্যমেই মানুষ তার সঠিক পথ পেয়েছে, পবিত্র কোরআন ব্যতীত মানব জীবন ছিল দুর্বিষহ, বিপদগ্রস্ত, পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ

'আপনি তো জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমানই বা কি'? অর্থাৎ (হে রসূল!) পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আপনি একথাও জানতেন না যে কিতাব কি এবং ঈমান কি? শরীয়তের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আপনি ওয়াকেফহাল ছিলেন না, কেননা শরীয়তের এলম বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত নয়; বরং আল্লাহ পাকের বিধান আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "ঈমান" শব্দটি নামায অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কেননা তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে একমত, আল্লাহ পাকের প্রতি নবী রসূলগণের ঈমান স্বভাবগতভাবেই থাকে, তাঁরা সর্বদা নিঃস্পাপ থাকেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বেই একা থাকতে পছন্দ করতেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ওহী নাযিল হবার পূর্বেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ মোমেন ছিলেন। যে বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখতে হয় তার প্রতি তাঁর একীন ছিল, তবে এ অবস্থাটির নামই যে ঈমান, ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে একথা তিনি জানতেন না।

وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا

'কিন্তু আমি এই কোরআনকে করেছি নূর, যা মূর্খতার অন্ধকারকে দূরীভূত করে'।

نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا

'যা দ্বারা আমি আমার বন্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করে থাকি', অর্থাৎ দুনিয়াতে কোরআনে করীমের মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পথের হেদায়েত করি, আর আখেরাতে তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেই এবং আমার নৈকট্য-ধন্য করি।

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

'আর (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনি সরল সঠিক পথের দিকে হেদায়েত করছেন'। যে পথ মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়, আপনি মানুষকে সে পথ প্রদর্শন করছেন।

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

'আর সে পথই হলো আল্লাহ পাকের পথ যিনি আসমান জমীন ও তার মধ্যকার সব কিছুর মালিক'।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জীবনের কন্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রে সঠিক পথ পেতে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে পবিত্র কোরআনের, আর অনুসরণ করতে হবে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। আর এভাবেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় পথ লাভ করা যায়, যা মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে এবং যে পথে চললে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হবে।

اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ

'মনে রেখ, সব বিষয় আল্লাহ পাকের মহান দরবারেই প্রত্যাবর্তিত হবে'। সব কাজের শেষ গতি হবে আল্লাহ পাকেরই নিকট, সমগ্র সৃষ্টি-জগতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকের, আর সব কিছু কেয়ামতের দিন সরাসরি আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

এ আয়াতে যারা আল্লাহ পাকের অনুগত তাদের জন্যে শুভ-পরিণতির সুসংবাদ রয়েছে, আর যারা অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, অতএব, ভবিষ্যত চিন্তা করে, পরিণতির কথা ভেবে জীবনের জন্যে এমন পথ অবলম্বন করা উচিত যা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে সহায়ক হয়। আর এমন পথ পরিহার করা উচিত যা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

অদ্য ২রা মে, ১৯৯৬ইং রোজ বৃহস্পতিবার রাত ১১-০০ টায় সূরায়ে শুরার তফসীর সমাপ্ত হলো। আল্লাহ পাক এ মহান গ্রন্থকে কবুল করুন এবং সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা যুখরুফ

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ تِسْعٌ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّسَبْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ① وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ② اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ

تَعْقِلُوْنَ ③ وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ④ اَفَنَضْرِبُ

عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ⑤ وَكَمْ اَرْسَلْنَا

مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ⑥ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ

يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑦ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ

الْاَوَّلِيْنَ ⑧ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ

خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ⑨ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ

جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ⑩ وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ

السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ⑪

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

তরজমা

(১) হা-মীম।

(২) শপথ এই সুস্পষ্ট কিতাবের,

(৩) আমি তা নাযিল করেছি আরবী ভাষায় কোরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

(৪) নিশ্চয় এ মহা গ্রন্থ রয়েছে আমার নিকট 'লওহে মাহফুজে', এটি মহান, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, জ্ঞানগর্ভ।

(৫) যেহেতু তোমরা অত্যন্ত সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়, তাই আমি কি তোমাদের নিকট থেকে এ মহান উপদেশ বাণী সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাহার করে নেব?

(৬) পূর্ববর্তী লোকদের নিকট আমি কত নবী প্রেরণ করেছিলাম।

(৭) এবং যখনই তাদের নিকট কোন নবীর আগমন হয়েছে তখনই তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।

(৮) পরিণামে আমি তাদের শক্তিশালী লোকদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, আর এভাবেই চলে আসছে পূর্ববর্তীদের রীতি।

(৯) আর (হে রসূল!) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন আসমান জমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকই তা সৃষ্টি করেছেন।

(১০) যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন শয্যা, আর তাতে তোমাদের চলার পথ করে দিয়েছেন, হয়তো তোমরা সঠিক পথ পাবে।

(১১) এবং যিনি আসমান থেকে পরিমিত পরিমাণে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি এর দ্বারা মৃত নগরীকে সঞ্জীবিত করি, ঠিক এভাবেই তোমাদেরকে কবর থেকে বের করা হবে।

সূরা যুখরুফ প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ, এতে ৮৯ আয়াত, ৮৩৩ বাক্য এবং ৩,৪০০ অক্ষর রয়েছে।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ সূরা যুখরুফ মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে।

এবেন মরদবিয়া তাউস (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি হাজরামুত থেকে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললো, 'হে এবনে আব্বাস! আমাকে বলুন, কোরআনে করীম কি আল্লাহ পাকের নিজস্ব কালাম? নাকি তাঁর সৃষ্টি?' হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম, তাঁর মহান বাণী'।[১]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে ওহীর কথা বলা হয়েছে, আর ওহী কিভাবে নাযিল হতো তার বিবরণ স্থান পেয়েছে সূরার পরিসমাপ্তিতে। আলোচ্য সূরা শুরু করা হয়েছে ওহী তথা

১. তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫

পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের বর্ণনা দ্বারা। হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানভী (রঃ) লিখেছেন, এ সূরার প্রারম্ভে "পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ" ঘোষণা দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, আর যারা তাঁকে বা পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করে, তাদের উদ্দেশ্যে রয়েছে সতর্কবাণী।

আ'মালুল কোরআন

সূরা যুখরুফ লিপিবদ্ধ করে বৃষ্টির পানি দিয়ে ধৌত করে পান করলে কফ কাশি দূরীভূত হয়। (আদ দোরারুন নজম)

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তির স্বপ্নে দেখবে সে সূরা যুখরুফ তেলাওয়্যত করছে, তার অর্থ হবে ঐ ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে সফল হবে, আর আখেরাতেও সে লাভ করবে উচ্চ মর্তবা।

তফসীরুল কোরআন

পবিত্র কোরআন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী, যা বিশ্ব মানবের কল্যাণের লক্ষ্যে বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে।

حٰمٓ (হা-মীম)

এর অর্থ আল্লাহ্ পাকই জানেন।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ

'এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ'!

পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম

আলোচ্য বাক্য দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম, অলৌকিকতা এবং বলিষ্ঠতা সর্বজন-বিদিত এবং স্বীকৃত্ব, তাই এর সত্যতায় বিশ্বাস করা এবং ঈমান আনা ও পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ মেনে চলা বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য।

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

'আমি তা নাযিল করেছি আরবী ভাষায়, কোরআন রূপে যাতে তোমরা বুঝতে পার'।

পবিত্র কোরআনের প্রথম শ্রোতা যারা ছিলেন তাদের মাতৃভাষা ছিল আরবী, তাই পবিত্র কোরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা উত্তম রূপে পবিত্র কোরআনকে বুঝতে পারে এবং বিশ্বের অন্য দেশের মানুষকেও বোঝাতে পারে।

পবিত্র কোরআনের প্রত্যেকটি কথা সুস্পষ্ট, তার বর্ণনা-ভঙ্গী তাৎপর্যবহ। এর ভাষা অত্যন্ত সাবলীল এবং প্রাঞ্জল, এ মহান গ্রন্থ নিঃসন্দেহে অলৌকিক, এর শ্রেষ্ঠত্বের জ্বলন্ত নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান এবং অতি মর্মস্পর্শী তার আবেদন।

وَإِنَّهُ فِيٓ أُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

আর এই পবিত্র কোরআন লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে, এটি মহান উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং জ্ঞানগর্ভ-এসবই এ মহান গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

لَعَلِيٌّ

অর্থাৎ এত উচ্চমর্তবা সম্পন্ন যেখানে কারো পৌঁছা সম্ভবই নয়; যা কল্পনাতীত।

অথবা এর অর্থ হলো সমস্ত আসমানী গ্রন্থের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা হলো পবিত্র কোরআনের।

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) বলেছেন, কাশ্‌ফ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় যে, আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে পবিত্র কোরআন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন, এরপর হুকুম দিয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে তা লিখতে, এরপর তিনি وَإِنَّهُ فِيٓ أُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ পাঠ করেন।[১]

আলোচ্য আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম বর্ণনা করেছেন, এমনকি এ সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ করে একথা বলেছেন যে, এর বলিষ্ঠতা এবং সুস্পষ্টতা এত বেশী যে মানব মনের গোমরাহীর সকল অন্ধকার এ মহান গ্রন্থের কারণে দূরীভূত হয়। আর এ মহান গ্রন্থ "লওহে মাহফুজে" চির সংরক্ষিত রয়েছে। এ মহান গ্রন্থ আল্লাহ পাকের উপদেশ এবং কল্যাণ বাণী দ্বারা সমৃদ্ধ, মানব জাতির কল্যাণ সাধনই এর লক্ষ্য।

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ

'যেহেতু তোমরা অত্যন্ত সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়, তাই আমি কি তোমাদের নিকট থেকে এই মহান উপদেশ বাণী সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেব'?

আল্লামা বগভী (রঃ) তফসীরকার কাতাদা (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যখন পবিত্র কোরআন নাযিল হলো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহ্বান করলেন, তখন মক্কাবাসী তাঁর চরম বিরোধিতা করলো, অবস্থা এত বিপজ্জনক হয়েছিল যে, প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলা সম্ভবই ছিলনা, যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করতো, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি অকথ্য নির্যাতন করা হতো। হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত সোহায়েব (রাঃ), হযরত ছুমাইয়া

১. তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৪৬-৪৭
তফসীরে তাবারী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-৩০

(রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম সেদিনগুলোতে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ

কাফেরদের দৌরাত্ম, বাড়াবাড়ি এবং চরম বিরোধিতার কারণে আল্লাহ পাকের এ নেয়ামত অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের অবতারণ আমি কি বন্ধ করে দেব?

বস্তুতঃ মক্কার কাফেরদের আচরণের কারণে বিশ্ব কল্যাণের প্রতীক পবিত্র কোরআনের অবতারণ বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, মূলতবীও হতে পারেনা, আল্লাহ পাকের করুণা-বৃষ্টি কখনও বন্ধ হবার নয়; কেননা তিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, এ কারণেই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের অবতারণ অব্যাহত রেখেছেন। ভাগ্যবান লোকেরা এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে, আর হতভাগা লোকদের শাস্তি অবধারিত হয়েছে।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যদি কাফেরদের বিরোধিতার কারণে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাযিল করা বন্ধ করে দিতেন, তবে এর পরিণামে তদানীন্তন কালের সমস্ত লোক ধ্বংস হয়ে যেত, কিন্তু পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ পাক তাঁর রহমত ও দয়ায় পবিত্র কোরআন নাযিল অব্যাহত রেখেছেন এবং ওহী প্রেরণের পাশাপাশি তাঁর রহমতের বারিধারাও বর্ষিত হতে থাকে।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, এ কাফেররা যে পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করে, আমি কি এতদসত্বেও তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নেব?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা কি একথা ভেবেছ যে, তোমাদের উপর থেকে আযাব রহিত হয়ে যাবে? তা মোটেই নয়। পবিত্র কোরআন নাযিল হতে থাকবে, যেমন এ আয়াত নাযিল হবার পরও সুদীর্ঘ বিশ বছর পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, কেননা এতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে হেদায়েত। মক্কার গুটিকয়েক কাফেরের বিরোধিতার কারণে সমগ্র বিশ্ববাসীকে পবিত্র কোরআন থেকে বঞ্চিত করা যায় না।[১]

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ

'পূর্ববর্তী লোকদের নিকট আমি কত নবী প্রেরণ করেছিলাম'।

অর্থাৎ যুগে যুগে ইতোপূর্বেও মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে বহু নবী রসূল প্রেরণ করেছি, সে যুগের লোকেরাও সত্যের আহ্বানে সাড়া দেয়নি, বরং তাদের সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিয়েছে।

১. তফসীরে তাবারী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-৩৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৪৭-৪৮

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) মক্কার কাফেররা যে আপনার বিরোধিতা করছে, এটি নতুন কিছু নয়; ইতোপূর্বে আমি অনেক নবী রসূল মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছি, মক্কাবাসী কাফেরদের ন্যায় সে যুগের দুর্বৃত্তরাও নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে এবং সে যুগের নবী রসূলগণ সবর করেছিলেন, আপনিও এ কাফেরদের বিরোধিতায় সবর অবলম্বন করুন, যেমন কোরআনে করীমের অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. (সূরা আহকাফ ঃ ৩৫)

'(হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন, যেমন সবর অবলম্বন করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রসূলগণ'।

এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যারা ইতোপূর্বে নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে, তাদেরকে আল্লাহ পাক কিছুদিন অবকাশ দেয়ার পর ধ্বংস করেছেন। অতএব, যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর বিরোধিতা করছে তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করুন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

'এবং যখনই তাদের নিকট কোন নবীর আগমন হয়েছে, তখনই তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে'।

এতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা রয়েছে এ মর্মে যে, (হে রসূল!) মক্কার কাফেররা আপনাকে বিদ্রুপ করে, এটিও নতুন কিছু নয়; ইতোপূর্বে যত নবী রসূলই আগমন করেছেন তাঁদেরকে সে যুগের কাফেররা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে, অতএব মক্কার কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রুপে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। এটি কাফেরদের পুরনো রীতি।

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ

'পরিণামে আমি তাদের শক্তিশালী লোকদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, আর এভাবেই চলে এসেছে পূর্ববর্তীদের রীতি।

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির পরাজয়ের সংকেত রয়েছে।

পূর্বকালের কাফেররা যেভাবে অবশেষে ধ্বংস হয়েছিল, ঠিক তেমনি এ কাফেরদেরও ধ্বংস অনিবার্য। এমনিভাবে পূর্বকালের নবী রসূলগণ অবশেষে তাঁদের সত্য-সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন, সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮১)

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিদায় নেয়ারই যোগ্য'।

ইতিহাস সাক্ষী! ফেরাউন তার ৯ লক্ষ সৈন্য নিয়ে মোকাবেলা করেছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর, তাঁর হাতে ছিল সত্যের লাঠি, পরিণতি সর্বজন-বিদিত, সলিল সমাধি হয়েছিল ফেরাউনের, আর হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক বিজয় দান করেছেন। এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মোকাবেলা করেছিল নমরুদ, আল্লাহ পাক নমরুদ ও তার সৈন্য বাহিনীকে অপমানিত করে ধ্বংস করেছেন, আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বিজয় দান করেছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বদরের যুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম মোকাবেলা হয়, আল্লাহ পাক নিরস্ত্র-প্রায় মুসলমানদেরকে বিজয় দান করে এ সত্য প্রমাণ করেছেন যে, সত্যের জয় সব সময়ই হয়। অবশেষে ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে কাফেরদের শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং আলোচ্য আয়াতে প্রদত্ত সুসংবাদ বাস্তবে পরিণত হয়।

ইতিহাসের এসব ঘটনাবলী দেখে কেউ সত্যকে অস্বীকার করতে পারেনা, আল্লাহ পাকের নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করতে পারেনা, যদিও এ কাফেররা মুখে আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করেনা, কিন্তু মনে মনে তারাও সত্যের পক্ষেই স্বাক্ষ্য দেয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ

'আর (হে রসূল!) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান জমীন সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক'।

এতে একথাই প্রমাণিত হয়, কাফেররা আল্লাহর প্রেরিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করলেও আল্লাহ পাকই যে স্রষ্টা ও পালনকর্তা, এতে তাদের কোন সন্দেহ নেই। তৌহীদের উপর তাদের মনে যে বিশ্বাস রয়েছে সে কথা প্রকাশ করতেও তারা কুণ্ঠিত নয়।

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন শয্যা, আর তাতে তোমাদের চলার পথ করে দিয়েছেন, হয়তো তোমরা ঐ পথে চলে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে পারবে।

অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক জমীনে তোমাদের কল্যাণার্থে যা কিছু করেছেন তা দেখে তোমরা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত এবং অফুরন্ত নেয়ামত লক্ষ্য করবে এবং হেদায়েত লাভ করবে।

وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ

'আর যিনি আসমান থেকে পরিমিত পরিমাণে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি এর দ্বারা মৃত নগরীকে সঞ্জীবিত করি, ঠিক এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে'।

এ আয়াতেও আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের মহিমা এবং তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের বিবরণ দেয়ার পর মানুষকে তার পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাকই আসমান থেকে মানুষের জন্যে পরিমিত পরিমাণে বারি বর্ষণ করেন, পানির অপর নাম জীবন, আল্লাহ পাক পানি বন্ধ করে দিলে মানুষের জীবন শুধু দুর্বিষহ হবেনা; বরং তার অস্তিত্বই টিকবেনা। আসমান থেকে বারি বর্ষণের পর খরায় মৃত ধরণীর 'ধড়ে' প্রাণ ফিরে আসে, মৃত-প্রায় জমীন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, মাটির ভেতর থেকে ফল ফসলের গাছ বের হয়ে আসে ঠিক এমনিভাবেই আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতিকে কবর থেকে বের করে আনবেন। অতএব, এ জীবনকে যেমন অস্বীকার করা যায়না, তেমনি পরজীবনকেও উপেক্ষা করা যায়না, এ জীবনের জন্যে যেমন পরিশ্রম করতে হয়, তেমনি পরজীবনের জন্যেও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। এ জীবনের কর্মেরই ফল পাওয়া যাবে পরজীবনে।

যদিও মানুষ সমাধিস্থ হবার পর মাটির সঙ্গে মিশে যায়, তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়ে যায় কিন্তু যেভাবে বীজ থেকে চারা মাটির নীচ থেকে বের হয়ে আসে এমনিভাবে মানুষও আল্লাহ পাকের কুদরতে কেয়ামতের দিন কবর থেকে বের হয়ে আসবে।

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ
مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا
اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا
لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿١٣﴾ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾ وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ
عِبَادِهٖ جُزْءًا ۭ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ
بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ
لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٧﴾ اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا
فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٨﴾

তরজমা

(১২) আর যিনি সব কিছুকেই জোড় জোড় করে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তোমাদের আরোহণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন নৌযান এবং চতুঃষ্পদ জন্তু সমূহ।

(১৩) যেন তোমরা তাদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার এবং তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামতকে স্মরণ করতে থাক আর বল, পবিত্র মহিমময় সেই আল্লাহ পাক, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, নতুবা আমরা এগুলোকে আয়ত্বে আনতে পারতাম না।

(১৪) আর নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।

(১৫) আর তারা আল্লাহ পাকের বন্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ (সন্তান-সন্ততি) স্থির করেছে, নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।

(১৬) আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টি থেকে নিজের জন্যে শুধু কন্যা সন্তানই গ্রহণ করলেন? আর তোমাদের জন্যে পছন্দ করলেন পুত্র সন্তান?

(১৭) অথচ যখন তাদের কাউকে সে সন্তানের (কন্যা সন্তানের) জন্মের সংবাদ দেয়া হয়, যা তারা দয়াময় আল্লাহ পাকের প্রতি আরোপ করে, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং দুঃসহ মর্ম যাতনা ভোগ করতে থাকে।

(১৮) তবে কি তারা আল্লাহ পাকের প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান যারা অলংকারে মন্ডিত, সাজ-সজ্জায় লালিত-পালিত হয়, অথচ বিতর্ককালে বক্তব্য প্রকাশে অসমর্থ হয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের গুণাবলী এবং তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের বর্ণনা ছিল, এ আয়াতেও আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহের উল্লেখ রয়েছে, যা মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ নেয়ামত হিসেবে পরিগণিত।

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَ الْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ○

لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ

আর যিনি সব কিছুকে জোড় জোড় করে সৃষ্টি করেছেন, যেমন নর-নারী, ভাল-মন্দ, সাদা-কাল, শীত-গ্রীষ্ম, সকাল-সন্ধ্যা, উপকারী-অপকারী প্রভৃতি। এমনিভাবে আল্লাহ পাক তোমাদের ভ্রমণের জন্যে যানবাহন সৃষ্টি করেছেন, নৌপথের জন্যে নৌযান এবং স্থলপথের জন্যে চতুঃষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, এসব কিছু মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান, যেন মানুষ এসবের উপর আরোহণ করার সময় আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কথা স্মরণ করে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে।

যদিও বর্তমান যুগে যান্ত্রিক সভ্যতার বদৌলতে অনেক আধুনিক যানবাহন আবিষ্কৃত হয়েছে, এতে আগুন-পানি-বাতাস ব্যবহৃত হচ্ছে– এসবই আল্লাহ পাকের নেয়ামত, আর এগুলোকে একত্রিত করে আবিষ্কার করার কৌশলও আল্লাহ পাকই মানুষকে শিখিয়েছেন,

অতএব মানুষের কর্তব্য হলো ভ্রমণকালে আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে তাঁর মহান দরবারে শোকর গুজার হওয়া।

চির বিদায়ের সফরকে বিস্মৃত হয়োনা

দুনিয়ায় বিভিন্ন সফরের সময় প্রত্যেককে যে কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে তা হলো, এ সফরই শেষ সফর নয়; বরং এমনও সময় আসবে, যখন এ পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে প্রত্যেককে পরপারের সফরে যেতে হবে। বস্তুতঃ দুনিয়ার এ জীবনই একটি সফর, অবশেষে একদিন এ সফর শেষ হয়ে যাবে তথা এ জীবনের অবসান ঘটবে এবং প্রত্যেককে যেতে হবে সুদীর্ঘ সফরের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে। যেভাবে দুনিয়াতে ভ্রমণকালে স্থল, নৌ ও বিমান বন্দরে অপেক্ষমান থাকতে হয়, ঠিক এমনিভাবে আখেরাতের সফরে প্রত্যেক মুসাফিরকে 'আলমে বরজখ' বা মধ্যলোকে অপেক্ষা করতে হবে। অবশেষে যখন ইস্রাফীল (আঃ) শিংগায় ফুঁক দেবেন তখন সকলকে সমবেত হতে হবে কেয়ামতের ময়দানে। দুনিয়ার বুকে ভ্রমণকালে সে ভ্রমণের কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবেনা। দুনিয়াতে এ পর্যায়ে ভ্রমণকালে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে একটি দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছেঃ

ভ্রমণের দোয়া

تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ○ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

'পবিত্র মহিমময় সেই আল্লাহ পাক, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, নতুবা আমরা এগুলোকে আয়ত্বে আনতে পারতাম না, আর নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো'।

এ পর্যায়ে দু'খানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম আহমদ (রঃ) আলী এবনে রবীয়া থেকে বর্ণনা করেছেনঃ তিনি বলেন, আমি দেখলাম হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট আরোহণের জন্যে একটি জন্তু আনা হলো, তিনি তার রেকাবে পা রেখেই পাঠ করলেন বিসমিল্লাহ, এরপর যখন ঠিক মত বসে গেলেন তখন বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, এরপর তিনি তিনবার আল্লাহু আকবর বললেন, এরপর তিনি আরো একটি দোয়া পাঠ করলেন, তা হলো–

سُبْحَانَكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ

(পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি, আমাকে মাফ কর)

আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রাঃ) তখন মুচকি হাসলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন আরজ করলাম, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি কি কারণে হাসলেন? তিনি বললেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, সওয়ারীর উপর আরোহণ করে এভাবে দোয়া পড়তে এবং হাসতে, তাই আমি তা করেছি। তখন আমি আরজ করেছি, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি কি কারণে হাসলেন? তখন তিনি এরশাদ করলেন, বন্দা যখন বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে

মাফ কর, তখন আল্লাহ পাক বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, আমার বন্দা এ সত্য উপলব্ধি করেছে যে, আমি ব্যতীত কেউ তাকে ক্ষমা করতে পারবেনা।[১] (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরো একখানি হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কোন যানবাহনের উপর আরোহন করতেন, তখন তিনি তিনবার তকবীর বলতেন, এরপর তিনবার সোবহানাল্লাহ বলতেন, আর একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এ বাক্যটি তিনবার বলতেন, এরপর পূর্বোল্লেখিত দোয়া পাঠ করতেনঃ

اللهم انى اسئلك فى سفرى هذا من البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى اللهم هون علينا السفر واطولنا البعد اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فى سفرنا هذا واخلفنا فى اهلنا.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই সফরে নেকী এবং পরহেযগারীর জন্যে আরজী পেশ করছি আর আমাকে এমন আমল করার তৌফিক দিও, যা তোমার মহান দরবারে পছন্দনীয় হয়। হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে এ সফরকে সহজ কর এবং এর দূরত্বকে কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! ভ্রমণকালে তুমিই আমাদের সাথী, আর আমাদের পরিবারবর্গের তুমিই নেগেহবান, হে আল্লাহ! সফরে আমাদের সাথী হয়ো, আর আমাদের পরিবারবর্গের প্রতি রহমতের নজর দান করো।[২]

وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

'আর নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো'।

কোন যানবাহনে আরোহনের উদ্দেশ্য হয় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করা তথা ভ্রমণ করা আর সবচেয়ে বড় ভ্রমণ হলো দুনিয়া থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়া। এজন্যে যানবাহন লাভের এবং তাতে আরোহণের নেয়ামতের শোকর আদায়ের পাশাপাশি আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার জন্যে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রমণের কথা সফরের সূচনাতেই স্মরণ করতে হবে যে, এভাবেই একদিন আমাকে এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করতে হবে এবং মহা ভ্রমণের জন্যে প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে হবে।

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ

'আর তারা আল্লাহ পাকের বন্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ (সন্তান-সন্ততি) স্থির করেছে। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ'।

---

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড ১০, পৃষ্ঠা-৩৫১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৬
২. তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্ধলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৫৯

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের কুদরতের যে মহিমা বর্ণিত হয়েছে আর মানুষ অহরহ আল্লাহ পাকের যে অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করে চলেছে, এর কারণে মানুষের একান্ত কর্তব্য ছিল আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করে তাঁর অনুগত হওয়া, তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, কিন্তু মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ, তার দুর্ভাগ্য এখানেই যে, সে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় এবং আল্লাহ পাকের বন্দাদের মধ্য থেকেই তাঁর অংশ স্থির করে অর্থাৎ তাঁর সন্তান-সন্ততি আছে বলে সে ধারণা করে। যেমন নাসারারা হযরত ঈসা এবনে মরয়মকে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করেছে (নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক), নিঃসন্দেহে এটি শেরক, এভাবে তারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে। আর ইহুদীরা হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে শেরক করেছে। শুধু তাই নয়; বরং পৌত্তলিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাকের কন্যা সন্তান বলে দাবী করেছে (নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক)। এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যা আর কিছুই হতে পারেনা।

আলোচ্য আয়াতে দূরাত্মা কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পৌত্তলিকরা আল্লাহ পাকের বন্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ স্থির করেছে। অংশকে সন্তান-সন্ততি ব্যাখ্যা করার কারণ হলো এই, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার দেহের অংশই হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে রয়েছে এর প্রমাণঃ

বোখারী শরীফে সংকলিত, হযরত মুসাওয়্যার এবনে মাখরামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'ফাতেমা আমার অংশ, যে তাকে অসন্তুষ্ট করে সে আমাকে অসন্তুষ্ট করে'। 'ইমাম আহমদ (রঃ) এবং হাকেম (রঃ)-এর বর্ণনা মোতাবেক হাদীসের ভাষা হলো, 'ফাতেমা আমার অংশ, যে কথা তাকে অসন্তুষ্ট করে, তা আমাকে অসন্তুষ্ট করবে আর যা তাকে সন্তুষ্ট করে তা আমাকেও খুশী করে'।

মূলতঃ মানুষ সত্যিই অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ, তাদের অকৃতজ্ঞতা স্পষ্ট।

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّ اَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ

'আল্লাহ পাক কি তাঁর সৃষ্টি থেকে নিজের জন্যে শুধু কন্যা সন্তানই গ্রহণ করলেন? আর তোমাদের জন্যে পছন্দ করলেন পুত্র সন্তান'? অর্থাৎ এ কাফেররা শুধু যে আল্লাহ পাকের জন্যে সন্তান-সন্ততি স্থির করেছে তাই নয়; বরং যে প্রকার সন্তান-সন্ততি তারা নিজেরা পছন্দ করেনা, তা নির্দিষ্ট করেছে আল্লাহ পাকের জন্যে।

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ

'অথচ যখন তাদের কাউকে সে সন্তানের জন্মের সংবাদ দেয়া হয় যা তারা দয়াময় আল্লাহ পাকের প্রতি আরোপ করে, তখন তাদের মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনা ভোগ করতে থাকে'। তার ক্ষোভ এবং দুঃখের অন্ত থাকেনা।

اَوَ مَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ

'তবে কি তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান যারা অলংকারে মন্ডিত, সাজ-সজ্জায় লালিত-পালিত হয়, অথচ বিতর্ককালে বক্তব্য প্রকাশে অসমর্থ হয়'।

আলোচ্য আয়াতে নারী চরিত্রের দু'টি বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছেঃ (১) অলংকার এবং সাজ-সজ্জার প্রতি তাদের আকর্ষণ স্বভাবগত, তারা আজীবন সাজ-সজ্জার মুখাপেক্ষী থাকে। (২) স্বভাবগতভাবেই তারা দুর্বল, অল্পতেই তারা উত্তেজিত হয় এমনকি তর্ক স্থলে তাদের বক্তব্য প্রকাশেও তারা অক্ষম হয়। আল্লাহ পাক সেই নারী জাতিকে সন্তান রূপে গ্রহণ করবেন কোন্ কারণে? যারা দেহ-মনের দিক থেকে দুর্বল, যাদের বুদ্ধির স্বল্পতা সর্বজন-বিদিত, যারা অলংকার এবং সাজ-সজ্জার মধ্যেই থাকে মগ্ন।

মূলতঃ এ কাফেররা আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম, শান এবং মহিমা সম্পর্কে অজ্ঞ, এ কারণেই তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, আল্লাহ পাকের কোন সন্তান-সন্ততি হতেই পারেনা, তিনি এমন দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। কেননা, সন্তান পিতার সমগোত্রীয় হয়ে থাকে, আর আল্লাহ পাকের সমগোত্রীয় কেউ হতে পারেনা, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্কদাতা, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আর সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই অতএব, তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি হতে পারেনা, তাঁর শানে এসব সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়।

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ
الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ
مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ
كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ
اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَكَذٰلِكَ مَآ
اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ
اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾

তরজমা

(১৯) আর তারা দয়াময় আল্লাহ পাকের ফেরেশতাদেরকে নারী সাব্যস্ত করে রেখেছে, তারা কি তবে ফেরেশতাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? এখন তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে এবং (কেয়ামতের দিন) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(২০) আর তারা বলে, করুণাময় আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আমরা তাদের উপাসনা করতাম না। মূলতঃ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা তো শুধু মিথ্যাই বলছে।

(২১) আমি কি তাদেরকে পবিত্র কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধরে রয়েছে?

(২২) বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পিতা-পিতামহকে একই পথে পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমেই সঠিক পথ পাব।

(২৩) আর এভাবেই আমি যখনই কোন জনবসতিতে কোন সতর্ককারীকে প্রেরণ করেছি, তখন সেখানকার সুখী-সমৃদ্ধশালী লোকেরা বলেছে, আমরাতো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী, আমরাও তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবো।

তফসীরুল কোরআন

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, দূরাত্মা কাফেররা আল্লাহ পাকের সন্তান-সন্ততি স্থির করেছে, যা অলীক, ভিত্তিহীন এবং অকল্পনীয়। আর এ আয়াতে কাফেরদের আরেকটি ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা ফেরেশতাদেরকে নারী সাব্যস্ত করেছে, প্রকৃত অবস্থা এই, ফেরেশতাগণ নারীও নয়; নরও নয়। ফেরেশতাদের জগতে নর-নারী বলতে কিছুই নেই। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে তারা শুধু যে ফেরেশতাগণকে অসম্মান করেছে তাই নয়, বরং আল্লাহ পাকের শানেও বেয়াদবী করেছে, আর একথা সর্বজন-বিদিত যে ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য বন্দা, তাঁর সম্পূর্ণ অনুগত, আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়; এতদসত্ত্বেও দূরাত্মা কাফেররা তাদেরকে নারী বলে গণ্য করেছে, তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ

তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তবে কি তারা ফেরেশতাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? ফেরেশতাদের সৃষ্টিকালে তারা কি সেখানে উপস্থিত ছিল? মনে রেখ তাদের এ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে, যথাসময়ে আল্লাহ পাকের আদালতে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। মূলতঃ এসব ভ্রান্ত ধারণা হলো কাফেরদের নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

وَقَالُوا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ

'আর তারা বলে, করুণাময় আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আমরা তাদের উপাসনা করতাম না, মূলতঃ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা তো শুধু মিথ্যাই বলছে'।

অর্থাৎ যদি শেরক এত মন্দ কাজই হয় তবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে শেরক করার শক্তি কেন দিয়েছেন? তাঁর যদি মর্জি হতো তবে তিনি আমাদেরকে এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কাফেররা ফেরেশতাদেরকে স্ত্রীলোক সাব্যস্ত করেছে, এরপর তাদের মূর্তি তৈরী করেছে এবং ঐ মূর্তিগুলোর পূজা করেছে, এতসব অন্যায়ের পর বলছে যে, যদি এটি অন্যায় হতো তবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এসব মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখতে পারতেন। যেহেতু তিনি আমাদেরকে এসব থেকে দূরে রাখেননি এবং এসব গর্হিত কাজ করার শক্তি দিয়েছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আমাদের এহেন কর্মে রাজী আছেন।

তাদের এ ভিত্তিহীন উক্তির জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ

'মূলতঃ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা তো শুধু মিথ্যাই বলছে'।

যারা মূর্খ, নির্বোধ তারাই এমন ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, অসুন্দর উক্তি করতে পারে। কেননা মানুষকে যে দুনিয়াতে ভাল-মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তার কারণ হলো এই যে, আখেরাতে তাদেরকে ভাল কাজের পুরস্কার দেয়া হবে এবং মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি দেয়া হবে। যদি তাদের কর্মের স্বাধীনতা না থাকত, তারা যন্ত্রের ন্যায় কাজ করতো, তবে সওয়াব বা আযাবের প্রশ্নই উঠতো না। তাই কাফেরদের এ উক্তি– "শেরক যদি আল্লাহ পাকের এত অপছন্দনীয়ই হয় তাহলে আমাদেরকে তার শক্তি কেন দিলেন"? নিতান্তই মূর্খতা-প্রসূত। সত্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই।

যদি কাফেরদের এ খোঁড়া যুক্তি মেনে নেয়া হয়, তবে পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অপ্রিয়, অপছন্দনীয় কোন কাজই থাকবেনা, দূরাত্মা পাপীষ্ঠরা তাদের সকল অন্যায় আচরণের পক্ষে এ যুক্তিই পেশ করবে।

اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ

'আমি কি তাদেরকে পবিত্র কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধরে রয়েছে'?

অর্থাৎ কাফেরদের কুফর ও শেরকের পক্ষে তারা যে খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করেছে তা তো ধোপে টিকলনা, এখন জিজ্ঞাসা করি, তাদের অপকর্মের পক্ষে আল্লাহ পাকের প্রেরিত কোন কিতাব রয়েছে কি যা তিনি পবিত্র কোরআন নাযিল করার পূর্বে তাদেরকে

দান করেছেন? আর একথা সর্বজনবিদিত যে, সারা পৃথিবীতে খুঁজেও তারা এমন কোন দলিল হাযির করতে পারবেনা। কোরআনে করীমের একাধিক স্থানে কাফেরদেরকে শেরকের পক্ষে দলিল পেশ করার জন্যে বারংবার তাগিদ করা হয়েছে, কিন্তু তারা তা পেশ করতে সর্বদা অক্ষম রয়েছে। যেসব আসমানী গ্রন্থ ইতোপূর্বে বিভিন্ন যুগে নাযিল হয়েছে সেগুলোতেও তাদের পূজা-অর্চনার পক্ষে কোন দলিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাদের পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণই এক্ষেত্রে তাদের একমাত্র সম্বল। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ

'বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পিতা-পিতামহকে একই পথে পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমেই সঠিক পথ পাব'।

অর্থাৎ ফেরেশতাদের সৃষ্টির সময় তারা উপস্থিত ছিলনা একথা চির সত্য, দ্বিতীয়তঃ শেরক কুফরের পক্ষে তাদের নিকট কোন কিতাব বা দলিল নেই, শুধু তাদের মূর্খ পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণের কারণেই তারা মূর্তি পূজায় লিপ্ত থাকে। আর যেহেতু তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণে বদ্ধপরিকর, তাই সত্যের আহ্বানে তারা সাড়া দেয়না, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা তারা গ্রহণ করেনা, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তারা ঈমান আনেনা; বরং তাঁর বিরোধিতায় তারা তৎপর থাকে।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ

'আর এভাবেই আমি যখনই কোন জনবসতিতে কোন সতর্ককারীকে প্রেরণ করেছি, তখন সেখানকার সুখী-সমৃদ্ধশালী লোকেরা বলেছে, আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী, আমরাও তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবো'।

এ আয়াতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা, আল্লাহ পাক তাঁকে এ মর্মে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) মক্কাবাসী যে আপনার বিরোধিতা করছে তা নতুন কিছু নয়; ইতোপূর্বে যখনই কোন রসূলকে প্রেরণ করেছি, তাদের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালী লোকেরা এমন অন্যায় আচরণই করেছে যা আপনার সঙ্গে মক্কাবাসী করছে, অতএব আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না, হেদায়েত আপনার হাতে নয়; তা এক আল্লাহ পাকের হাতেই, আপনার কাজ হলো শুধু এক আল্লাহ পাকের বাণী তাদের নিকট পৌঁছে দেয়া, গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতা তারা ওয়ারিষ সূত্রে পেয়েছে, কাজেই তারা গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে আসবেনা।

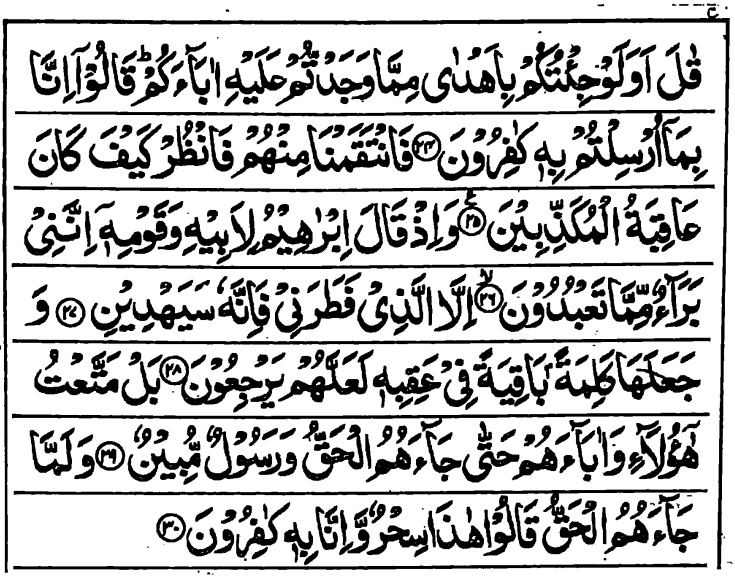
قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي
بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَ
جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ
هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا
جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৪) তাই সতর্ককারী বলেনঃ তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশনা তোমাদের জন্যে এনে দেই তবু কি তোমরা তাদেরই অনুসরণ করবে? তারা বলে, তোমরা যা নিয়ে এসেছ, আমরা তা মানিনা।

(২৫) এরপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করি, লক্ষ্য করে দেখ মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কী হয়েছে।

(২৬) আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন ইব্রাহীম তার পিতা এবং জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা যেসব কিছুর পূজা করছো, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

(২৭) আমার সম্পর্ক শুধু তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতএব নিশ্চয় তিনিই আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

(২৮) আর তিনি এ ঘোষণাকে তাঁর পরবর্তীদের জন্যে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছেন, যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে।

(২৯) এবং আমি তাদেরকে এবং তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম, অবশেষে তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হলো এবং আগমন করলেন সুস্পষ্টভাষী রসূল।

(৩০) যখন তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হলো, তারা বললো, এ-তো যাদু এবং আমরা নিশ্চয় তা প্রত্যাখ্যান করি।

তফসীরুল কোরআন

قُلْ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ কাফেররা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মমত পোষণ করি, আমরা সর্বদা তাদেরই অনুসরণ করি, ভবিষ্যতেও তাই করবো।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তাদের নিকট প্রেরিত নবী বললেন, তোমরা তোমাদের পিতা-মাতাকে যে পথে পেয়েছ, আমরা যদি তার চেয়ে উত্তম পথ তোমাদেরকে দেখিয়ে দেই, তবু কি তোমরা তাদেরই অনুসরণ করবে? উত্তম ও কল্যাণকর পথে চলবে না? কিন্তু কাফেররা তার জবাবে বললো, না আমরা কখনো তোমাদের কথা মানব না।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

'এরপর আমি তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করি, অতএব লক্ষ্য করে দেখ, মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কী হয়েছে'।

অর্থাৎ কাফেররা যখন নবী রসূলগণকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল এবং তাদের জেদ, হঠকারিতা, নাফরমানী এবং বিদ্রোহ চরম পর্যায়ে পৌঁছল, তখন নেমে আসল তাদের উপর আসমানী গজব, ক্ষণিকের মধ্যে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হলো, যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফেরাউন ও নমরুদের সম্প্রদায়, এমনি আরো বহু জাতিকে আল্লাহ পাক পৃথিবী থেকে চির বিদায় করে দিয়েছেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

'অতএব, লক্ষ্য করে দেখ, মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কী হয়েছে'।

যুগে যুগে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, যখন যেখানে যারাই আল্লাহ পাকের নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে, তখনই কিছুটা অবকাশ দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। যারা ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর ছিল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিতে অনিচ্ছুক ছিল এমন কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এ মর্মে যে, যারা ইতোপূর্বে নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছিল তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, এবার তোমাদের পালা, তোমরা যদি সত্যের আহ্বানে সাড়া দাও তবে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তোমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে, যদি তোমাদের সত্য বিরোধিতা অব্যাহত থাকে, তবে তোমাদের পরিণাম যে কত ভয়াবহ তা একবার ভেবে দেখ।

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ○ اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ

'আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন ইব্রাহীম তাঁর পিতা এবং জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা যেসব কিছুর পূজা অর্চনা করছো তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমার সম্পর্ক শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতএব নিশ্চয় তিনিই আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ কাফেরদেরকে যখন তাদের নিকট প্রেরিত নবী তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন তারা বলেছিল, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের মত ও পথ আঁকড়ে ধরে থাকবো।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি পূর্ব পুরুষদের মত ও পথই ধরে থাকা জরুরী মনে কর তবে তোমাদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ), তৌহীদের জন্যে তিনি বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে গেছেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, তোমরা যাদের পূজা-অর্চনা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি বন্দেগী করি এক আল্লাহ পাকের, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাকে লালন-পালন করেন, আমি রুগ্ন হলে যিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন, যিনি আমাকে পানাহার করান, যিনি আমাকে পথ দেখান। অতএব, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ই হতে পারেন তোমাদের আদর্শ।

অথবা কথাটিকে এভাবে বলা যায় যে, কাফেররা বলেছিল, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের পথ সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছি, আমরা আজীবন তার উপরই স্থির থাকব। যদি তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের এত ভক্ত হও, তবে তোমরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা স্মরণ কর, তিনিও তোমাদের অন্যতম পূর্ব পুরুষ, তোমাদের আদি পিতামহ এবং আদর্শ পিতামহ, অথচ তিনি তাঁর পিতা আজর এবং তাঁর জাতির অন্ধ অনুকরণ করেননি, বরং সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে, মানবতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে তাদের রীতি-নীতি তিনি পরিহার করেছেন, পূর্ব পুরুষদের নীতি ভাল হোক কি মন্দ তাই আঁকড়ে থাকা যদি যুক্তিযুক্ত হতো, তবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একথা বলতেন না যে, 'তোমরা যাদের পূজা-অর্চনা কর, তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই'। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ○ اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ.

'আর সে সময়কে স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতা ও জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা যেসব কিছুর পূজা করছো, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই,

আমার সম্পর্ক শুধু এক আল্লাহ পাকের সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন'।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শেরক ও কুফরের ত্রি-সীমানা থেকে দূরে থেকে নিরঙ্কুশ তৌহীদের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে জীবন-যাপন করেছেন, এ বিশ্বাসের কারণেই নমরুদ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল, তিনি এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখেছেন জীবন বাজি রেখে, তাঁর সেই ঈমান ও বিশ্বাসের বরকতেই আল্লাহ পাক নমরুদের অগ্নিকুন্ডকে তাঁর জন্যে ফুলের বাগানে পরিণত করেছেন এবং তাঁকে রক্ষা করেছেন। আর এ বিশ্বাস রক্ষার্থেই অবশেষে ইরাক থেকে তিনি সিরিয়ায় হিজরত করেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর বংশধরদের জন্যে এ আদর্শ রেখে গেছেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

'আর তিনি তৌহীদের এ ঘোষণাকে তাঁর বংশধরদের জন্য স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছেন, যেন তারা (শেরক থেকে তৌহীদের দিকে) প্রত্যাবর্তন করে'।

আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ নিরঙ্কুশ তৌহীদ-অনুরক্তি এবং নজিরবিহীন ত্যাগের বিনিময়ে তাঁর বংশধরদের মধ্যে সর্বদা তৌহীদে বিশ্বাস কায়েম রেখেছেন, তাঁর বংশধরদের থেকে বহু নবী রসূল মনোনীত করেছেন। আর আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আদর্শ বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ' بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

'তিনি তৌহীদের এ ঘোষণাকে তাঁর বংশধরদের মধ্যে রেখে গেছেন'।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এ কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশে সর্বদা তৌহীদপন্থী লোক থাকবে।

ইমাম কুরতবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশে সর্বদা তাঁর আদর্শ কায়েম রাখবেন।

তফসীরকার এবনে যায়েদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের كلمة শব্দটির অর্থ হলো, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা।

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি। এবনে যায়েদ একথা বলার পর আরেকটি আয়াতাংশ তেলাওয়াত করেছেনঃ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ (তিনিই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলমান (সূরা হজ্ব ঃ ৭৮)।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে কলেমার কথা বলা হয়েছে তা হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ)-ও বলেছেন, এ কলেমার অর্থ হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেন, এ 'কলেমা' শব্দ দ্বারা ইসলামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং এরপর তাঁরা هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ পাঠ করেছেন।

আলোচ্য আয়াতের فِيْ عَقِبِهٖ কথাটির ব্যাখ্যায় তফসীরকার আবী নাজীহ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তাঁর সন্তান-সন্ততি। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ

'বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম, অবশেষে তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হলো এবং আগমন করলেন সুস্পষ্টভাষী রসূল'।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, আমি এ কাফেরদেরকে এবং তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে অনেক সুখ-সম্পদ দান করেছি, তাদের কর্তব্য ছিল মহান দাতার প্রতি শোকর গুজার হওয়া, কিন্তু তারা শুধু যে এ কর্তব্য পালন করেনি তাই নয়, বরং দাতার দান নিয়ে এত ব্যস্ত মুগ্ধ হয়েছে যে, স্বয়ং দাতাকেই ভুলে বসেছে। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ পাক তাদেরকে ভোলেননি, তাই তিনি ঘুমন্ত তন্দ্রাহত মানব জাতিকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে সুস্পষ্টভাষী রসূল তথা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, তিনি আগমন করেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নিয়ে। তাদের জন্যে এটি ছিল সুবর্ণ সুযোগ, তারা ইচ্ছা করলে কোরআনের আলোকে নিজেদের অন্তরকে আলোকিত করতে পারতো কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, তারা তা করেনি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনি; তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ

'আর যখন তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হলো, তারা বললো, 'এ-তো যাদু এবং আমরা নিশ্চয় তা প্রত্যাখ্যান করি'।

যখন মক্কাবাসীর নিকট সত্য উপস্থিত হলো তথা পবিত্র কোরআন নাযিল হলো এবং সুস্পষ্টভাষী রসূল আগমন করলেন অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১. তফসীরে তাবারী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-৩৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৫৬-৫৭
তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২০৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৬৫

ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হলো, তখন তারা তাঁকে মেনে নেয়নি এবং কোরআনে করীমকে যাদু বলে আখ্যায়িত করলো, তারা যে অন্ধকারে ছিল সে অন্ধকারেই রয়ে গেল।

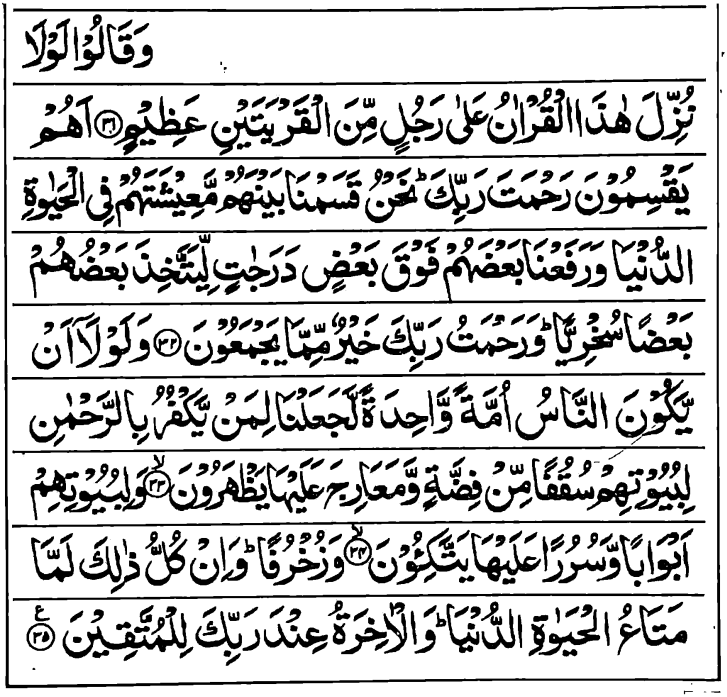
وَقَالُوا لَوْلَا
نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾ اَهُمْ
يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْلَآ اَنْ
يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ
لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوْتِهِمْ
اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا
مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾

তরজমা

(৩১) আর তারা বলে, এ দু'টি জনপদের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর কোরআন কেন নাযিল হলোনা?

(৩২) (হে রসূল!) তারা কি আপনার প্রতিপালকের রহমত ভাগ-বাটোয়ারা করে? আমিই তাদের মধ্যে পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বন্টন করে থাকি। আমিই তাদের একের তুলনায় অন্যকে উচ্চ মর্যাদা দান করে থাকি, যেন তারা একে অন্যকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, তারা যা কিছু সঞ্চয় করছে আপনার প্রতিপালকের রহমত তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর।

(৩৩) আর যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে সমস্ত মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে (কাফের হয়ে যাবে), তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদের ঘরের ছাদ এবং উপরে উঠবার সিড়িগুলোকে স্বর্ণ রোপ্যের করে দিতাম।

(৩৪) এবং তাদের ঘরের দরজা এবং হেলান দিয়ে বসবার আরাম কেদারাও স্বর্ণের হতো।

(৩৫) মূলতঃ এসব কিছু শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর (হে রসূল!) পরহেযগারদের জন্যে আপনার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পরকালীন জীবনের সাফল্য।

তফসীরুল কোরআন

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

'আর তারা বলে, 'এ দু'টি জনপদের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর কোরআন কেন নাযিল হলোনা'?

শানে নুযুল

এবনে জরীর যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন, তখন আরববাসী তাঁকে আল্লাহর রসূল হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত হলোনা এবং বলতে থাকলো, আল্লাহ পাকের শান অতি উচ্চ, তিনি কোন মানুষকে তাঁর রসূল বা বাণীবাহক হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না, তখন কোরআনে করীমের এ আয়াত নাযিল হলোঃ

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ.....

'মানুষের জন্যে এটি কি আশ্চর্যজনক বিষয়? যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট ওহী প্রেরণ করেছি'।

যখন এ মর্মের আয়াত সমূহ বার বার নাযিল হলো তখন কাফেররা বলতে থাকে, যদি মানুষের নবী রসূল হওয়া একান্ত জরুরীই হয় তবে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে কেন প্রেরণ করা হলো? তিনি ব্যতীত আরো অনেক যোগ্য লোক ছিল, বিশেষতঃ মক্কা এবং তায়েফে অনেক বিখ্যাত প্রভাবশালী লোক ছিল, তাদের মধ্যে কোন একজনকে কেন নবী মনোনীত করা হলোনা? তারই জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন।

এ আয়াতের قريتين (দুটি জনপদ) শব্দ দ্বারা মক্কা শরীফ এবং তায়েফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর رجل عظيم বলে বিখ্যাত, সমৃদ্ধশালী, প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

কাফেররা মনে করেছে, নবুওয়্যত হলো মানুষের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ, তা তেমনই কোন বিখ্যাত সম্পদশালী লোককেই দেয়া উচিত। তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, নবুওয়্যত ও রেসালত একটি রুহানী মর্তবা তথা আধ্যাত্মিক মর্যাদা; দুনিয়ার

সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিত্ত-বৈভবের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। আল্লাহ পাক যাকে এজন্যে পছন্দ করেন, তাকেই এ পদমর্যাদা দান করেন।

এবনুল মুনজের কাতাদার (রঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওলীদ এবনে মগীরাহ বলেছিল, এ কোরআন যা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি নাযিল হয়, সত্যিই যদি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হতো, তবে আমার প্রতি অথবা এবনে মাসুদ সাকাফীর প্রতি নাযিল হতো। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, তাতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল তদানীন্তন কালে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল ওতবা এবনে রবীয়া, আর তায়েফে এমন ব্যক্তি ছিল আবদ ইয়ালাইল, এ দু' ব্যক্তির যে কোন একজনের প্রতি ওহী নাযিল হতে পারতো!

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তখন মক্কায় ওলীদ এবনে মগীরাহ এবং তায়েফে হাবিব এবনে আমর এবনে ওবায়েদ সাকাফী বিখ্যাত ব্যক্তি ছিল। এ দু'জনের উদ্দেশ্যেই কাফেররা ঐ উক্তি করেছিল। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদের এ অযৌক্তিক মন্তব্যের বাতুলতা ঘোষণা করে এরশাদ করেছেনঃ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

'(হে রসূল!) তারা কি আপনার প্রতিপালকের রহমত ভাগ-বাটোয়ারা করে? আমিই তাদের মধ্যে পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বন্টন করে থাকি। আমিই তাদের একের তুলনায় অন্যকে উচ্চ মর্যাদা দান করে থাকি, যেন তারা একে অন্যকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, তারা যা কিছু সঞ্চয় করছে (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের রহমত তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর'।

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের একটি কথার উল্লেখ রয়েছে, তারা বলেছিল, এই কোরআন যদি মক্কা বা তায়েফের কোন সমৃদ্ধশালী লোকের প্রতি নাযিল হতো, তবু এর একটা যুক্তি ছিল, কাফেরদের এ ভিত্তিহীন কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তারাই কি আল্লাহ পাকের রহমত বিতরণ করে থাকে? তাদের মর্জি মোতাবেকই কি আল্লাহ পাকের রহমত বন্টন করা হবে? তাদের এ জীবনে রিযক তো আমিই দিয়ে থাকি, কাকে কম দেয়া হবে এবং কাকে বেশী দেয়া হবে– এসবের সিদ্ধান্ত স্বয়ং আল্লাহ পাকই করেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তের কারণেই দুনিয়াতে কেউ ধনী, কেউ গরীব হয়, এ ব্যাপারে দুনিয়ার কোন লোককে জিজ্ঞাসা করা হয় না। দুনিয়াতে আল্লাহ পাক কোন লোককে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন করেন, আর কোন লোককে নিম্ন পর্যায়ে রাখেন। এ সম্পর্কে কোন কথা বলার অধিকার কারোই নেই। মানুষ যাতে করে একে অন্যকে

নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারে, সেজন্যেই এ ব্যবস্থা। দুনিয়ার সম্পদ ও মর্যাদার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য করা হয় তা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের মর্জির ব্যাপার, এক্ষেত্রে তিনি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন না, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কেউ এ সম্পর্কে আরজী পেশ করতে পারেনা। তাই আল্লাহ পাকের রহমতের ব্যাপারেও তাঁর দরবারে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেনা। আলোচ্য আয়াতে "রহমত" শব্দ দ্বারা নবুওয়্যতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষুদ্র বিষয়ে যেমন কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারেনা, ঠিক তেমনি আখেরাতের ব্যাপারেও কেউ কথা বলতে পারেনা। কেননা নবুওয়্যত মানব জাতির জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা।

আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাঁকে এ মর্যাদায় আসীন করেন। কারো দুনিয়াতে সম্পদশালী হওয়া আল্লাহ পাকের দরবারে সম্মানিত হওয়ার লক্ষণ নয়, নবুওয়্যত হলো মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দলিল এবং মানব জাতির সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রমাণ। এ শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন গুরুত্ব নেই।

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ .

আর (হে রসূল!) আপনার পরওয়ারদেগারের রহমত সেসব কিছু থেকে উৎকৃষ্টতর যা তারা সঞ্চয় করে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের রহমত তথা নবুওয়্যত দুনিয়ার সব কিছু থেকে উৎকৃষ্টতর যা তারা সঞ্চয় করে থাকে।

দুনিয়ার সম্পদ যা আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট, তা বিতরণে যেমন আল্লাহ পাক কাউকে জিজ্ঞাসা করেন না, ঠিক তেমনি যা উৎকৃষ্টতর তা বিতরণেও কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রশ্নই ওঠেনা। আল্লাহ পাক যাকে যে পরিমাণ রিযক দান করেন, তার উপর কোন প্রকার আপত্তি করার ক্ষমতা কারোই নেই। কাকে অধিক পরিমাণে দান করবেন এবং কাকে পরিমিত পরিমাণে দেবেন সে ক্ষমতা এবং ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, আর কারো নয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ যদি আল্লাহ পাকের দরবারে দুনিয়ার গুরুত্ব একটি মাছির ডানার সমানও হতো, তবে আল্লাহ পাক কোন কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করার অনুমতি দান করতেন না।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা কখনও স্বর্ণ রৌপ্যের তৈরী পাত্রে পানাহার করোনা, কেননা এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্যে, আর আখেরাতে আমাদের জন্যে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ আখেরাতের কল্যাণ শুধু সেসব লোকদের জন্যে যারা দুনিয়াতে খুব সতর্ক অবস্থায় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন-যাপন করে। আখেরাতে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত এবং নেয়ামত তারা লাভ করবে, তাতে আর কেউ তাদের সঙ্গে শরীক হবেনা।

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৫৯

একবার হযরত ওমর (রাঃ) দ্বিপ্রহরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন, তখন তিনি একটি চাটাইয়ের উপর বিশ্রামরত ছিলেন, চাটাইয়ের নকশার চিহ্ন তাঁর দেহ মোবারকে দেখা যাচ্ছিল, এ দৃশ্য দেখে হযরত ওমর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! রোমক সম্রাট এবং পারশ্যের সম্রাট কত শান-শওকতে জীবন-যাপন করে, অথচ আপনি আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রিয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হওয়া সত্ত্বেও আপনার এ অবস্থা। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হে এবনে খাত্তাব! তুমি কি কোন প্রকার সন্দেহে রয়েছো? এরা তো সে সব লোক যাদের সৎ কাজের বিনিময় এখানেই দিয়ে দেয়া হয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে তাদেরকে দুনিয়া দেয়া হোক আর আমাদেরকে আখেরাত।[১]

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ○ وَ لِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ. وَزُخْرُفًا.

'আর যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে, সমস্ত মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে (কাফের হয়ে যাবে) তবে যারা দয়াময় আল্লাহ পাককে অস্বীকার করে, আমি তাদের ঘরের ছাদ এবং উপরে উঠবার সিড়িগুলোকে স্বর্ণ রৌপ্যের করে দিতাম এবং তাদের ঘরের দরজা এবং হেলান দিয়ে বসবার আরাম কেদারাও স্বর্ণের হতো'।

অর্থাৎ পার্থিব জগতে ধন-সম্পদকে কাফেররা শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মানের প্রতীক মনে করে, অথচ আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এসবের কোন গুরুত্বই নেই। আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-রহস্য এবং বিশেষ বিবেচনা যদি এ পর্যায়ে প্রতিবন্ধক না হতো তবে যে কাফেররা করুণাময় আল্লাহ পাককে অস্বীকার করে, তাদের বাড়ী-ঘরের ছাদ সিড়ি পর্যন্ত স্বর্ণ রৌপ্যের দ্বারা তৈরী করে দেয়া হতো, আর যেসব আরাম কেদারায় তারা বসে সেগুলোও স্বর্ণ রৌপ্যের দ্বারা তৈরী করা হতো। কিন্তু যেহেতু এ আশঙ্কা রয়েছে যে, অর্থ-কাঙ্গাল সকল মানুষই এমন অবস্থায় কাফের হয়ে যেত, এমন অন্যায় আল্লাহ পাকের নিকট অপছন্দনীয়, অনভিপ্রেত। কাফেরদেরকে দুনিয়ার অনেক কিছুর মালিকানা দেয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ পাকের দরবারে দুনিয়া অত্যন্ত ঘৃণ্য আর কাফেররাও আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত ঘৃণ্য, তাই আল্লাহ পাক ঘৃণ্য লোকদেরকে ঘৃণ্য বস্তু দিয়ে দিয়েছেন।

দুনিয়ার হাকীকত

হযরত মোস্তাওরাদ এবনে শাদ্দাদ ফাহরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি সে সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, যখন কিছু সাথী একটি মৃত বকরীর পার্শ্বে

১ . তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৩৩

সমবেত হয়েছিলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমরা লক্ষ্য করছো যে, এ মৃত বকরীটির কোন গুরুত্ব নেই বলে বাড়ীর লোকেরা একে বাইরে ফেলে দিয়েছে। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, জ্বী-হ্যাঁ, তারা এ কারণেই একে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এই বাড়ীর লোকদের দৃষ্টিতে এ ছাগল ছানার যেমন কোন গুরুত্ব নেই, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন গুরুত্ব নেই।

আবু নাঈম লিখেছেন, দাউদ এবনে হেলাল বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ সহীফায় লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, হে দুনিয়া! তুমি নেককার লোকদের নিকট সুসজ্জিত হয়ে হাযির হও, কিন্তু নেককারদের দৃষ্টিতে তুমি অত্যন্ত হীন এবং তুচ্ছ, আমি তাদের অন্তরে তোমার ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছি, নেককারগণ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবেনা। তোমার পরিণতি ধ্বংস, তুমি ধ্বংসের দিকেই যেতে থাক। হে দুনিয়া! যেদিন আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি, সেদিনই আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তুমি কারো জন্যে চিরদিন থাকবেনা, আর কেউ তোমার জন্যে চিরদিন থাকবেনা। তোমার অন্বেষণকারী তোমার প্রতি যত বেশী লোভীই হোক না কেন, আর তোমাকে নিয়ে যত কৃপণতাই করুক না কেন। কিন্তু যারা নেককার, যারা আমার সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী, যারা সততা, সত্যবাদিতার আদর্শে অটল অবিচল হয়ে সুদৃঢ় থাকে, তারা আমার রহমতের আশা করে থাকে। মোবারক হোক তাদের জন্যে সেই সওয়াব যা আমার নিকট তাদের জন্যে রয়েছে, তারা কবর থেকে উঠে আমারই নিকট হাযির হবে। তাদের নূর তাদের সম্মুখে থাকবে। এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, আমি তাদেরকে আমার রহমতের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেব, যা তারা আশা করে থাকে।

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিযার উপর লা'নত এবং যা কিছু দুনিয়ার উপর আছে তার উপর, শুধু ঐ বস্তু ব্যতীত যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে (আগত) অর্থাৎ হেদায়েত, ঈমান, ইসলাম, আসমানী কিতাব সমূহ, ফেরেশতা প্রভৃতি।

এবনে মাজা শরীফেও এই হাদীস হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে সংকলিত হয়েছে তবে শেষ বাক্যটিতে পার্থক্য রয়েছে। তাতে রয়েছে, দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর প্রতি লা'নত, শুধু আল্লাহ পাকের জিকর এবং জিকরের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ এবং আলেম ও তালেবে এলম ব্যতীত। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, শুধু কল্যাণকর কাজের হুকুম দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহ পাকের জিকর ব্যতীত। আর এই হাদীস হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকেও বর্ণিত। তাঁর বর্ণনায়ও শেষাংশে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, "শুধু সে কথা ও কাজ যা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় তা ব্যতীত"।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়া সে ব্যক্তির ঘর, যার আখেরাতে (বেহেশতে) কোন ঘর নেই। দুনিয়া সে ব্যক্তির সম্পদ, যার আখেরাতে কোন সম্পদ নেই, আর এ সম্পদ সে ব্যক্তিই সঞ্চয় করে যার বুদ্ধি নেই। (আহমদ, বায়হাকী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ দুনিয়া হলো মোমেনের জন্যে কারাগার এবং হালকা স্বপ্নের ন্যায়। যখন মোমেন ব্যক্তি দুনিয়া ছেড়ে চলে যায় তখন সে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে এবং তার স্বপ্নটি ভেঙে যায়। (আহমদ, তেবরানী, হাকেম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়া হলো মোমেনের জন্যে কারাগার এবং কাফেরের জন্যে জান্নাত।

এই হাদীসের তাৎপর্য হলো এই, দুনিয়াতে মোমেন ব্যক্তি যত আরাম-আয়েশেই থাকুক না কেন, আখেরাতে তার জন্যে যে সওয়াব বা শুভ-পরিণতি নির্দিষ্ট রয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দুনিয়া মোমেনের জন্যে কারাগার ব্যতীত আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে, কাফের যত দুঃখ-কষ্টে থাকুক না কেন, আখেরাতে তার জন্যে যে আযাব নির্ধারিত রয়েছে তার প্রেক্ষিতে দুনিয়া কাফেরের জন্যে জান্নাতও বটে।

কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, এই হাদীস সমূহের দ্বারা বোঝা যায় যে, দুনিয়া সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। অথচ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান, যাতে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কথাই রয়েছে। দুনিয়াত্যাগী হওয়ার, অর্থ-সম্পদ রোজগার না করার শিক্ষা ইসলাম দেয়না, যদি অর্থ সম্পদ রোজগার না-ই করা হয় তবে যাকাত ফরজ কিভাবে হবে?

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এভাবেঃ মোমেনদের জন্যে দুনিয়ার নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়া, দুনিয়ার সম্পদ আহরণ করা নিষিদ্ধ নয়, তবে দুনিয়ার মহব্বত তথা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং আখেরাতকে ভুলে যাওয়া নিষিদ্ধ। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও এরশাদ করেছেন যে, ফরজ নামায আদায়ের পর হালাল রুজীর অন্বেষণ করাও একটি ফরজ। দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ আহরণের জন্যে শর্ত হলো অন্যের হক্ব যেন বিনষ্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা তথা হালাল ও বৈধ পন্থায় আয় রোজগার করা, হারাম বা অবৈধ পন্থা থেকে বিরত থাকা। দুনিয়ার সম্পদ উপার্জনে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতকে ভুলে না যাওয়া তথা নামায, যাকাত, রোজা, হজ্ব প্রভৃতি কর্তব্য। যে দুনিয়াদারী মানুষকে আল্লাহ পাকের বিধান পালনে বাধা দেয়, এমন দুনিয়াদারী মোমেনের জন্যে বৈধ নয়।

وَإِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ

'মূলতঃ এসব কিছু শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর (হে রসূল!) পরহেযগারদের জন্যে আপনার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পরকালীন জীবনের সাফল্য'।

অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহ পাকের প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়ার মানদন্ড নয়, যারা আল্লাহর প্রিয় তারাও এ নেয়ামত লাভ করেন, আর যারা আল্লাহ পাকের অপ্রিয়, অপছন্দনীয় তাদেরকেও আল্লাহ পাক দুনিয়ার নেয়ামত দান করে থাকেন, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত শুধু আল্লাহ পাকের প্রিয় পছন্দনীয় বন্দাদের জন্যে মোত্তাকী

বা পরহেযগার লোকদের জন্যেই সংরক্ষিত রয়েছে। যেহেতু দুনিয়া অভিশপ্ত তাই কাফেরদেরকেও এর অংশ দেয়া হয়েছে। যদি এ আশঙ্কা না থাকতে যে, দুনিয়ার সব লোক কাফের হয়ে যাবে তবে দুনিয়ার সব নেয়ামত শুধু কাফেরদেরকেই দেয়া হতো। আর যদি দুনিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হতো তবে কাফেরদেরকে এর ক্ষুদ্রতম অংশও দেয়া হতোনা।

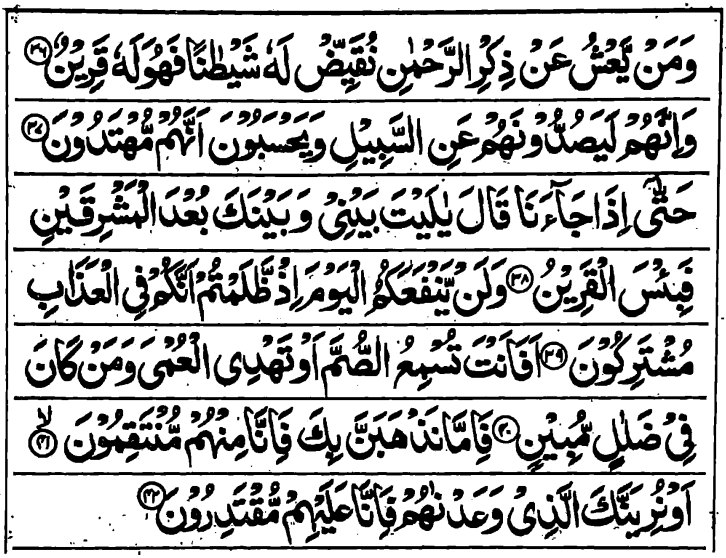
وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾
وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾
حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ
فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾
اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾

তরজমা

(৩৬) আর যে ব্যক্তি করুণাময় আল্লাহ্ পাকের স্মরণে বিমুখ হয়, আমি তার জন্যে একটি শয়তান নিয়োজিত করি, এরপর সে-ই হয় তার সহচর।

(৩৭) আর নিশ্চয় শয়তানেরাই মানুষকে সরল সঠিক পথ থেকে বিরত রাখে, অথচ মানুষ ধারণা করে তারা সঠিক পথেই আছে।

(৩৮) অবশেষে যখন সে আমার নিকট হাযির হবে, তখন শয়তানকে সে বলবে হায় আক্ষেপ! আমার এবং তোমার মধ্যে যদি পূর্ব পশ্চিমের দূরত্ব থাকত তবে কত ভাল হতো)। কত জঘন্য সহচর সে!

(৩৯) তোমরা যখন অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে গেছ, তখন তোমাদের এ অনুতাপ কোন কাজে আসবেনা। যেহেতু তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলে, তাই আযাবের মধ্যে তোমরা সকলেই শরীক রয়েছ।

(৪০) (হে রসূল!) তবে কি আপনি বধিরকে শোনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে, পারবেন কি তাকে সঠিক পথ দেখাতে?

(৪১) (হে রসূল!) আমি যদি কখনো আপনাকে নিয়েও যাই (আপনার মৃত্যু ঘটাই), তবু আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

(৪২) অথবা (হে রসূল!) আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব, তাদেরকে যে শাস্তির কথা দিয়েছিলাম তা ঠিক রেখেছি, তারা যে আমারই আয়ত্বে রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, এখানকার দ্রব্য-সামগ্রীও নিতান্ত সাময়িকভাবেই উপকারী, তবে যারা এ জীবনে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করবে, তাদের জন্যে আখেরাতের সাফল্য সুনিশ্চিত রয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে মুগ্ধ থাকে এবং যিনি দুনিয়ার জীবন দান করেছেন তার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আখেরাতে তাদের শাস্তি অবধারিত, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ

'আর যে ব্যক্তি করুণাময় আল্লাহ পাকের স্মরণে বিমুখ হয়, আমি তার জন্যে একটি শয়তান নিয়োজিত করি, এরপর সে-ই হয় তার সহচর'।

শানে নুযুল

মোহম্মদ এবনে ওসমান মাখজুমী বর্ণনা করেন, মক্কার কোরায়শরা পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক সাহাবীর জন্যে একজন লোক নিযুক্ত করবে যে তাঁকে বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তালহা এবনে ওবায়দুল্লাহকে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জন্যে উল্লিখিত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হলো। তালহা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট এমন সময় পৌঁছলো, যখন তিনি কিছু লোকের সঙ্গে বসেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তালহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমাকে কোন্ কথা মানার জন্যে আহ্বান করছো? সে বললো আমরা আপনাকে লাত এবং ওজ্জার পূজা করার জন্যে আহ্বান করছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, লাত কি? সে বললো, আমাদের প্রতিপালক, তিনি জিজ্ঞাস করলেন, ওজ্জা কি? তালহা বললো, কয়েকটি কন্যা। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, তাদের মাতা কে ছিল? তালহা নিরুত্তর হয়ে গেল। তখন তার সাথীদেরকে তালহা বললো, তোমরা তাঁর প্রশ্নের জবাব দাও, কিন্তু সকলেই নীরব রইলো। তালহা বললো, হে আবু বকর! উঠুন, এরপর সে পাঠ করলো আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদুআন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ! তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

---

১. তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৯
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৬৪

আয়াতের মর্মকথা

যারা আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, পবিত্র কোরআনের উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত হয়না এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েত মেনে চলেনা, তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একটি শয়তানকে সহচর নিয়োজিত করা হয়, সে শয়তান সঙ্গী তাকে পথভ্রষ্ট করে রাখে, ঐ অবস্থায় তার জীবন অতিবাহিত হয়, আত্মবিস্মৃত ব্যক্তিটিকে ঐ শয়তান সর্বদা বিভ্রান্ত করে রাখে, কোন প্রকারেই তাকে সৎ পথ অবলম্বন করতে দেয়না। পরিণামে সে ভুলকে ভাল মনে করে আর মিথ্যাকে মনে করে সত্য, ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা সে হারিয়ে ফেলে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

নিশ্চয় শয়তানেরা তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বারণ করতে থাকে কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা মনে করে যে তারা সঠিক পথে আছে। পরিণামে তারা কখনো সঠিক পথের সন্ধান পায় না, কেননা শয়তান তাদেরকে সম্পূর্ণ কাবু করে ফেলে এবং তাদের মনে এ ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে, তারাই সঠিক পথে আছে।

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ

'অবশেষে যখন সে আমার নিকট হাযির হবে তখন শয়তানকে সে বলবে, হায় আক্ষেপ! আমার এবং তোমার মধ্যে যদি পূর্ব পশ্চিমের দূরত্ব থাকত তবে কত ভাল হতো'।

যারা শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়ে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে, তারা অবশেষে যখন কেয়ামতের দিন হাযির হবে, তখন হাড়ে হাড়ে টের পাবে যে, তারা কত জঘন্য বন্ধুর সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং এ সত্য তাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ পাবে যে, ঐ মন্দ বন্ধুটিই হলো তার সর্বনাশের মূল কারণ, কেননা, সে-ই তাকে তৌহীদে বিশ্বাস করতে বারণ করেছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর অনুসরণ থেকে বিরত রেখেছে। তখনই তারা বলবে, হায় অক্ষেপ! যদি দুনিয়ার জীবনে তোর এবং আমার মধ্যে পূর্ব পশ্চিমের দূরত্ব থাকত তবে কত ভাল হতো!

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন কোন কাফেরকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন দুনিয়ার জীবনের যে শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করেছে, তাকে ঐ ব্যক্তির সঙ্গী করে দেয়া হবে। শয়তান তার কাছ থেকে পৃথক হবেনা; অবশেষে উভয়কে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।[১]

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৩৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৬৫

আলোচ্য আয়াতে যে শয়তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা জ্বীনও হতে পারে, মানুষও হতে পারে যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

অর্থাৎ জ্বীন ও মানুষ উভয় প্রকারের শয়তানই মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে থাকে।

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ

তোমরা যখন অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে গেছ, তখন তোমাদের এ আক্ষেপ-অনুতাপ কোন কাজেই আসবেনা। যেহেতু তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলে, তাই আযাবেও তোমরা সকলেই শরীক রয়েছ অর্থাৎ যেহেতু দুনিয়াতে তোমরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ছিলে, আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করতে, তাঁর নাফরমানী করতে, তাই আজ তোমরা কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছ, কেননা তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ। দুনিয়াতে শেরক ও কুফরীতে তোমরা ছিলে পরস্পরের সাথী, তাই আজ দোযখের আযাবেও তোমরা একত্রিত থাকবে।

অথবা এর অর্থ হলো, তোমাদের উভয়ের দোযখে একত্রিত থাকা তোমাদের জন্যে উপকারী হবেনা অর্থাৎ দুনিয়াতে সব লোক যদি একই প্রকার বিপদে পড়ে, তবে বিপদের উপলব্ধি কিছুটা কমে যায়, কেননা মনে এ সান্ত্বনা থাকে যে, বিপদে আমরা একা নই, কিন্তু আখেরাতে এসব উপলব্ধিও আসবেনা এবং একত্রিত থাকার কারণে শাস্তিও মাফ হবেনা, কেননা প্রত্যেকের উপর আযাব হবে কঠিনতর।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

'(হে রসূল!) তবে কি আপনি বধিরকে শোনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে, পারবেন কি তাকে সঠিক পথ দেখাতে?'

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, (হে রসূল!) কাফেরদের দুর্ব্যবহারে তাদের অন্যায় আচরণে আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না, তারা বধির, তারা অন্ধ, বধিরকে হেদায়েতের কথা শোনানো এবং অন্ধকে পথ দেখানো আপনার কাজ নয়। এ বিষয়টি আপনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের হাতে ছেড়ে দিন। যারা কুফরী ও নাফরমানীতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং গোমরাহীর অন্ধকারে এভাবে নিমজ্জিত হয়েছে যে, কুফরী ও নাফরমানীর আবরণে তারা আবৃত হয়ে আছে, ফলে তারা সঠিক পথ দেখবেনা, তাই (হে রসূল!) আপনি বধির লোকদেরকে হক্ব কথা শোনাতে পারবেন না, আর এ অন্ধদেরকে আপনি সঠিক পথ দেখাতে পারবেন না।

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ

'(হে রসূল!) আমি যদি কখনো আপনাকে নিয়েও যাই (আপনার মৃত্যু ঘটাই), তবু আমি তাদের থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবো'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "তাদেরকে" বলতে মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেবেন, আরো এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) যদি এরই মধ্যে আপনার ওফাত হয়ে যায় তবু তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে, শাস্তি এতটুকু কম হবেনা।

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ

'অথবা (হে রসূল!) আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব, তাদেরকে যে শাস্তির কথা দিয়েছিলাম তা ঠিক রেখেছি, তারা আমারই আয়ত্বে রয়েছে'।

অর্থাৎ কাফেরদেরকে যে আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, যথা সময়ে তা তাদের প্রতি আপতিত হবে। যদি এরই মধ্যে আপনার ওফাত হয়ে যায়, তবু দুনিয়াতেই তারা তাদের শাস্তি পেয়ে যাবে, আর আখেরাতেও হবে তাদের শাস্তি। তারা আমার আয়ত্বেই রয়েছে, আমার আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায়ই নেই, যখন ইচ্ছা তখন আমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি। তারা রয়েছে আমার নিয়ন্ত্রণাধীন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ পাকের এ কথা বাস্তবায়ন হয়েছে, তাদের নেতৃস্থানীয়সহ ৭০ জন কাফের বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, এভাবে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন।

فَاسْتَمْسِكْ
بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ
لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً
يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰي بِاٰيٰتِنَآ اِلٰي فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ
فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ
مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۖ وَ
اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ
السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

তরজমা

(৪৩) অতএব, (হে রসূল!) ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি যে আদেশ করা হয়েছে, তা সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখুন, নিশ্চয় আপনি সরল সঠিক পথেই রয়েছেন।

(৪৪) আর নিশ্চয় পবিত্র কোরআন আপনার ও আপনার জাতির জন্যে বড়ই সম্মানের বস্তু, আর অদূর ভবিষ্যতে তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।

(৪৫) আর (হে রসূল!) আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি দয়াময় আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কোন প্রভূ স্থির করেছিলাম যার পূজা অর্চনা করা যায়।

(৪৬) আর নিশ্চয় আমি মূসাকে আমার নিদর্শন সহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, নিশ্চয় আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূল।

(৪৭) এরপর তাদের নিকট সে যখন আমার নিদর্শনগুলোসহ উপস্থিত হয় তখন তারা হাসি-ঠাট্টা করতে লাগে।

(৪৮) আর আমি যখনই তাদেরকে কোন নিদর্শন দেখাই, তখন প্রথম থেকে পরবর্তীকে বড় করে দেখাই, এরপর আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, যেন তারা ফিরে আসে।

(৪৯) তারা আরো বলেছিল, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালক তোমাকে যেমন শিখিয়ে রেখেছেন, তেমনি তুমি আমাদের জন্যে তোমার প্রতিপালককে ডাক, আমরা নিশ্চয় ঈমান আনবো।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মক্কার কাফেরদের কুফরী ও নাফরমানীর পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের অন্যায়-অনাচারের শাস্তি অবশ্যই তাদেরকে ভোগ করতে হবে। এরপর আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

'অতএব, (হে রসূল!) ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি যে আদেশ করা হয়েছে, তা আপনি সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকুন, নিশ্চয় আপনি সরল সঠিক পথেই রয়েছেন'।

ওহীর মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, আর এটি চিরসত্য, সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে রয়েছে এতে হেদায়েত। সমগ্র মানব জাতির জন্যে এটি হলো এক পরিপূর্ণ জীবন-বিধান। এ জীবন বিধানের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানব জাতি লাভ করবে সার্বিক কল্যাণ। অতএব, (হে রসূল!) আপনি সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকুন এই কোরআনে করীমকে। পবিত্র কোরআনই মানব জাতিকে জান্নাতের পথ দেখায় অর্থাৎ চিরকালীন জীবনের শান্তি কল্যাণ এক কথায় পরম সাফল্য লাভ হবে পবিত্র কোরআনের শিক্ষার উপর আমল করার মাধ্যমে।

اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

'(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনি সরল সঠিক পথের উপর রয়েছেন'।

অতএব, যে আপনার অনুসরণ করবে, সে-ই সরল সঠিক পথ লাভ করবে। আর যে সরল সঠিক পথ পাবে, সে-ই জান্নাতে যাবে।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে জীবন-সাধনার সাফল্যের জন্যে দু'টি পন্থা সুনির্দিষ্ট রয়েছেঃ ১. পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন, ২. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ।

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ

'আর নিশ্চয় পবিত্র কোরআন আপনার ও আপনার জাতির জন্যে বড়ই সম্মানের বস্তু, আর অদূর ভবিষ্যতে তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে'।

হযরত আদী এবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক জানেন যে, আমার অন্তরে আমার জাতির জন্যে মমত্ববোধ রয়েছে, এজন্যে আল্লাহ পাক এ আয়াতে আমার মর্যাদার পাশাপাশি আমার জাতির মর্যাদারও উল্লেখ করেছেন, এভাবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। এরপর আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন,

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ.

'আর (হে রসূল!) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন'।

অতএব, আল্লাহ পাকের শোকর, তিনি আবু বকর সিদ্দিককে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত করেছেন। (আল-হাদীস)

হযরত আদী এবনে হাতেম (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখনই তাঁর সম্মুখে কোরায়শের উল্লেখ করা হতো, তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন, তাঁর চেহারা মোবারকে খুশীর ভাব দেখা যেত। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনেক সময় وَاِنَّهٗ لِذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় এই কোরআন আপনার জন্যে ও আপনার জাতির জন্যে অত্যন্ত বড় মর্যাদার কারণ, চির অভিন্দিত এবং চির প্রশংসিত হওয়ার উপকরণ। পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের নিজস্ব কালাম, তাঁর মহান বাণী, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে পরিপূর্ণ সংবিধান, মক্কার কোরায়শ তথা সমগ্র আরব জাতির জন্যে এর চেয়ে বড় গৌরবের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। কেননা পবিত্র কোরআন সর্বপ্রথম তাঁদেরই নিকট নাযিল হয়েছে। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষায় রয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসীর ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণ।

এ আয়াতে সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয়েছে– وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ অর্থাৎ আর (হে রসূল!) নিশ্চয় এই কোরআন আপনার জন্যে মহান মর্যাদার কারণ, কেননা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিই কোরআন নাযিল করেছেন, তাঁকেই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল মনোনীত করেছেন, তাঁর নিকটই নবুওয়্যতের ২৩ বছরে হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-কে ২৪ হাজার বার হাযির হতে হয়েছে এবং আল্লাহ পাক সর্বকালের সকল মানুষের মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, আর তাঁর মাধ্যমে কোরআনে করীমের এ শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত লাভ করেছেন তাঁর জাতির লোকেরা।

আলোচ্য আয়াতের ذكر শব্দটি মর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ (হে রসূল!) নিশ্চয় এই কোরআন আপনার জন্যে এবং আপনার জাতির জন্যে বিশেষ মর্যাদা ব্যতীত

আর কিছুই নয়। এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ), সুদ্দী (রঃ), এবনে যায়েদ (রঃ) এবনে জরীর (রঃ) এবং এবনে কাসীর (রঃ)।

আলোচ্য আয়াতের قوم শব্দটি দ্বারা আরব জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং আরব জাতিই সর্বপ্রথম তা পেয়েছে। অতএব, এ মর্যাদা সর্বপ্রথম আরব জাতিই লাভ করেছে। আরবদের মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাদের যত বেশী সম্পর্ক তারা তত বেশী মর্যাদা পেয়েছে। যেমন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোরায়শ গোত্রভুক্ত ছিলেন, তাই কোরায়শ গোত্র অন্যদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। আর কোরায়শের মধ্যে বনী হাশেম ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আরো ঘনিষ্ঠতর। কাজেই তাদের মর্যাদা হয়েছে আরও উচ্চতর। যাহোক, তফসীরকারগণ এ পর্যায়ে একথাও বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে পবিত্র কোরআন মর্যাদার উপকরণ হয়েছে, কেননা আল্লাহ পাক তাঁকে হেকমত দান করেছেন এবং পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক তাঁকেই সম্বোধন করেছেন। আর পবিত্র কোরআন দ্বারা তাঁর জাতিকেও উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে, অর্থাৎ মোমেনদেরকে এ উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে, কেননা আল্লাহ পাক তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে হেদায়েত করেছেন।

অতএব, قوم শব্দটি দ্বারা কোরায়শ বা আরব জাতি অথবা সমগ্র উম্মতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে قوم শব্দ দ্বারা আরব জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

আলোচ্য আয়াতে যে মর্যাদার কথা বলা হয়েছে কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এটি হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেলাফতের মর্যাদা।

আল্লামা বগভী (রঃ) যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন একথা জিজ্ঞাসা করা হতো, আপনার পর ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? তখন তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকতেন। কিন্তু এ আয়াত নাযিল হবার পর যখন এ প্রশ্ন করা হতো তখন তিনি বলতেন, এ দায়িত্ব কোরায়শ পালন করবে অর্থাৎ এ উচ্চ মর্যাদা কোরায়শই লাভ করবে। হযরত আলী (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

---

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৬৮
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৮৪

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যতক্ষণ দু' ব্যক্তিও থাকবে, ততক্ষণ খেলাফতের বিষযটি কোরায়শদের হাতেই থাকবে।

হযরত মাবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজেই হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, খেলাফতের বিষয়টি কোরায়শের নিকটই থাকবে। যে কোরায়শের সঙ্গে শত্রুতা করবে, আল্লাহ পাক তাকে অপমানিত করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোরায়শ দ্বীন ইসলামের উপর সঠিকভাবে কায়েম থাকবে।[১]

وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ

'এবং অদূর ভবিষ্যতে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে'।

অর্থাৎ কোরআনে করীম সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হবে কোরআনে করীমের মহান শিক্ষার তবলীগ সম্পর্কে, আর উম্মতের প্রত্যেকটি লোককে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোরআনের মহান শিক্ষার উপর আমল সম্পর্কে অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে উপর কতখানি আমল করেছে তা জিজ্ঞাসা করা হবে।

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (রঃ), কালবী (রঃ) এবং জুযাজ (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক যে পবিত্র কোরআনের দ্বারা তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, এর কতখানি শোকর আদায় করেছ?[২]

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা পবিত্র কোরআনকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে কেন তা করেছিল?

অথবা এর অর্থ হলো, যারা কোরআনে করীমের সত্যতায় বিশ্বাস করেছিল, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার উপর আমল করেছিলে কি?[৩]

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ

'আর (হে রসূল!) আপনার পূর্বে আমি যে রসূলগণকে প্রেরণ করেছি তাদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি দয়াময় আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কোন প্রভূ স্থির করেছিলাম যার পূজা-অর্চনা করা যায়'?

আল্লাহ পাকের নিরঙ্কুশ তৌহীদের মহান শিক্ষা শুধু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই দেননি; বরং তাঁর পূর্বের সমস্ত নবী রসূলগণও এ মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন। নিজ নিজ জাতিকে তাঁরা শেরক বর্জন করার এবং তৌহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন। হযরত আদম

১ তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-৬৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৬৮
২. তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-৮৫
৩. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২১৫

(আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রসূল এ দায়িত্ব যত্নসহকারে পালন করেছেন। তাই আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনার পূর্বে যাদেরকে আমি নবী রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, অর্থাৎ তাদের কিতাব থেকে এবং তাদের শিক্ষা থেকে জানতে চেষ্টা করুন আমি কি করুণাময় আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন উপাস্যের পূজা-অর্চনা করার অনুমতি দিয়েছি?

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের একাধিক মত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে কাদেরকে জিজ্ঞাসা করার আদেশ দেয়া হয়েছে? নবী রসূলগণকে? নাকি তাঁদের উম্মতদেরকে? এ প্রশ্নের জবাবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, শবে মেরাজে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সমস্ত নবী রসূলগণকে বায়তুল মোকাদ্দাসে একত্রিত করা হয়, হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আযান এবং একামত দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নামাযের ইমামতি করার অনুরোধ করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন সমস্ত নবী রসূলগণের ইমাম হিসেবে নামায আদায় করেন। নামায শেষে জীব্রাঈল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম!

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا

আপনার পূর্বে যেসব নবী রসূলগণকে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেছেন, তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে, দয়াময় আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন উপাস্য স্থির করার অনুমতি কি দেয়া হয়েছে?

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ একথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই, আমার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট।

জুহরী, সাঈদ এবনে যোবায়ের এবং এবনে যায়েদও আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন যে, শবে মেরাজে আল্লাহ পাক সমস্ত নবীগণকে একত্রিত করেছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করার কথা বলা হয়। যেহেতু এ সম্পর্কে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না, সেজন্যে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা জরুরী মনে করেননি। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যদিও জিজ্ঞাসা করার কথা বলা হয়েছে, তবু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা নয়; বরং পূর্বকালে অবতীর্ণ কিতাব এবং সহীফা সমূহে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার কথা বলা হয়েছে।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে من ارسلنا এর পূর্বে امم শব্দটি উহ্য রয়েছে অর্থাৎ পূর্বকালের উম্মতের আলেমদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন।

মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ), যাহ্যাক (রঃ), সুদ্দী (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) এ মত পোষণ করেছেন।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, আলোচ্য আয়াতে নবী রসূলগণকে অথবা তাদের উম্মতীদেরকে যে প্রশ্ন করার কথা বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য কোন প্রকার সন্দেহ দূরীভূত করা নয়; বরং মক্কার মুশরেকদেরকে নিশ্চিতভাবে একথা জানিয়ে দেয়া যে, পৃথিবীতে যত নবী রসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে, সকলেই নিরঙ্কুশ তৌহীদের কথাই বলেছেন। তাঁরা একবাক্যে শেরককে বর্জন করার তাগিদ করেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যদিও আলোচ্য আয়াতে পূর্ববর্তী নবীগণকে জিজ্ঞাসা করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু এর উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করা নয়; কেননা নবী রসূলগণ বহু পূর্বেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, তবে কথাটির অর্থ হলো এই যে, আপনি বিষয়টি চিন্তা করুন।[১]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَاۡئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'আর নিশ্চয় আমি মূসাকে আমার নিদর্শন সহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, নিশ্চয় আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূল'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মক্কার কোরায়শদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতে বিশ্বাস না করার বর্ণনা রয়েছে। এর পাশাপাশি তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে আর ইতোপূর্বে মক্কার কাফেরদের একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাযিল করা জরুরীই মনে করে থাকেন তবে মক্কা এবং তায়েফের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকটই প্রেরণ করতে পারতেন! মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এতীম এবং সম্পদশালী নন, এতদসত্ত্বেও তাঁর নিকট পবিত্র কোরআন নাযিল করা হলো কেন?

এসব কথার প্রেক্ষিতেই হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গও হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্পর্কে এসব মন্তব্যই করেছিল যা মক্কার কোরায়শরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে করেছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, ফেরাউন ও তার রাজকীয় শক্তি হযরত মূসা (আঃ)-এর কোন ক্ষতি করতে পারেনি, এমনিভাবে মক্কাবাসী আপনার বিরোধিতা ও বিদ্রুপ করছে, কিন্তু তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবেনা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَاۡئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ

১. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২১৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৬৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৩৫

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি মূসাকে নিদর্শন সমূহ সহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। মূসা (আঃ) তাদের নিকট গিয়ে বললেন, আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত, কিন্তু দূরাত্মা ফেরাউন ও তার সঙ্গীরা তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখে বিদ্রুপ করতে থাকে।

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا

অর্থাৎ ফেরাউন এবং তার দলবল যেন সচেতন হয় এবং সত্যের দিকে ফিরে আসে, সে উদ্দেশ্যেই একের পর এক নিদর্শন তাদের সম্মখে পেশ করা হয় এবং প্রথম নিদর্শন থেকে দ্বিতীয় নিদর্শনটিকে বড় আকারে উপস্থাপন করা হয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রত্যেকটি মোজেযা প্রকাশিত হবার পর লোকেরা বলতো, 'পূর্বেরটির চেয়ে এটি অনেক বড়'। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফেরাউন ও তার দলবল হেদায়েত কবুল করেনি, তাই তারা আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার হয়েছে।

وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'আর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম আযাব দ্বারা, যেন তারা কুফরী ও নাফরমানী থেকে বিরত হয় এবং সত্যের দিকে ফিরে আসে'।

وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ

'আর ফেরাউনের দলের লোকেরা বলেছিল, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালক তোমাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি তুমি আমাদের জন্যে তোমার প্রতিপালককে ডাক। যদি তোমার দোয়ায় আমরা বিপদমুক্ত হই তবে নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব'।

আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউন, তার পারিষদবর্গ, কিবতী জাতি এবং বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেন, তাঁকে আল্লাহ পাক মোজেযা দান করেন, তাঁর হাতের লাঠিটি বিরাট ভয়ংকর অজগরে পরিণত হয়ে যেত। কিন্তু ফেরাউন ও তার দলবল তাঁকে মানল না, তাঁকে বিদ্রুপ করলো, পরিণামে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের আযাব নেমে আসল, যেমন ঝড়-তুফান, টর্নেডো, কখনো পঙ্গপালের আক্রমণ তাদের ক্ষেত-খামার ধ্বংস করে দিত, আর কখনো তারা খাবার নিয়ে বসলে তাতে ব্যাঙ এসে বসে থাকত, তখন তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট আবেদন-নিবেদন করতো যে, আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করুন, যেন আমাদের বিপদ দূরীভূত হয়, তাহলে আমরা আপনার হেদায়েত মেনে চলবো। হযরত মূসা (আঃ) তাদের জন্যে দোয়া করতেন, তাদের বিপদ দূর হতো, কিন্তু এরপরই তারা পুনরায় অবাধ্য হতো, পরিণামে আবার তাদের প্রতি আযাব আসত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক একথাই বলেছেন যে, যখনই তারা বিপদে পড়ত, তখন তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট হাযির হতো এবং আল্লাহ পাকের দরবারে বিপদ-মুক্তির লক্ষ্যে তাঁকে দোয়া করার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতো এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনবে বলে অঙ্গীকার করতো।

প্রকৃতপক্ষে তাদের ঈমান আনয়নের কোন ইচ্ছা ছিলনা, শুধু বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্যেই তারা একথা বলতো। পরবর্তী আয়াতেই রয়েছে একথার প্রমাণ।

আলোচ্য আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-কে يَٰٓأَيُّهَ السَّاحِرُ (হে যাদুকর!) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

১. কাফেররা হযরত মূসা (আঃ)-কে অত্যন্ত বড় যাদুকর মনে করতো, নবী রসূল মনে করতো না এজন্যে তারা তাঁকে হে যাদুকর! বলে সম্বোধন করেছে।

২. অথবা এর অর্থ হলো, কাফেররা বলেছে, হে সেই ব্যক্তি! যে যাদুর জোরে আমাদেরকে কাবু করেছ, দয়া করে তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের পক্ষে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদের বিপদ দূরীভূত করে দেন।

৩. আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, সে যুগে যাদু বিদ্যার বিরাট মর্যাদা ছিল, তাই তারা "হে যাদুকর!" বলে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি তাদের আন্তরিক মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়েছে এবং এভাবে তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ায় বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করেছে। তারা একথাও বলেছে, আমরা যদি আপনার দোয়ার বরকতে বিপদমুক্ত হতে পারি তবে ঈমান আনব।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ
فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ
تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ
مَهِينٌ ۖ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ
أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

তরজমা

(৫০) এরপর যখন আমি তাদের বিপদ দূরীভূত করলাম, তখনই তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো।

(৫১) আর ফেরাউন তার জাতিকে সম্বোধন করে বললো, হে আমার জাতি! মিশর সাম্রাজ্য কি আমার নয়? আর এ ঝর্ণামালা যা আমার প্রাসাদের তলদেশে প্রবাহিত তা কি তোমরা লক্ষ্য করনা?

(৫২) আমি তো শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে যার কোন মর্যাদা নেই। যে স্পষ্টভাবে কথা বলতেও অক্ষম।

(৫৩) জিজ্ঞাসা করি, মূসাকে কেন দেয়া হলোনা স্বর্ণের বালা অথবা তার সঙ্গে কেন আসল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে।

(৫৪) এভাবে ফেরাউন তার জাতিকে হতবুদ্ধি করে দিল, ফলে তারা ফেরাউনের কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল নাফরমান।

(৫৫) এরপর তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করলো, আমিও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করি এবং তাদের সকলকে নিমজ্জিত করি।

(৫৬) এরপর আমি পরবর্তী লোকদের জন্যে তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাসের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, ফেরাউনের জাতির লোকেরা যখন কোপগ্রস্ত হলো তখন হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট এসে আবেদন করলো যে, আপনার প্রতিপালকের দরবারে দোয়া করুন, যেন আমাদের বিপদ দূরীভূত হয়। হযরত মূসা (আঃ) তাদের পক্ষে দোয়া করলেন, ফলে আল্লাহ পাক তাদের বিপদ দূরীভূত করে দিলেন। কিন্তু এ অবাধ্য জাতি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনল না, আলোচ্য আয়াতে একথাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ

এরপর যখন আমি তাদের বিপদ দূরীভূত করলাম তখন তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো। যদিও তারা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে এ অঙ্গীকার করেছিল যে, যদি তারা বিপদমুক্ত হয় তবে তারা আল্লাহ পাকের প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে।

মূলতঃ তাদের অন্তরে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আদৌ ভক্তি বিশ্বাস ছিলনা, সত্যকে গ্রহণ করার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা তাদের ছিলনা। শুধু বিপদ-মুক্তির লক্ষ্যেই তারা ঈমান আনয়নের কথা বলেছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ায় যখন আল্লাহ পাক তাদের বিপদ দূর করে দিলেন, তখনও তারা কাফেরই রয়ে গেল, কৃত অঙ্গীকারের কথা

তারা ভুলে গেল, তাদের অবস্থানে কোন পরিবর্তন হলোনা, তারা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই থেকে গেল। এভাবে একাধিকবার তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো, হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ায় বিপদ কেটে গেলেই পুনরায় তাঁর বিরোধিতা করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হলো এমনকি, ফেরাউন প্রকাশ্যে তার জাতিকে সম্বোধন করে হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করলো, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ وَّ لَا يَكَادُ يُبِيْنُ.

'আর ফেরাউন তার জাতিকে সম্বোধন করে বললো, হে আমার জাতি! মিশর সাম্রাজ্য কি আমার নয়? আর এ ঝর্ণামালা যা আমার প্রাসাদের তলদেশে প্রবাহিত, তা কি তোমরা লক্ষ্য করনা? আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি থেকে যার কোন মর্যাদা নেই, যে স্পষ্টভাবে কথা বলতেও পারেনা'।

সে যুগে মিশরের সাম্রাজ্য ছিল অতুলনীয়, তাই মিশর সম্রাট তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে বিবেচিত হতো। আর এ কারণেই ফেরাউনের দম্ভের অন্ত ছিলনা, ফেরাউন ভীত হলো এই ভেবে যে, মূসা (আঃ)-এর দোয়ায় যখন মানুষের বিপদ কেটে যায়, এমন অবস্থায় হয়তো লোকেরা ঈমান আনবে, এজন্যে ফেরাউন তার জাতিকে সম্বোধন করে বললো, হে আমার জাতি! মিশরের এ বিরাট সাম্রাজ্য ও তার বিপুল ঐশ্বর্য এবং দেশের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কি আমার হাতে নেই? এমন অবস্থায় অন্য কারোর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষতঃ মূসা (আঃ)-এর ন্যায় ব্যক্তি যার কোন সামাজিক মর্যাদা নেই, ধন-সম্পদও নেই এবং সে স্পষ্টভাবে স্বীয় বক্তব্যও পেশ করতে পারেনা। অতএব, আমার বিরোধিতা করার কোন অধিকার তার নেই, এরপর সে কোনো যুক্তিতে আমার বিরোধিতা করে? ফেরাউন আরো বলে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَلَوْلَآ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ

'জিজ্ঞাসা করি, মূসাকে কেন দেয়া হলোনা স্বর্ণের বালা, অথবা তার সঙ্গে কেন আসলো না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে'।

বর্ণিত আছে যে, ফেরাউন তার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য প্রকাশার্থে নিজেই স্বর্ণের বালা পরিধান করতো এবং যার প্রতি সে সন্তুষ্ট থাকতো তাকে স্বর্ণের বালা উপহার দিত। তাই ফেরাউন বললো, মূসা যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহ পাকের প্রেরিত ব্যক্তি হন, তবে তাঁর রাজকীয় কোন সম্মান বা মর্যাদা তো পরিলক্ষিত হয়না, যদি মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের প্রেরিত ব্যক্তি হতেন, তবে আল্লাহ পাক তাকে স্বর্ণের বালা দেননি কেন? আমি যেমন আমার প্রিয়জনদেরকে স্বর্ণের বালা উপহার দেই, ঠিক তেমনি মূসা (আঃ)-এর প্রতিপালক তাঁকেও স্বর্ণের বালা দিতে পারতেন। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে

মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ফেরেশতাদের বিরাট দল একত্রিত করে প্রেরণ করতে পারতেন তা-ও তো করা হয়নি।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

'এভাবে ফেরাউন তার জাতিকে হতবুদ্ধি করে দিল। তাই তারা ফেরাউনের কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল এক নাফরমান জাতি'।

ফেরাউন তার জাতিকে হতবুদ্ধি করার কারণে সত্য উপলব্ধিতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। মূলতঃ তারা ছিলই এক অবাধ্য জাতি যে কারণে তারা সত্য গ্রহণে অপ্রস্তুত হয়, সত্যের আহ্বানে সাড়া দিতে তারা হয় অপারগ। কিন্তু আল্লাহ পাকের নাফরমানী যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে, আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণের সঙ্গে যখন অন্যায় আচরণ অব্যাহত থাকে তখন এমন একটা সময় আসে, যখন আল্লাহ পাকের গজব অবাধ্য জাতির উপর আপতিত হয়। ফেরাউনের জাতির জন্যে সে মুহূর্ত যখন ঘণিয়ে আসে, তখন তাদেরকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত হয়, পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর বিবরণঃ

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ○ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ

'এরপর তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করলো, আমিও তখন তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করি এবং তাদের সকলকে নিমজ্জিত করি, এরপর আমি পরবর্তী লোকদের জন্যে তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাসের এক জ্বলন্ত নিদর্শন'।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, মিশরবাসীর মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তারা যখন তাদের কোন নেতা নির্বাচন করতো, তখন তারা তাকে স্বর্ণের হার এবং বালা পরিধান করাতো। এজন্যে ফেরাউন নিজে তো এগুলো ব্যবহার করতোই অন্যদেরকেও তা উপহার দিত, তাই সে প্রশ্ন তুলেছে যে, আল্লাহ পাক যদি মূসা (আঃ)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করে থাকেন তবে তাকে কেন স্বর্ণের বালা দান করেননি? এসব ভিত্তিহীন কথা বলে ফেরাউন তার জাতিকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে, কেননা তারা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ জাতি। আর যেহেতু ফেরাউন ও তার দলবলের হেদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন তৌহীদের আহ্বান নিয়ে, কিন্তু তারা এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তাই আল্লাহ পাকের গজব তাদের উপর নেমে এসেছে, তাদেরকে আল্লাহ পাক লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেন।[১]

১. হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৩০৭ এবং খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৬১-১৩৪

وَلَمَّا ضُرِبَ
ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ
أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ
إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ
نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ
لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾
وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَ
لَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾

তরজমা

(৫৭) আর (হে রসূল!) যখন ঈসা এবনে মরয়মের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয় তখন আপনার জাতি চিৎকার করতে শুরু করে।

(৫৮) আর তারা বলে, আমাদের উপাস্যরা উত্তম না ঈসা? (হে রসূল!) আপনার সঙ্গে নিছক কলহ করার উদ্দেশ্যেই তারা একথা বলে। তারা আদতেই অত্যন্ত কলহ-প্রিয় জাতি।

(৫৯) ঈসা ছিল আমারই এক বন্দা, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি, আর বনী ইসরাঈলের জন্যে তাকে করেছি আমার বিস্ময়কর কুদরতের একটি দৃষ্টান্ত।

(৬০) আর আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য থেকেই ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারি, যারা তোমাদের স্থলে পৃথিবীতে বসবাস করবে।

(৬১) আর তিনি (ঈসা এবনে মরয়ম) নিশ্চয় কেয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের একটি নিদর্শন, অতএব তোমরা কেয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করোনা, আর শুধু আমার অনুসরণ কর, এটিই সরল সঠিক পথ।

(৬২) আর শয়তান যেন তোমাদেরকে কোনভাবেই বিরত রাখতে না পারে। নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।

(৬৩) আর ঈসা যখন মোজেযা সমূহ নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিকট জ্ঞান-গর্ভ বাণী নিয়ে এসেছি আর তোমরা যেসব বিষয়ে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত, তার কোনটি আমি স্পষ্ট করে বর্ণনা করবো। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, আর আমার কথা মেনে চল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইতোপূর্বে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষার মূল কথা ছিল তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস। সমস্ত নবী রসূলগণই তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস আনয়নের আহ্বান জানিয়েছেন যুগে যুগে। এমনিভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন সমগ্র বিশ্ববাসীকে। এ ব্যাপারে মক্কার কাফেরদের আপত্তি করার অথবা তাদের গাত্রদাহের কোন কারণই ছিলনা, কিন্তু এতদসত্ত্বেও একটি শত্রুতামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করে তারা বলতো, খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূজা করে, অথচ (হযরত) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁকে আল্লাহর নবী বলে ঘোষণা করেছেন, আর একথাও তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

'তোমরা এবং তোমাদের পূজনীয় ঠাকুর দেবতারা সবই হবে দোযখের ইন্ধন'।

যদি একথাই সত্য হয় তবে যেহেতু খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূজা করে, তিনিও দোযখের ইন্ধন হবেন, এমন অবস্থায় আমাদের আর কী দুঃখ থাকতে পারে! এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ليس احد يعبد من دون الله فيه خير

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত যা কিছুর পূজা করা হয়, তাতে কোন কল্যাণ নেই। কাফেররা তখন বলে, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই, কেননা খৃষ্টানরা তাঁর পূজা করে।

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের এসব অবান্তর প্রশ্নেরই জবাব দেয়া হয়েছে; এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

'আর (হে রসূল!) যখন ঈসা এবনে মরয়মের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার জাতি চিৎকার করতে শুরু করে'।

আলোচ্য আয়াতের يصدون শব্দটির ব্যাখ্যায় ইমাম কেসায়ী (রঃ) বলেছেন, "তারা চিৎকার করে"।

সাঈদ এবনুল মুসায়্যেব (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করেন।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো "তারা বিস্ময় প্রকাশ করে"।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো "তারা অধৈর্য হয়ে ওঠে"।

কুরতবী (রঃ) বলেছেন, "তাদের মন আহত হয়"। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং একরামা (রঃ) বলেছেন, "তারা বিস্ময় প্রকাশ করে"।

ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো "তারা বিমুখ হয়"।

কাতাদা (রঃ) আরো বলেছেন, কাফেররা বলতো যেভাবে খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূজা করতো, ঠিক এমনিভাবে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) চান আমরা যেন তাঁকে উপাস্য মনে করি এবং তাঁর পূজা করি, কেননা তিনি আমাদের ঠাকুর-দেবতার পূজার সমালোচনা করে থাকেন (নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক)।

বস্তুতঃ যেভাবে কাফেররা হযরত ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, তা সম্পূর্ণ অমূলক এবং ভিত্তিহীন, কেননা হযরত ঈসা (আঃ) নিজেই শেরকের বিরুদ্ধে তবলীগ করেছেন, তিনি ছিলেন তৌহীদের আহবায়ক, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কেউ যদি তাঁকে উপাস্য মনে করে তাঁর পূজা করে, এজন্যে তাঁকে দায়ী করা যায়না আর এজন্যে তাঁর দৃষ্টান্তও পেশ করা যায়না। যাদের পূজা করা হয়, তারা যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করে, তাহলেই তারা হবে দোযখের ইন্ধন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই ছিলনা, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই দুষ্ট লোকেরা এমন অলীক, ভিত্তিহীন অন্যায় মন্তব্য করেছে।

وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ۭ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ۭ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ

'আর তারা বলে, আমাদের উপাস্যরা উত্তম, না ঈসা? (হে রসূল!) আপনার সঙ্গে নিছক কলহ করার উদ্দেশ্যেই তারা এমন কথা বলে। আদতেই তারা অত্যন্ত কলহ-প্রিয় জাতি'।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, মক্কার কাফেররা (হে রসূল!) আপনার সঙ্গে অহেতুক কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যেই এসব অবান্তর কথা বলে। বস্তুতঃ তারা আদতেই কলহ-প্রিয় জাতি, তারা সত্যকে শুধু যে গ্রহণ করেনা তাই নয়; বরং সত্যকে বুঝতেও চায়না, তারা নিষ্প্রাণ, জড় পদার্থ, পাথরের প্রতিমা তৈরী করে ও তার পূজা করে আনন্দিত হয়, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করছেন, যাঁর অসংখ্য নেয়ামত তারা অহরহ ভোগ করছে, তাঁকে তারা অস্বীকার করে এবং তাঁর প্রেরিত রসূলকে অমান্য করে।

مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا

(হে রসূল!) তারা শুধু ঝগড়াই করতে চায়, সত্য-অসত্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা উপলব্ধি করতে চায়না, এর কারণ হলো তাদের জেদ, হঠকারিতা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'কোন জাতি হেদায়েত লাভের পর পথভ্রষ্ট হয়না, কিন্তু পরস্পরের কলহ-দ্বন্দ্বের কারণে' অর্থাৎ কলহ-দ্বন্দ্ব এমন একটি নিন্দনীয় বিষয় যার কারণে হেদায়েত লাভের পরও মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এবনে এসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোরায়শ নেতাদের এক বৈঠকে তশরীফ এনেছিলেন। ওলীদ এবনে মগীরা এবং নজর এবনে হারেস সহ অন্যান্য কয়েকজন এতে উপস্থিত ছিল। তারা তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোরআনে করীমের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেনঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

(যার মর্ম হলো, তোমরা এবং তোমাদের পূজনীয় ঠাকুর-দেবতাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে) এরপর তিনি সেখান থেকে তশরীফ নিয়ে গেলেন। একটু পরই সেখানে আবদুল্লাহ এবনে যোবারী তমিমী এসে উপস্থিত হলো। তখন ওলীদ এবনে মগীরা বললো যে, নজর এবনে হারেস আবদুল মোত্তালেবের পৌত্রের নিকট হেরে গেল। অবশেষে আবদুল্লাহ এবনে যোবারী বললো, আমি যদি তখন থাকতাম তবে তাঁকেও লা-জবাব করে দিতাম। যদি আমরা ও আমাদের সকল পূজনীয় দেবতারা দোযখী হয়ে থাকি, তবে এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত ফেরেশতারাও দোযখী, কেননা আমরা ফেরেশতাদের পূজা করি। এমনিভাবে, ইহুদীরা হযরত ওজায়ের (আঃ)-এর পূজা করে, আর নাসারারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূজা করে, অতএব তাঁরাও দোযখী। একথা শ্রবণ করে বৈঠকে উপস্থিত সকলেই খুশি হলো এবং চিৎকার করতে লাগলো। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদের এ অবস্থারই বিবরণ দিয়েছেন।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ.

'আর যখন ঈসা এবনে মরয়মের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন (হে রসূল!) আপনার জাতি চিৎকার করতে শুরু করে'।

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আবদুল্লাহ এবনে যোবারীর এ উক্তি পৌঁছানো হয়, তখন তিনি এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো পূজা করে এবং সে ঐ পূজায় খুশী থাকে তবে ঐ পূজারী এবং পূজনীয় উভয়েই দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।[১]

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৩৭

ফেরেশতা এবং নবীগণ কখনো তাঁদের পূজা করার আদেশ দেননি, আর তাঁরা তাতে আদৌ সন্তুষ্ট নন, তাঁদের নামে পূজারীরা শয়তানের পূজা করে, আর ইবলিস শয়তানই তাঁদেরকে আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করতে প্ররোচনা দেয়। হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ওজায়ের (আঃ) প্রমুখ আল্লাহ পাকের অনুগত ছিলেন, শেরকের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং শেরক থেকে মানুষকে বিরতকারী ছিলেন, তাঁদের অনুপস্থিতিতে কাফেররা তাঁদেরকে উপাস্য মনে করেছে, আর মুশরেকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাকের কন্যা সন্তান মনে করে তাঁদের পূজা শুরু করেছে, অথচ আল্লাহ পাক সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, এসব দুর্বলতা থেকে তাঁর শান অনেক উর্দ্ধে। পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথা শুনে কাফেররা চিৎকার করতে থাকে, চিৎকার করে তারা যা বলে তা-ই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ

'আর তারা বলো আমাদের উপাস্য উত্তম, না সে জন (ঈসা আঃ)'?

কাফেররা তাদের উপাস্যদের সঙ্গে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ করে একটি ভিত্তিহীন কলহ তৈরীর চেষ্টা করেছে। তারা ভালভাবেই জানে যে, তাদের একথাটি সম্পূর্ণ অর্থহীন, এজন্যে আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ করেছেনঃ

مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا

এ কাফেররা শুধু কলহ-দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্যেই হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রসঙ্গটি তুলেছে, কেননা তারা ভালভাবেই জানে যে, তাঁরা যেসব মূর্তির পূজা করে তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। এর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ) বা ওজায়ের (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়নি। কেননা, তাঁরা ছিলেন নিরঙ্কুশ তৌহীদের আহবায়ক, তাঁদের সম্পর্কে এমন কথা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়।

অথবা এর অর্থ হলো, তারা ভালভাবেই জানে যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপাস্য হয়ে তাঁর পূজা করাতে আদৌ ইচ্ছুক নন, এটি তাদেরই সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা, সত্যের লেশমাত্রও এতে নেই। তবু শুধু কলহ দ্বন্দ্বের লক্ষ্যেই তারা এ পর্যায়ে এ নামের উল্লেখ করেছে।

بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ

বরং তারা হলো আদতেই ঝগড়াটে, তাদের এ ঝগড়া নতুন কিছু নয়; এমনকি তা সাময়িক ব্যাপারও নয়; বরং মক্কার কাফেরদের ঝগড়া তাদের মজ্জাগত।

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

ঈসা তো আমারই এক বন্দা, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি, আর বনী ইসরাঈলের জন্যে তাকে আমি দৃষ্টান্ত করে রেখেছি। তাদের জন্যে আমার বিস্ময়কর কুদরতের একটি নমুনা হিসেবে তাকে তৈরী করেছি, সে ছিল হেদায়েতের প্রতীক।

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ

ঈসা (আঃ) আমার বন্দা ব্যতীত আর কিছুই নয় অর্থাৎ সে আল্লাহর পুত্র নয়।

أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি অর্থাৎ তাকে নবুওয়্যত দান করেছি এবং আমার নৈকট্য-ধন্য করেছি।

وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ

আর আমি তাকে একজন বিস্ময়কর মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছি, বনী ইসরাঈলের জন্যে তাকে এক শিক্ষণীয় ঘটনার দৃষ্টান্ত রূপে পেশ করেছি, কেননা পিতা ব্যতীতও আল্লাহ পাক সৃষ্টি করতে পারেন তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত হলেন হযরত ঈসা (আঃ)। তাঁর দায়িত্ব ছিল মানুষকে শেরক থেকে বিরত রাখা।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈসা এবনে মরয়মের মধ্যে ফেরেশতা চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু সে বৈশিষ্ট্যের কারণে কোন অবস্থাতেই তাঁকে উপাস্য বানানোর কোন যুক্তি নেই, অথচ ফেরেশতাগণও আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلٰٓئِكَةً فِى الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

'আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তোমাদের মধ্য থেকেই ফেরেশতা সৃষ্টি করে দিতাম যারা তোমাদের স্থলে পৃথিবীতে অবস্থান করবে'।

একথার দু'টি অর্থ হতে পারে (১) মহান আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে মানব জাতির মধ্য থেকেই ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতেন। (২) অথবা এর অর্থ হতে পারে, যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে ফেরেশতাদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতাম, তারাই পৃথিবীর অধিবাসী হতো এবং সর্বক্ষণ তারা আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দেগী করতো।

অথবা এর অর্থ হলো, তারা পরস্পর পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হতো।

মোটকথা, ঈসা এবনে মরয়মের ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ঘটনা, কিন্তু আল্লাহ পাক তার চেয়ে অধিকতর বিস্ময়কর বিষয় সৃষ্টি করতে সক্ষম। ফেরেশতাগণ মানব জাতির ন্যায়ই আল্লাহ পাকের একটি সৃষ্টি, তাদেরকেও তোমাদের ন্যায় সৃষ্টি করা যেতে পারে। অতএব, কোন অবস্থাতেই তাদেরকে উপাস্য মনে করা এবং তাদের পূজা-অর্চনা করা সমীচিন নয়।

وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

'আর নিশ্চয় ঈসা কেয়ামতের আলামত, অতএব তোমরা কেয়ামত সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ করোনা, আর আমার কথা মেনে চল, এটিই সরল সঠিক পথ'।

অর্থাৎ যেভাবে ইতোপূর্বে ঈসা (আঃ)-এর জন্ম একটি বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল, কেননা আল্লাহ পাক তাঁকে পিতা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছিলেন, আর তিনি অনেক বিস্ময়কর মোজেযাও প্রদর্শন করে গেছেন, এমনিভাবে তিনি পুনরায় যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন তা শুধু বিস্ময়কর ব্যাপারই হবে না, বরং তা হবে কেয়ামতের আলামত। দ্বিতীয়বার যখন তাঁর আবির্ভাব হবে, তখন মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, কেয়ামত আসন্ন, অতএব কেয়ামত সম্পর্কে তোমরা কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করোনা, আর আমার অনুসরণ করতে থাক, এটিই সরল সঠিক পথ।

কেয়ামতের আলামত

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সে সময় তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন মরয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদেরই মধ্য থেকে হবে।

(বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

হযরত হোয়ায়ফা এবনে ওসায়েদ গাফফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা কিছু লোক কথাবার্তা বলছিলাম, এমন সময় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি বিষয়ে কথা বলছিলে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, আমরা কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি এরশাদ করেন, কেয়ামতের পূর্বে যতক্ষণ দশটি আলামত দেখা না যাবে ততক্ষণ কেয়ামত আসবেনা। এরপর তিনি দশটি আলামতের উল্লেখ করেছেন এভাবেঃ (১) ধোঁয়া (২) দজ্জাল (৩) দাব্বাতুল আরদ (৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (৫) ঈসা এবনে মরয়মের অবতরণ (৬) ইয়াজুয মাজুযের বের হওয়া (৭) তিনটি স্থানে জমীন ধ্বসে যাওয়া-প্রাচ্যে (৮) প্রতীচ্যে (৯) আরব ব-দ্বীপে (১০) ইয়ামন থেকে একটি অগ্নি বের হওয়া যা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, দশম আলামত এমন একটি প্রবল বায়ু যা মানুষকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।[১] (মুসলিম শরীফ)

হযরত নওয়াস এবনে সামআন (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দজ্জাল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ পাক (ঐ সময়ে) মসীহ এবনে মরয়মকে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশকের পূর্ব দিকের সাদা মিনারায় অবতরণ করবেন। দু'টি হলুদ বর্ণের কাপড়ে আবৃত থাকবেন, তিনি দু'জন ফেরেশতার ডানায় বসে অবতরণ করবেন, যখন মাথা নীচের দিকে ঝুকাবেন তখন রৌপ্যের মুক্তার ন্যায় তাঁর ঘাম ফোটা ফোটা করে পড়বে। আর যখন মাথা উত্তোলন করবেন, তখন মুক্তা ঝরবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ সেই মহান পবিত্র সত্তার! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! অদূর

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা. ৩৭৬

ভবিষ্যতে তোমাদের মাঝে ঈসা এবনে মরয়ম ন্যায় বিচারক হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ধ্বংস করবেন এবং শুকরগুলোকে হত্যা করবেন, অমুসলিম কর তুলে দেবেন, অর্থ-সম্পদ প্রবাহিত করবেন, এমনকি কেউ আর তখন অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করবেনা, তখন একটি সেজদা সারা পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু থেকে উত্তম বিবেচিত হবে। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এবনে মরয়ম ন্যায় বিচারক হয়ে অবশ্যই অবতরণ করবেন, ক্রশ চিহ্নকে ধ্বংস করবেন, শুকরকে হত্যা করবেন, অমুসলিম কর বাতিল করবেন, উটগুলোকে অকার্যকর করে রাখবেন, পরস্পরের শত্রুতা দূরীভূত করে দেবেন, অর্থ-সম্পদ গ্রহণের জন্যে লোকদেরকে ডাক দিলে কেউ তা গ্রহণ করতে রাজী হবেনা। মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের আমীর ঈসা (আঃ)-কে বলবে আসুন, আমাদের নামাযের ইমামতি করুন, ঈসা (আঃ) এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য করে বলবেন, তোমাদের মধ্য থেকেই একে অন্যের ইমাম হবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত ঈসা (আঃ) এমন সময় বায়তুল মোকাদ্দাস যাবেন, যখন লোকেরা আছরের নামাযের মধ্যে থাকবে। ইমাম হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন আঁচ করতে পেরে পেছনে চলে আসবেন, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) তাকেই আগে বাড়িয়ে দেবেন এবং শরীয়তে মোহাম্মদীর নিয়ম মোতাবেক নামায পড়বেন। শুকরগুলোকে হত্যা করবেন, তিনি ক্রশ চিহ্নকে বিনষ্ট করে দেবেন এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপাসনালয়গুলোকে ধ্বংস করবেন। আর যারা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনবে, তাদের ব্যতীত অবশিষ্ট খৃষ্টানদেরকে হত্যা করবেন।

فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا

অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ নিঃসন্দেহে কেয়ামতের আলামত, অতএব তোমরা কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করোনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির অর্থ বলেছেন, "তোমরা কেয়ামতকে মিথ্যাজ্ঞান করোনা"।

وَاتَّبِعُوْنِ

আর তোমরা আমার কথা মেনে চল, অর্থাৎ আমার হেদায়েত এবং আমার শরীয়তের বিধান মেনে চল, আমার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুকরণ কর। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ শব্দটির পূর্বে قل শব্দটি উহ্য রয়েছে তখন অর্থ হবে, (হে রসূল!) আপনি বলুন যে, তোমরা আমার অনুসরণ কর।

هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করাই হলো সরল সঠিক পথ, যেমন সূরা ইয়াসীনে রয়েছেঃ

وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

'আর তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর, এটিই সরল সঠিক পথ'।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, এটিই সরল সঠিক পথ, তাই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ শয়তান যেন কোন অবস্থাতেই তোমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুৎ করতে না পারে, সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু, তোমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-কে তার কারণেই জান্নাত থেকে বের হতে হয়েছিল এবং দুনিয়ার এ বালা-মসবিতের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এখনো ইবলিস শয়তান তোমাদের পেছনে লেগে আছে, তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে, যেন তোমরা দ্বিতীয়বারও জান্নাতে প্রবেশ করতে না পার। অতএব, ইবলিস শয়তানের অনুগামী হয়োনা, তার প্ররোচনায় পড়ে সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়োনা।

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

'আর ঈসা যখন মোজেযা সমূহ নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিকট জ্ঞান-গর্ভ বাণী নিয়ে এসেছি, আর এজন্যেও এসেছি যে, তোমরা যেসব বিষয়ে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত, সেগুলোর কোন কোনটি সম্পর্কে আমি সুস্পষ্ট বর্ণনা করবো অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল'।

বনী ইসরাঈলের নিকট হযরত ঈসা (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মই ছিল একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ পাক তাঁকে অনেক মোজেযা দান করেছিলেন, যেমন মায়ের কোলে থেকেই তিনি বুদ্ধিমান মানুষের ন্যায় কথা বলেছিলেন। তিনি قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহর হুকুমে দাঁড়াও) বললে মৃত ব্যক্তি কবর থেকে বের হয়ে আসত। আল্লাহ পাক তাঁকে এমনি আরো বহু মোজেযা দিয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতের بِالْبَيِّنٰتِ শব্দটি দ্বারা ঐ মোজেযাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আর হযরত মূসা (আঃ)-এর পর ইহুদী জাতি ৭১ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তারা অনেক ভ্রান্ত মত ও পথের অনুসারী হয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) সেদিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেনঃ যেসব বিষয়ে তোমাদের কলহ-দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেগুলোর কোন কোনটিকে আমি সুস্পষ্টভাবে মীমাংসা করে দেব, অতএব তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ

পাককে ভয় করা এবং আমার কথা মেনে চলা, অর্থাৎ আমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাই তা তোমরা মেনে চল। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় পোষণ করা আখেরাতে নাজাতের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পন্থা, কেননা আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় পোষণের কারণে মানুষ আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে। আর আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীগণের অনুসরণ করলে মানুষ আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয় হতে পারে।[১]

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ
تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ
مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ
الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

১. আলোচ্য আয়াত সমূহের তফসীর সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৬, পৃষ্ঠা ৫৪-৭০

তরজমা

(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ পাকই আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক, অতএব শুধু তাঁরই এবাদত কর, আর এটিই সরল সঠিক পথ।

(৬৫) এরপর তাদের কিছু লোক মতানৈক্য সৃষ্টি করলো, তাই সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্যে কঠিন আযাবের দুর্ভোগ রয়েছে।

(৬৬) তারা কি তাদের অজ্ঞাতসারে অতর্কিতভাবে কেয়ামত উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে?

(৬৭) সকল বন্ধুই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে যারা পরহেযগার, তারা নয়।

(৬৮) হে আমার বন্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবেনা।

(৬৯) সে সমস্ত বন্দাগণ যারা আমার নিদর্শন সমূহতে ঈমান এনেছে এবং মুসলমান হয়েছে।

(৭০) তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনীগণ সসম্মানে বেহেশতে প্রবেশ কর।

(৭১) স্বর্ণের থালা এবং পান-পাত্র নিয়ে পরিচারকরা তাদের নিকট ঘোরাফেরা করবে এবং তাদের মন যা চায়, আর যাতে তাদের মন জুড়ায় সেসবই বেহেশতের মধ্যে রয়েছে, আর তাতেই তোমরা চিরদিন থাকবে।

(৭২) এটিই সেই বেহেশত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মফল স্বরূপ।

(৭৩) তোমাদের জন্যে এতে প্রচুর পরিমাণ ফলমূল রয়েছে, তোমরা তা থেকে আহার করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর জাতির নিকট আগমন করেন অনেক মোজেযা নিয়ে, তিনি মানুষকে বলেছিলেন, "তোমরা এক আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল"।

তৌহীদের ঘোষণা

আর এ আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) যে তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের ঘোষণা করেছিলেন, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, এক আল্লাহ পাকই আমার প্রতিপালক, আর তিনিই তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী কর, এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাকই আমার প্রতিপালক, আর তিনিই তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব তোমরা শুধু এক আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী কর, আর কারো নয়। এটিই সরল সঠিক পথ'।

তৌহীদের এ ঘোষণা দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) নিরঙ্কুশ তৌহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক যে সকলেরই পালনকর্তা, রিয্কদাতা, ভাগ্যনিয়ন্তা, তিনি যে এক, অদ্বিতীয়, এবাদতের একমাত্র যোগ্য- এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন হযরত ঈসা (আঃ)। তিনি একথাও ঘোষণা করে গেছেন যে, দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণ লাভের একমাত্র সরল সঠিক পথই হলো তৌহীদে বিশ্বাস। যারা এ পথ অবলম্বন করেনা, যারা কোনভাবে আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করার ধৃষ্টতা দেখায়, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে বা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে মনে করে অথবা ঠাকুর-দেবতার পূজা-অর্চনা করে তাদের কোন সৎ কাজই গ্রহণযোগ্য নয়, তাদের শাস্তি অবধারিত, তারা হবে কোপগ্রস্ত।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও বনী ইসরাঈল জাতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়, খৃষ্টানরা তাঁকে মানে কিন্তু ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে কষ্ট দিতে চায় এমনকি, তাঁকে হত্যা করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়, এজন্যে আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেন এবং ইহুদীদের ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেন, এরপর খৃষ্টানদের মধ্যে দলাদলির সূচনা হয়, তাদের কেউ হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মত প্রকাশ করে, তাদের আরেক দল ঈসা (আঃ)-কেই স্বয়ং খোদা মনে করে (নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক), এভাবে তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মহান শিক্ষাকে বিস্মৃত হয়, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট অবস্থায় বিভিন্ন দলে ও ফেরকায় বিভক্ত হয়। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ

'এরপর তাদের কিছু লোক মতানৈক্য সৃষ্টি করলো'।

পরবর্তী আয়াতাংশে তৌহীদ বিরোধী ফেরকাগুলোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

'তাই সীমালঙ্ঘনকারী এ জালেমদের জন্যে রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের দুর্ভোগ'।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইহুদীরা ৭১ ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে আর খৃষ্টানরা ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে, আর আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় ভাগ হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, এবনে মাজা)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে তবে তাতে আরো একটু কথা সংযোজিত হয়েছে তা হলো, আমার উম্মতের ৭৩ ফেরকার মধ্যে এক ফেরকা ব্যতীত আর সবই দোযখে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন,

ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! নাজাত প্রাপ্ত দল কোন্‌টি হবে? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যে পথে আমি রয়েছি এবং আমার সাহাবাগণ রয়েছে, সে পথে যারা চলবে তারাই নাজাত পাবে।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

'তারা কি তাদের অজ্ঞাতসারে অতর্কিতভাবে কেয়ামত উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে'?

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করেছিলেন তৌহীদের আহবায়ক রূপে, তিনি যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন মানুষকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। কেয়ামতের পূর্বে যখন তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখনও তিনি মানুষকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করবেন। তাঁর আহ্বানে কোন অস্পষ্টতা ছিলনা, কিন্তু এতদসত্ত্বেও বনী ইসরাঈল এ পর্যায়ে মতবিরোধ করে এবং তৌহীদ বিরোধী মতবাদ গ্রহণ করে। তাদের কর্তব্য ছিল আল্লাহ পাককে ভয় করা, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করা, সত্যদ্রোহীতা পরিহার করা, তাই আলোচ্য আয়াতে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছেঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ

'তবে কি তারা কেয়ামতের প্রতীক্ষা করছে'?

অর্থাৎ তারা কি তবে কেয়ামতের সেই চরম মুহূর্তটির অপেক্ষায় রয়েছে যা অত্যন্ত অতর্কিতভাবে তাদের প্রতি আক্রমণ করবে, যার সামান্য আগেও তারা এর কোন আভাস পাবেনা। যখন কেয়ামতের সেই কঠিন মুহূর্ত আসবে, তখনই কি তারা ঈমান আনবে? অথচ তখন ঈমানের কোন মূল্যই হবেনা, তখনকার ঈমান কারো জন্যেই উপকারী হবেনা। আর সে মুহূর্ত এত কঠিন হবে যে, কোন বন্ধু-বান্ধব বা কোন প্রিয়জন, আপনজনও সেদিন কোনভাবেই সাহায্যকারী হবেনা; বরং বন্ধু সেদিন শত্রু হয়ে পড়বে। পরবর্তী আয়াতে তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ

'সকল বন্ধুই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে যারা পরহেযগার, তারা নয়'।

পরস্পরের বন্ধুত্ব উপকারী হওয়ার পূর্বশর্ত

যারা আল্লাহ পাকের মহব্বতের কারণে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসা রাখবে, তারা একে অন্যের পরিচয় দেবে। এতদ্ব্যতীত, কোন প্রকার বন্ধুত্বই সেদিন কোন কাজে আসবেনা। একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দু'জন ঈমানদার বন্ধু, আর দু'জন কাফের বন্ধু, যখন মোমেন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইন্তেকাল হলো এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া

হলো, তখন সে তার বন্ধুকে স্মরণ করে আরজ করলো, হে পরওয়ারদেগার! আমার অমুক বন্ধু আমাকে তোমার বন্দেগীর জন্যে এবং তোমার প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের জন্যে আদেশ করতো এবং আমাকে কল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধ করতো ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখতো, আর আমাকে একথা বলতো, একদিন আমাকে তোমার মহান দরবারে হাযির হতেই হবে। হে আল্লাহ! আমার সে মোমেন বন্ধুকে আমার পর গোমরাহী থেকে রক্ষা করো এবং আমাকে যে নেয়ামত সমূহ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে তা তাকেও দেখিয়ে দিও। আর তুমি আমার প্রতি যেমন সন্তুষ্ট হয়েছ, তেমনি তার প্রতিও সন্তুষ্ট হয়ো। তাকে তখন বলা হবে, তুমি যেমন তোমার বন্ধুও যদি তেমনই হয় তবে তার জন্যেও এ নেয়ামত সমূহ রয়েছে। পরে যখন ঐ বন্ধুর ইন্তেকাল হবে, তাদের উভয়ের রূহকে একত্রিত করা হবে, তখন তারা একে অন্যকে বলবে, তুমি আমার কত ভাল বন্ধু ছিলে! পক্ষান্তরে, কাফের বন্ধুদের যখন একজনের মৃত্যু হলো, তখন তাকে দোযখের খবর দেয়া হয়, তখন সে বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমার অমুক বন্ধু আমাকে তোমার নাফরমানীর এবং তোমার রসূলের বিরোধী হওয়ার আদেশ দিত, কল্যাণকর কাজ থেকে আমাকে বিরত রাখত, মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করতো, আর একথা বলতো যে, কখনো তোমার দরবারে আমাকে হাযির হতে হবেনা। হে পরওয়ারদেগার! তাকে তুমি হেদায়েত থেকে মাহরুম কর আর তাকে এমন আযাব দাও যা আমাকে দিয়েছো। এভাবে সে তার বন্ধুর উপর লা'নত দিতে থাকবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি দু' ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মহব্বত থাকে, তবে তাদের একজন যদি প্রাচ্যে থাকে, আর অন্যজন যদি প্রতীচ্যেও থাকে তাদের উভয়কে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন।[১]

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ঘোষণা করবেন আমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্মের ভিত্তিতে যারা দুনিয়াতে বন্ধুত্ব করেছিল, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় স্থান দেব, আমার ছায়া ব্যতীত আজ কোন ছায়া নেই।

(মুসলিম শরীফ)

এবনে মরদবিয়া হযরত সাদ এবনে মুআজ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আত্মীয়তার সকল বন্ধন বিনষ্ট হয়ে যাবে, শুধু আল্লাহ পাকের মহব্বতের ভিত্তিতে যে বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা অব্যাহত থাকবে, এতদ্ব্যতীত সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে।[২]

---

১. তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৮৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৪১-৪২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৮০

২. তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩-২৪

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ

'হে আমার বন্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবেনা'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, মোতামের এবনে সোলায়মান তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমি শুনেছি, মানুষকে যখন কবর থেকে ওঠানো হবে তখন সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকবে, সে মুহূর্তে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, "হে আমার বন্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং আজ তোমরা চিন্তিতও হবেনা"। এতে সকলেই খুশী হবে, কিন্তু অনতিবিলম্বে ঘোষক পুনরায় ঘোষণা করবে,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

'যারা আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি ঈমান এনেছে এবং প্রকৃত মুসলমান হয়ে জীবন-যাপন করেছে'।

একথা শ্রবণ করে শুধু খাঁটি মোমেনগণ নিশ্চিন্ত হবে, আর অন্যরা নিরাশ হয়ে পড়বে।

যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং সমগ্র জীবন আল্লাহ পাকের অনুগত বন্দা হিসেবে অতিবাহিত করেছে, তাদের উদ্দেশ্যেই এ অভয়বাণী ঘোষণা করা হবে।

এখানে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, কোরআনে করীমে عباد শব্দটি শুধু নেককার পরহেযগার লোকদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। আর যখন আল্লাহ পাক يٰعباد বলে ডাক দেন তখন এর অর্থ হয় করুণাময় আল্লাহ পাক কোন মাধ্যম ব্যতীত তাঁর নেককার বন্দাদের সঙ্গে কথা বলবেন, এর চেয়ে বড় খুশির বিষয় আর কী হতে পারে! (২) আল্লাহ পাক يٰعباد বলে তাঁর প্রিয় বন্দাদেরকে তাঁর বন্দেগীর গুণে গুণান্বিত বলে ঘোষণা করছেন, এটি অত্যন্ত বড় উচ্চ মর্যাদা, যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যখন আল্লাহ পাক শবে মেরাজে সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য করে তাঁর মহান দরবারে হাযির করেছিলেন, আর এ ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে সূরা বণী ইসরাঈলের শুরুতে এভাবেঃ

سُبْحَانَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে عبد বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা পরিপূর্ণ, খাঁটি, কামেল বন্দা একমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই আর আল্লাহ পাকের বন্দা হওয়া সর্বাধিক গৌরবের বিষয়।

আলোচ্য আয়াতে "عباد" বলে ঈমানদার ও নেককার বন্দাদেরকে সে গৌরবে গৌরবান্বিত করা হয়েছে।

لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ বলে কেয়ামতের দিন ঈমানদার ও নেককারদের কোন ভয় নেই, একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত বড় নেয়ামত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ আর তোমরা চিন্তিত ও দুঃখিত হবেনা, অর্থাৎ দুনিয়ার আপনজন, অর্থ-সম্পদ এসব কিছু হারানোর কোন দুঃখ থাকবেনা, কেননা ঈমানদার ও নেককার বন্দাকে আল্লাহ পাক এমন নেয়ামত দান করবেন যা বর্ণনাতীত এমনকি, কল্পনাতীত। অতএব আয়াতের মর্মকথা হলো, কেয়ামতের কঠিন দিনে ঈমানদার ও নেককার বন্দাদেরকে সু-সংবাদ দেয়া হবে।

প্রথমতঃ অভয় দান করে নিশ্চিন্ত করা হবে, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকের এত নেয়ামত ঈমানদার ও নেককার বন্দাকে দান করা হবে যা পৃথিবীতে কেউ দেখেনি, শ্রবণও করেনি এমনকি কল্পনাও করেনি।[১]

পরবর্তী আয়াতে সে নেয়ামত সমূহের কিছুটা উল্লেখ রয়েছেঃ

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ ۚ وَ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَ اَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

'স্বর্ণের থালা এবং পান-পাত্র নিয়ে পরিচারকরা তাদের নিকট ঘোরাফেরা করবে এবং তাদের মন যা চায়, আর যাতে তাদের মন জুড়ায় সেসবই বেহেশতের মধ্যে রয়েছে, আর তোমরা তাতেই চিরদিন থাকবে'।

অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের জান্নাতে তাদের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, আনন্দ-উল্লাসের যাবতীয় ব্যবস্থা থাকবে, তাতে রকমারী খাবার এবং বিভিন্ন স্বাদ ও বর্ণের ফলমূল থাকবে, স্বর্ণের তৈজষপত্রে খাবার ও পানীয় নিয়ে জান্নাতের পরিচারকরা তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে, তাদের মন যা চাইবে তাই তারা পেয়ে যাবে, এমন মন-ভুলানো, নয়ন জুড়ানো নেয়ামত সমূহ সেখানে তারা লাভ করবে যা পৃথিবীতে সম্পূর্ণ কল্পনাতীত, আর ঈমানদার ও নেককার লোকেরা যাবতীয় সুখ ও শান্তির কেন্দ্র জান্নাতেই চিরদিন থাকবে।

জান্নাতে প্রত্যেককে তার কাঙ্ক্ষিত নেয়ামতই দান করা হবে, সুফী সাধকগণ যাঁরা সারা জীবন আল্লাহ পাকের প্রেমে মুগ্ধ-মত্ত-মাতোয়ারা হয়ে অতিবাহিত করেন, তাঁরা মহান আল্লাহ পাকের দীদার ব্যতীত অন্য কোন নেয়ামতেই পূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ করবেন না। এমন ভক্ত-প্রেমিকের জন্যে সে ব্যবস্থাই করা হবে, যেমন হযরত গওসুল আজম (রঃ) বলেছেনঃ

১. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২২৫

نہ خواہم خوبیٔ دنیا نہ خوا ہم راحت عقبیٰ ❖ اگر خواہم ترا خواہم نہ خواہم باغ رضواں را

'আমি দুনিয়ার কোন সৌন্দর্য ও সম্পদ চাইনা, আমি আখেরাতের কোন নেয়ামতও চাইনা, যদি কিছু চাই হে আল্লাহ! শুধু তোমাকেই চাই, জান্নাতের গুলবাগও আমি চাইনা'।

توجنت رابنیکان دہ من وبدرابدوزخ بر ✪ مرا آنجا بس کہ تمنائے وصال توست

'হে আল্লাহ! তোমার নেককার বন্দাদেরকে তুমি জান্নাত দিয়ে দিও, আমার ন্যায় গুনাহগারকে দোযখেই ফেলে দিও। আমার জন্যে সে স্থানটিই যথেষ্ট যেখান থেকে তোমার মিলনের আকাঙ্ক্ষা করা যেতে পারে'।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যখন হযরত এবনুল ফারেজ (রঃ)-কে জান্নাতের কিছু দৃশ্য দেখানো হয়েছিল, তখন তিনি চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন–

ان کانت منزلتی فی الحب عندکم ✪ لعمری فقد ضیعت عمری

"যদি তোমার প্রেমে সারাটি জীবন অতিবাহিত করার বিনিময় শুধু এ জান্নাতই হয়, তবে আমি আমার জীবনের শপথ করে বলছি যে, আমার জীবন-সাধনা ব্যর্থ হয়েছে।" এরপর তাঁকে আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লী দেখানো হলো এবং তিনি হাসিমুখে এ নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) বলেছিলেন, যদি কেয়ামতের দিন কোন প্রকার আরজী পেশ করার অনুমতি থাকে তবে আমি এ আরজী পেশ করবোঃ হে আল্লাহ! জান্নাতের ইমারতের আমার প্রয়োজন নেই, দুনিয়াতে তোমাকে না দেখে সেজদা করেছি, এখন তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে সেজদা করার অনুমতি দাও, আমার জন্যে এ নেয়ামতই যথেষ্ট।

হযরত শাহ ফজলে রহমান গঞ্জে মুরাদারাদী (রঃ) বলেছেন, বেহেশতে যখন হুরীরা আমার সেবা-যত্নের জন্যে হাযির হবে তখন আমি বলবো, আমার জন্য কোন সেবার প্রয়োজন নেই, তোমরা শুধু আমাকে আমার আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কোরআন শোনাও।

এ কয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, জান্নাতবাসীদের বিভিন্ন প্রকার চাহিদা থাকবে, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ

(আর তাদের মন যা চায় বেহেশতের মধ্যে তারা তাই পাবে।)

হাদীস শরীফেও একথার দৃষ্টান্ত রয়েছেঃ আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুর রহমান এবনে সাবেত (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি অশ্ব অত্যন্ত পছন্দ করি,

জান্নাতে অশ্ব পাওয়া যাবে? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যদি আল্লাহ পাক তোমাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দান করেন, আর তখন যদি তোমার ইচ্ছা হয় যে, লাল ইয়াকুত পাথরের তৈরী অশ্বে আরোহণ করবে, তবে তুমি তাই করতে পারবে।

একজন বেদুঈন আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! উষ্ট্র আমার বড় পছন্দ, জান্নাতে কি উষ্ট্র পাওয়া যাবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি আল্লাহ পাক তোমাকে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দান করেন, তবে তুমি যা চাইবে সেখানে তাই পাবে।[১]

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'এটি সেই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মফলস্বরূপ'।

অর্থাৎ যে জান্নাতের বিবরণ দেয়া হলো, তা তোমাদের নেক আমলের বিনিময়ে দান করা হবে, নিঃসন্দেহে জান্নাত আল্লাহ পাকের দান, তবে এ দান লাভের জন্যে ঈমান ও নেক আমল পূর্বশর্ত।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সবচেয়ে নিম্নস্তরের জান্নাতী, যে সকলের শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে যখন জান্নাতের দিকে তাকাবে তখন সে দেখবে, একশ বছরের পথ পর্যন্ত স্বর্ণ নির্মিত মহলগুলো তার জন্যেই তৈরী হয়ে আছে এবং তার মধ্যে অনেক রকমারী আসবাবপত্র বর্তমান রয়েছে। সকাল সন্ধ্যায় ৭০ হাজার তৈজষপত্রে সুস্বাদু খাবার তার সম্মুখে রাখা হবে। যার প্রত্যেকটি তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু হবে। সে লক্ষ্য করবে, যদি সারা বিশ্ববাসীকে সে দাওয়াত করে, তবু ঐ খাবার সকলের জন্যে যথেষ্ট হবে, এতটুকুও কম হবেনা (আবদুর রাজ্জাক)

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জান্নাত সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ কোন জান্নাতী ব্যক্তি খাবারের একটি লোকমা উঠাবে, তখন তার মনে আসবে অমুক প্রকার খাবার হলে ভাল হতো, তখন ঐ লোকমাটি তার মুখের অভ্যন্তরে সে বস্তুই হয়ে যাবে, যার আকাঙ্খা সে করেছিলো। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

মসনদে আহমদে রয়েছে, প্রিযনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সবচেয়ে নিম্নস্তরের জান্নাতীর ইমারতের সাতটি তলা হবে, সে ষষ্ঠ তলাটিতে বাস করবে, তার উপর সপ্তম তলা থাকবে। তার ত্রিশজন খাদেম থাকবে, যারা সকাল সন্ধ্যায় তিনশত স্বর্ণের তৈজষপত্রে তার জন্যে খাদ্য বস্তু হাযির করবে। প্রত্যেকটি পাত্রেই অত্যন্ত বিস্ময়কর, অতীব সুস্বাদু খাবার থাকবে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার খাবারের আকাঙ্খা

১ . তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮১-৮২

বহাল থাকবে। এভাবে তিনশত স্বর্ণ নির্মিত গ্লাসে তার জন্যে পানীয় দ্রব্য থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহ! যদি তুমি অনুমতি দান কর, তবে আমি সমস্ত জান্নাতবাসীকে দাওয়াত করতে পারি। যদি সকলে এসে আমার এখানে খাবার গ্রহণ করে তবে তাতে এতটুকু কম হবেনা (আল হাদীস)।

আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে ঈমানদার ও নেককার বন্দাদেরকে এসব নেয়ামত দান করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত শুধু আমলের ভিত্তিতে জান্নাতে যেতে পারবেনা। অবশ্য নেক আমলের কারণে জান্নাতে মর্তবায় পার্থক্য হবে।[১]

এবনে আবি হাতেমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক দোযখীকে তার জান্নাতের স্থান দেখিয়ে দেয়া হবে (অর্থাৎ সে যদি নেককার মোমেন হতো তবে তাকে তা দেয়া হতো)। ঐ স্থান এজন্যে দেখানো হবে, যেন তার আক্ষেপ হয়, তখন সে বলবে, যদি আল্লাহ পাক আমাকে হেদায়েত করতেন, তবে আমিও পরহেযগারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। এমনিভাবে প্রত্যেক জান্নাতীকে তার দোযখের স্থান দেখিয়ে দেয়া হবে (অর্থাৎ যদি সে মোমেন না হতো, তবে দোযখের ঐ স্থানে সে থাকত)। আর এ স্থান এজন্যে দেখানো হবে, যেন সে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে। তখন ঐ জান্নাতী বলবে, যদি আল্লাহ পাক আমাকে হেদায়েত না করতেন তবে আমি হেদায়েত লাভ করতাম না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরেকখানি হাদীস রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওযাসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেকের একটি ঘর জান্নাতে রয়েছে আরেকটি ঘর দোযখে রয়েছে। কাফেরের জন্যে জান্নাতে যে ঘরটি রয়েছে, তারই উত্তরাধিকারী হবে মোমেন, আর আলোচ্য আয়াতে একথাটিই ঘোষণা করা হয়েছে যে, "এটিই সেই জান্নাত তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মফল স্বরূপ"।[২]

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ

'তোমাদের জন্যে এতে প্রচুর পরিমাণ ফলমূল রয়েছে, তোমরা তা থেকে আহার করবে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে জান্নাতীদের পানাহারের কথা বলা হয়েছে, আর এ আয়াতে তাদেরকে যে ফলমূল দেয়া হবে তার বিবরণ রয়েছে।

তেবরানী হযরত সওবান (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওযাসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতী ব্যক্তি যে ফলটি খাওয়ার জন্যে হাতে নেবে, তার স্থলে আল্লাহ পাক অনুরূপ আরেকটি ফল সৃষ্টি করবেন।

---

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৪২-৪৩
২. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৮২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৪৩
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৫

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) সিরিয়াতে ছিলেন। লোকেরা জান্নাতের আলোচনা করলো, তখন তিনি বললেন, জান্নাতের ফলের একটি খোসা এত বড় হবে যে, তা সিরিয়া থাকে ইয়ামনের সানআ শহরের দূরত্বের সমান হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জান্নাতের ফল সমূহের দৈর্ঘ বার হাত হবে আর তার ভেতর দানা থাকবেনা।[১]

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾
لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ
لَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا
رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

তরজমা

(৭৪) নিশ্চয় পাপীষ্ঠরা দোযখের আযাবের মধ্যে চিরকাল থাকবে।

(৭৫) তাদের শাস্তি কিছুমাত্রও লাঘব করা হবেনা এবং তারা দোযখে নিরাশ হয়ে পড়বে।

(৭৬) আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল জালেম।

(৭৭) আর তারা (মালেক নামক ফেরেশতাকে) ডেকে ডেকে বলবে; হে মালেক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ করে দেন। মালেক বলবে, তোমাদেরকে চিরকাল এ অবস্থায়ই থাকতে হবে।

(৭৮) আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, আমি তো তোমাদের নিকট সত্য-জীবন বিধান পৌঁছিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপ্রিয় মনে করেছিল।

(৭৯) তবে কি তারা কোন বিষয় স্থির করে রেখেছে? নিশ্চয় আমিও এক ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি।

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৮৩

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মোমেনদের শুভ-পরিণতির সুসংবাদ রয়েছে। আর এ আয়াত থেকে কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের مجرمين শব্দ দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা মোমেনদের মোকাবেলায় এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এর দ্বারা কাফেরদেরকেই বোঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নেককার মোমেনদের জন্যে বেহেস্তের অফুরন্ত নেয়ামতের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি কাফের মুশরেকদের কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে, আর এটিই পবিত্র কোরআনের চিরাচরিত নিয়ম, কেননা

الايمان بين الخوف والرجاء

'ঈমান হলো আশা এবং ভয়ের মাঝখানে'।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের শাস্তির যে ঘোষণা রয়েছে তার তিনটি দিক রয়েছেঃ

১. কাফেররা চিরকাল দোযখে থাকবে।

২. এ শাস্তি কখনও লাঘব করা হবেনা, ক্ষণিকের জন্যেও তা মুলতবী হবেনা।

৩. কাফেরদের ঐ আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোন আশাও থাকবেনা, এমনকি তাদের মৃত্যুও হবেনা, যাতে তারা মৃত্যুর মাধ্যমে ঐ কঠিন শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ

'নিশ্চয় পাপীষ্ঠরা দোযখের আযাবের মধ্যে চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি কিছুমাত্র লাঘব করা হবেনা। আর তারা দোযখে নিরাশ হয়ে পড়বে'।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ

'আর আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই ছিল জালেম'। তাদের নিকট আল্লাহ পাক রসূল প্রেরণ করেছেন, আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন, তাদের হেদায়েতের যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু তারা সে হেদায়েত গ্রহণ করেনি; তারা নিজেদের প্রতি সেদিন জুলুম করেছিল সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে। দুনিয়ার জীবনে তারা যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল, তারই ফল তারা আখেরাতে ভোগ করবে। দুনিয়ার জীবনে সত্য কথা শ্রবণ করতেও তারা রাজী ছিলনা, গ্রহণ করাতো দূরের কথা। তাদের নিকট সত্য কথা ছিল সর্বাধিক অপ্রিয়, তাই তারা অনন্তকাল ধরে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ

'আর তারা (মালেক নামক ফেরেশতাকে) ডেকে ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ করে দেন। মালেক বলবে, তোমাদেরকে চিরকাল এ অবস্থায়ই থাকতে হবে'।

দোযখের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতার নাম হলো মালেক। দোযখীরা দোযখের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে তাদের মৃত্যু কামনা করবে এবং দোযখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাকে ডাক দিয়ে বলবে, অন্ততঃ তোমার প্রতিপালককে বল, এ বিপজ্জনক শাস্তি থেকে আমাদের মৃত্যু অনেক ভাল। আমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে যেন শেষ করে দেন, এরই জবাবে মালেক বলবেঃ

قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ

'নিশ্চয় তোমরা চিরকাল এ অবস্থায়ই থাকবে, কখনো রেহাই পাবেনা'।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম, এবনে আবিদ্দুনিয়া এবং বায়হাকী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মালেক দোযখীদেরকে তাদের আরজী শ্রবণের এক হাজার বছর পর জবাব দেবে যে, তোমরা এখানেই চিরকাল থাকবে।

হান্নাদ, তেবরানী, এবনে আবি হাতেম, বায়হাকী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আসের (রা.) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, দোযখীরা মালেক নামক ফেরেশতাকে ডাকবে এবং বলবে, আমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে হলেও এ কঠিন শাস্তি থেকে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা কর।

মালেক নামক ফেরেশতা ৪০ বছর পর্যন্ত এ কথার কোন জবাব দেবেন না, এরপর তিনি বলবেন, তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে।

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ

আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ আমি তো তোমাদের নিকট সত্য জীবন-বিধান পৌঁছিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপ্রিয় মনে করেছিল, আজকের এ শাস্তি তোমাদের কৃতকর্মেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তোমাদেরকে যথাসময়ে হেদায়েতের পয়গাম পৌঁছানো হয়েছিল, কিন্তু তোমরা সেই সত্য দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে, সত্য দ্বীন ছিল তোমাদের নিকট সর্বাধিক অপ্রিয়, অতএব এখন তার শাস্তি ভোগ কর।

اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ

'তবে কি তারা কোন বিষয় স্থির করে নিয়েছে? নিশ্চয় আমিও এক ব্যবস্থা ঠিক করে নিয়েছি'।

মক্কার কাফেররা সর্বদা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত, আল্লাহ পাকের রহমতে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতো। একবার তারা পরামর্শ করলো, যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন কর, তাহলে আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করবেনা। আর যারা ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা ইসলাম পরিত্যাগ করবে। আলোচ্য আয়াতে তাই আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ তবে কি তোমরা এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তাহলে আমিও তোমাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেছি অর্থাৎ আল্লাহ পাক ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, যারা ইসলাম বিরোধী শক্তি হিসেবে এগিয়ে আসবে, তাদের দুনিয়াতে অপমানজনক শাস্তি দেয়া হবে, আর আখেরাতেও তাদের জন্যে শাস্তি অবধারিত রয়েছে।

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۚ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ
يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰبِدِينَ ﴿٨١﴾
سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبٰرَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ
وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۖ فَأَنّٰى
يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ يٰرَبِّ إِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

তরজমা

(৮০) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন রহস্য এবং পরামর্শের কথা শ্রবণ করিনা? অবশ্যই শ্রবণ করি, আর আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখে।

(৮১) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যদি দয়াময় আল্লাহ পাকের কোন সন্তান থাকে তবে আমিই তাঁর সর্বপ্রথম এবাদতকারী।

(৮২) তিনিই আসমান জমীনের প্রতিপালক, তিনিই মহান আরশের অধিকারী, তিনি পবিত্র সেসব কথা থেকে যা তারা বর্ণনা করে।

(৮৩) অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন বাজে কথায় এবং খেলা-ধূলায় লিপ্ত থাকতে, সেদিন পর্যন্ত যেদিনের ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

(৮৪) তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি আসমানে উপাস্য এবং জমীনেও তিনিই উপাস্য, তিনিই মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।

(৮৫) আর বরকতময় সেই মহান সত্ত্বা, আসমান জমীন এবং উভয়ের সব কিছুর যিনি সত্ত্বাধিকারী, শুধু তাঁরই নিকট রয়েছে কেয়ামতের জ্ঞান, আর তাঁরই নিকট তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে।

(৮৬) আর তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে ডাকে; তারা সুপারিশ করার ক্ষমতাও রাখেনা। সুপারিশ শুধু তারাই করতে পারে, যারা সত্য উপলব্ধি করে তার সাক্ষ্য দেয়, আর তারা উত্তমরূপে জানে।

(৮৭) আর (হে রসূল!) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! তবু তারা কোন্ দিকে ফিরে যায়।

(৮৮) আর তিনি রসূলের এ উক্তি সম্পর্কেও অবগত রয়েছেন, "হে পরওয়ারদেগার! এ জাতি কখনও ঈমান আনবেনা"।

(৮৯) অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং বলুন, সালাম, তারা অতিসত্বর বুঝতে পারবে।

তফসীরুল কোরআন

أَمْ يَحْسَبُوْنَ

শানে নুযুল

এবনে জরীর মোহাম্মদ এবনে কাব কারযীর সূত্রে লিখেছেন, কা'বা শরীফ এবং তার গেলাফের কাছে তিন ব্যক্তি একত্রিত হয়, তন্মধ্যে দু'জন কোরায়শী এবং একজন ছিল সাকাফী অথবা দু'জন সাকাফী এবং একজন কোরায়শী ছিল। একজন বললো তোমরা কি মনে কর, আল্লাহ পাক আমাদের কথা শ্রবণ করেন? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, যদি উচ্চস্বরে কথা বল তবে শ্রবণ করেন, আর যদি নিম্নস্বরে বল তবে শ্রবণ করেন না, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۭ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ

'তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন রহস্য এবং পরামর্শের কথা শ্রবণ করিনা? অবশ্যই শ্রবণ করি, আর আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখে'।

কাফেররা ধারণা করতো যে আল্লাহ পাক তাদের মনের কথা জানেন না, আর ইসলামের বিরুদ্ধে তারা যে চক্রান্ত এবং গোপন পরামর্শ করতো, সেসব কথা আল্লাহ পাক শ্রবণ করেন না, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন-কল্পে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে সুরক্ষিত কথাও আল্লাহ পাক জানেন এবং তাদের সকল চক্রান্তমূলক গোপন পরামর্শের কথাও তিনি শ্রবণ করেন, কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই, এতদ্ব্যতীত তিনি প্রত্যেকটি মানুষের কৃতকর্মের বিবরণ লিখে রাখার জন্যে ফেরেশতা মোতায়েন করে রেখেছন, যারা তাদের সঙ্গেই থাকে এবং তাদের কর্মকান্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখে, যেমন সূরা ইনফিতারে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ○ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ○ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ

'আর নিশ্চয় তোমাদের প্রতি রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ। তারা সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তোমরা যা কিছু কর, সবই তারা জানে' (আয়াত ঃ ১০-১২)।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক অর্ন্তযামী, পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, এতদসত্বেও তিনি মানব জাতির যাবতীয় কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্যে ফেরেশতা মোতায়েন করে রেখেছেন। ফেরেশতাদের লিপিবদ্ধ ঐ বিবরণীই প্রত্যেকের আমলনামা হিসেবে কেয়ামতের দিন পেশ করা হবে, যেমন সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰۗىِٕرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ۭ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ○ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۭ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৩)

'এবং আমি প্রত্যেকটি মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কেয়ামতের দিন আমি তার জন্যে বের করব একটি কিতাব, যা সে পাবে উম্মুক্ত, (তাকে বলা হবে) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্যে যথেষ্ট'।

আলোচ্য আয়াতের رسلنا শব্দটি দ্বারা সেই ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা প্রত্যেকটি মানুষের কর্মকান্ড লক্ষ্য করে থাকে এবং তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখে। لديهم অর্থাৎ ঐ ফেরেশতাগণ সর্বদা মানুষের সঙ্গেই থাকে, কখনও তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়না।

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি দয়াময় আল্লাহ পাকের কোন সন্তান থাকে, তবে আমিই তার সর্বপ্রথম এবাদতকারী'।

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের জন্যে সন্তান-সন্ততি স্থির করা মহা অপরাধ, এর চেয়ে বড় কোন ভ্রান্ত ধারণা হতে পারেনা, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমিই আল্লাহ পাকের সর্বপ্রথম এবাদতকারী, আল্লাহ পাকের সঙ্গে আমারই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম, যদি আল্লাহ পাকের সন্তান-সন্ততি থাকত, তবে সবার আগে তা আমিই জানতাম কিন্তু আল্লাহ পাকের শান এ ধরণের সম্পর্ক থেকে অনেক উর্দ্ধে, অতএব তাঁর শানে সন্তান-সন্ততির সম্পর্কের কথা বলাকে আমি মহা অপরাধ মনে করি, তাই তোমরাও এমন কথা তাঁর শানে বলোনা, তাঁর পবিত্র সত্ত্বা মহান, সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক থেকে অনেক উর্দ্ধে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যেহেতু আমি তোমাদের সকলের পূর্ব থেকে আল্লাহ পাকের এবাদত করি, তাই আমি ভাল করে জানি যে, কোন্ গুণটি আল্লাহ পাকের শান মোতাবেক, আর কোন্ বিষয় তাঁর শানের পরিপন্থী। যদি আল্লাহ পাকের কোন সন্তান-সন্ততি থাকত, তবে আল্লাহর নবী সর্বপ্রথম তার তা'যীম করতেন, অথচ এমন অবস্থা তো নয়। এমনিভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (সূরা আম্বিয়া ঃ ২২)

'যদি আসমান জমীনে এক আল্লাহ পাক ব্যতীত আরো উপাস্য থাকত, তবে তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতো'।

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যদি প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ পাকের কোন সন্তান থাকত, তবে আল্লাহ পাকের নবী সর্বপ্রথম তা স্বীকার করতেন।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, হে মক্কাবাসী! যদি তোমরা এ ধারণা কর যে আল্লাহ পাকের কোন সন্তান আছে, তবে তোমাদের জানা উচিত, আমি সর্ব প্রথম আল্লাহ পাকের এবাদতকারী, আমি আল্লাহ পাকের তৌহীদের প্রবক্তা, তোমাদের এ ধারণাকে আমি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্ত ধারণা বলে মনে করি।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের عٰبدين শব্দটি آنفين অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ পাক সম্পর্কে তোমরা যে ভ্রান্ত ধারণ পোষণ কর, আমি সর্ব প্রথম তার প্রতিবাদকারী।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, عَبَدٌ শব্দটির অর্থ হলো অত্যন্ত বেশী ক্রোধ, অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহ পাকের জন্যে সন্তান-সন্ততি স্থির করে তাঁর শানে বেআদবী করছো, আমি এজন্যে অত্যন্ত বেশী ক্রোধান্বিত।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ দয়াময় আল্লাহ পাকের কোন সন্তান-সন্ততি নেই, আমি

সর্বপ্রথম এর উপর সাক্ষ্য দিচ্ছি, অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে عٰبدين শব্দটির অর্থ হলো সাক্ষ্যদাতা।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যদি ধরে নেয়া যায় যে, আল্লাহ পাকের সন্তান-সন্ততি রয়েছে তবে তা মেনে নিতে আমার কি আপত্তি থাকতে পারে, কেননা আমি তাঁর প্রথম এবাদতকারী, কিন্তু আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা এমন সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, অতএব তাঁর সাথে এমন সম্পর্ক হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, العٰبدين اول অর্থ হলো الجاحدين اول অর্থাৎ তোমাদের এ ভ্রান্ত ধারণার আমি প্রথম অস্বীকারকারী। ইমাম বোখারী (রঃ)-ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[২]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, যদি দয়াময় আল্লাহ পাকের কোন সন্তান থাকত, তবে আমি সর্বপ্রথম তার এবাদত করতাম কিন্তু তোমরা দেখছ, আমি আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করিনা, অতএব হে নাসারা এবং মুশরেকের দল! তোমরা আল্লাহ পাকের শানে কেমন অন্যায় কথা বল, এর চেয়ে বড় মন্দ কথা আর কিছুই নেই।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, যদি তোমরা মনে কর যে আল্লাহ পাকের সন্তান-সন্ততি রয়েছে তাহলে তোমরা জেনে রাখ, আমিই সর্বপ্রথম এক আল্লাহ পাকের এবাদতকারী, আর তোমরা যে ধারণা করছো তার প্রতিবাদকারী।[৩]

ইমাম তাবারী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, (হে রসূল!) আপনি বলুন, হে মুশরেকরা! যদি তোমরা এ ভ্রান্ত ধারণা কর যে, আল্লাহ পাকের সন্তান-সন্ততি রয়েছে তবে জেনে রাখ, আমি আল্লাহ পাকের প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি, আর আমি এ অন্যায় উক্তির সর্বপ্রথম প্রতিবাদকারী।

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

বস্তুতঃ আসমান জমীনের যিনি প্রতিপালক, যিনি মহান আরশের অধিকারী, তিনি কাফেরদের এহেন উক্তি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। কাফের মুশরেকরা তাঁর সন্তান-সন্ততি স্থির করে যা বলে তা থেকে তাঁর পবিত্র সত্ত্বা অনেক উর্ধ্বে, তিনি সকলেরই স্রষ্টা, বিশাল বিস্তৃত আসমান জমীনের তিনিই প্রতিপালক, তিনিই মহান আরশের অধিপতি, তিনি সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ

'অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, বাজে কথায় এবং খেলাধূলায় লিপ্ত থাকতে দিন, সেদিন পর্যন্ত যেদিনের ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়েছে'।

---

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৮৬
২. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৪৪
৩. তফসীর আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৬
তফসীরে তাবারী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-৬১

অর্থাৎ (হে রসূল!) যারা আল্লাহ পাকের শানের বরখেলাফ অবান্তর কথাবার্তা বলে, তাঁর সঙ্গে সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক স্থির করে তাদের এ অবস্থায় ছেড়ে দিন, তাদেরকে খেল-তামাশায়, আনন্দ-উল্লাসে, ভোগ-বিলাসে মেতে থাকতে দিন, এ জীবন তো নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, দু'দিন পরই তো তাদেরকে এ পৃথিবী ছেড়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে। সেদিন তথা কেয়ামতের দিন তারা তাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণতি যখন দেখতে পাবে, তখনই সত্য উপলব্ধি করবে। আর কেয়ামতের দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই এবং তাদের শাস্তির ব্যাপারেও কোন বাধা-বিপত্তি নেই।

وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ

'তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি আসমানে উপাস্য এবং জমীনেও তিনিই উপাস্য, তিনিই মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ'।

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণার পর এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের বিবরণ স্থান পেয়েছে। আসমান ও জমীনে সব কিছুই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তাঁর অনুগত; অতএব আসমান ও জমীনে এবাদত বন্দেগীর যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাকই, আর কেউ নয়। আসমানে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা প্রভৃতি আল্লাহ পাকেরই কর্তৃত্বাধীন, অতএব এসব উপাস্য হতে পারেনা, এমনিভাবে জমীনে জড় পদার্থ দ্বারা তৈরী অসহায় মূর্তিগুলোও উপাস্য হতে পারেনা।

নভোমন্ডলে-ভূমন্ডলে যাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত, যিনি সবকিছুর একমাত্র মালিক, তিনি এক আল্লাহ পাক, অতএব, তিনিই একমাত্র উপাস্য। الحكيم তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, সৃষ্টি জগতের কল্যাণ সম্পর্কে তিনিই সম্পূর্ণ অবগত। العليم তিনিই মহাজ্ঞানী, সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর নখদর্পণে রয়েছে, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

'আর বরকতময় সেই মহান সত্ত্বা, যিনি আসমান জমীন এবং উভয়ের মাঝের সব কিছুর সত্ত্বাধিকারী, শুধু তাঁরই নিকট রয়েছে কেয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে'।

যিনি সকলের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি বরকতময়, যিনি মহান, আসমান জমীন এবং তার মাঝে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর মালিকানা তাঁরই, এমন কোন সৃষ্টি নেই যা তাঁর কর্তৃত্বাধীন নয়। আর কেয়ামতের সময়ের জ্ঞান শুধু তাঁরই নিকট রয়েছে অর্থাৎ কেয়ামত কখন হবে তা শুধু আল্লাহ পাকই জানেন, আর কেউ নয়। কেয়ামতের দিন কারো কোন সাহায্য পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা, কেননা কেয়ামত কবে হবে একথাও কেউ জানেনা, আর কেয়ামত যে অবশ্যম্ভাবী তাতে কোন সন্দেহ নেই। একথা জেনে রেখ যে, তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফিরে যেতে হবে। অনুপস্থিতি বা আত্মগোপনের কোন পথ নেই। সেদিন প্রত্যেককে তার জীবনের যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেককে তার আমলের বদলা দেয়া হবে।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

'আর তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে ডাকে, তারা সুপারিশ করার ক্ষমতাও রাখেনা, সুপারিশ শুধু তারাই করতে পারে যারা সত্য উপলব্ধি করে এবং তার সাক্ষ্য দেয়, আর তারা উত্তমরূপে জানে'।

এ আয়াতে কাফেরদের একটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে। কাফের মুশরেকরা এ ধারণা করতো যে, তাদের ঠাকুর-দেবতারা কেয়ামতের দিন তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, তারা এ আশায় ঠাকুর-দেবতার পূজা-অর্চনা করতো, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুশরেকদের এ ভ্রান্ত ধারণার বাতুলতা ঘোষণা করে এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তারা সুপারিশ করার কোন অধিকারই রাখেনা, যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেছে তথা কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করেছে, প্রকৃত মোমেন হয়েছে শুধু তাদের পক্ষেই সুপারিশ উপকারী হতে পারে, আর সুপারিশ শুধু তারাই করতে পারবে যাদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে। সুপারিশের পাত্র এবং সুপারিশের নিয়ম কানুন সম্পর্কেও তারা ওয়াকেফহাল।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেন যে, নজর এবনে হারেস এবং তার দলের লোকেরা একথা বলতো যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যা বলেন তা যদি সত্য হয় তবে আমরা ফেরেশতাদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করবো, আর ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবে, অতএব কেয়ামতের দিন তাদের সুপারিশ আমাদের জন্যে উপকারী হবে। নজর এবং তার সঙ্গীদের এ ভুল ধারণার অপনোদন-কল্পে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে, তারা কেয়ামতের দিন সুপারিশ করার অধিকারীও হবেনা।[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ (সূরা বাকারা)

'এমন কে আছে যে আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে'?

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

'আর (হে রসূল!) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! তবুও তারা কোন্ দিকে ফিরে যায়'।

বিস্ময়কর বিষয় হলো এই, যারা তৌহীদকে অস্বীকার করে, শেরক ও পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করে তারাও মনে মনে এ সত্য স্বীকার করে যে, আল্লাহ পাকই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, কেননা তাদের ঠাকুর-দেবতারা যে তাদেরকে সৃষ্টি করেনি একথা তারা ভালভাবেই জানে। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন,

১. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২৩২

কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এক আল্লাহ পাকই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তারা পথভ্রষ্ট হয়ে কোন্ দিকে ফিরে যায়, অর্থাৎ এ সত্য উপলব্ধি করার পর যে আল্লাহ পাকই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের একান্ত কর্তব্য ছিল আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ করা, কিন্তু তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে অন্যদিকে চলে যায়। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তৌহীদের প্রতি আহ্বান করেছেন, তাদের সামনে সত্যকে তুলে ধরেছেন, কিন্তু তারা সেদিকে কর্ণপাত না করে আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে এবং জড় পদার্থের পূজা করতে থাকে।

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ

'আর তিনি রসূলের এ উক্তি সম্পর্কেও অবগত রয়েছেন, "হে পরওয়ারদেগার! এ জাতি কখনও ঈমান আনবেনা"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথা ভাল করেই জানেন যে, তিনি মোনাজাত করে বলেছেন, 'হে আমার পরওয়ারদেগার! নিশ্চয় এরা এমন লোক যারা কখনও ঈমান আনবেনা'। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا (সূরা ফুরকান ঃ ৩০)

'আর রসূল বলেন, 'নিশ্চয় আমার জাতি এ কোরআনকে ছেড়ে দিয়েছে'।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১]

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ

'অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং বলুন, সালাম, তারা অতিসত্বর বুঝতে পারবে'।

(হে রসূল!) তাদের ঈমান আনা না আনার প্রতি আপনি আর ভ্রুক্ষেপ করবে না, তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং তাদেরকে বলুন, আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সালাম, অর্থাৎ আমার সঙ্গে তোমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিলাম। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে তারা তাদের নাফরমানীর শাস্তি পাবে, তখন তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার শাস্তি কত ভয়াবহ!

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ৪/৬/৯৬ ইং তারিখ রাত ৮.৪৫-এ সূরা যুখরুফের তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ কবুল কর, আমীন।

---

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৪৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা দুখান

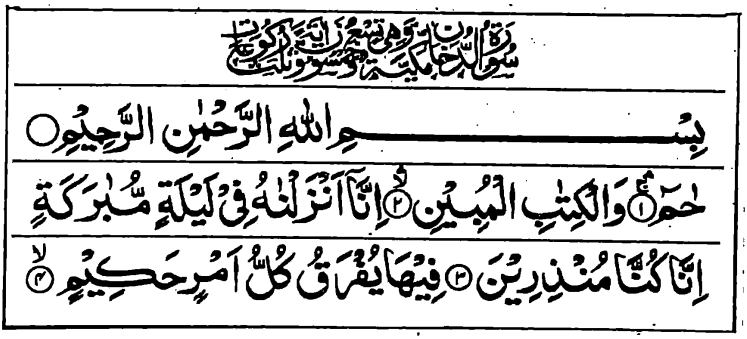

سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ

اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) হা-মীম।

(২) এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ!

(৩) নিশ্চয় আমি এই কিতাব নাযিল করেছি এক বরকতময় রজনীতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।

(৪) এ রজনীতে প্রত্যেক হেকমতপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা হয়।

সূরা দুখান প্রসঙ্গে

মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় ৩ রুকু, ৫৯ আয়াত রয়েছে, এ সূরার বাক্য সংখ্যা ৩৪৬ এবং এতে অক্ষর হলো ১,৪৩১টি।

এ সূরার ফজিলত

এবনে মরদবিয়া হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমা রাতে অথবা জুমার দিনে সূরা আদ-দুখান তেলাওয়াত করে, আল্লাহ পাক তার জন্যে জান্নাতে একটি মহল তৈরী করেন।

বায়হাকী অন্য একখানি হাদীস সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার রাত্রে হামীম, আদ দুখান এবং সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে, সকালে সে এমন অবস্থায় জাগ্রত হবে যে, তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

তিরমিজী এবং বায়হাকী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা হামীম, আদ দুখান রাত্রিকালে তেলাওয়াত করবে, সকাল পর্যন্ত তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকবে।[১]

এ সূরার আমল

ইমাম তিরমিজী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ যে ব্যক্তি সুরা দুখান, সূরা গাফের এবং আয়াতুল কুরসী সন্ধ্যাকালে পাঠ করবে, সকাল পর্যন্ত তার হেফাজত করা হবে। দারেমী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এতটুকু সংযোজিত হয়েছে, যে উপরোক্ত আমল করবে, সে কোন প্রকার মন্দ কিছু দেখবেনা। (এতকান)

পুর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় পবিত্র কোরআনের সত্যতা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর যারা কোরআনে করীমের সত্যতায় বিশ্বাস করেনি, এমন অপরাধীদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম বর্ণনার মাধ্যমে, আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে এক বরকতময় রজনীতে।

তফসীরুল কোরআন

حٰمٓ ○ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ

হা-মীম। এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। শপথ সেই মহান গ্রন্থের যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, আলোকময়, যার আলোকে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত, যা পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানব জাতিকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসে।

---

১. তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১১০
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৮৯

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ

'নিশ্চয় আমি এ মহান গ্রন্থ নাযিল করেছি এক বরকতময় রজনীতে'।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ পাক দয়া করে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণার্থে মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, অতএব বন্দা মাত্রেরই কর্তব্য হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থের সত্যতায় বিশ্বাস করা এবং তার শিক্ষা গ্রহণ করা, কেননা আল্লাহ পাক স্বয়ং এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনকে অত্যন্ত বরকতময় রজনীতে নাযিল করেছেন, যাবতীয় বরকত, রহমত এবং কল্যাণের মূল উৎস পবিত্র কোরআন, তদুপরি তা এক বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ হয়েছে।

মোবারক রজনী

সব সময়ই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, এর মধ্যে কোন কোন সময়ের আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন হজ্জ শুধু বছরের একটি বিশেষ সময়েই আদায় করা হয়, অন্য সময় নয়; সপ্তাহের সব দিনই আল্লাহ পাকের কিন্তু শুক্রবার জুমআর দিনটি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, এর বরকতই ভিন্ন, সমস্ত দিন আল্লাহ পাকেরই কিন্তু এর একেকটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট নামায আদায় করতে হয়। যেমন খুশী তেমন নীতি এক্ষেত্রে অচল, সময়ানুবর্তিতাই এখানে কর্তব্য, নিয়মানুবর্তিতা এখানে শর্ত এতদ্ব্যতীত সাধনা ব্যর্থ, কোন এবাদতই গ্রহণযোগ্য নয় আর এটিই আল্লাহ পাকের বন্দেগী, আল্লাহ পাক যে সময়ের জন্যে যে আদেশ দিয়েছেন সে সময় তা পালন করা, কেননা কোন্ সময়ে কী বরকত এবং কী কল্যাণ রয়েছে তা এক আল্লাহ পাকই জানেন। আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো তাঁর মহান বাণী পবিত্র কোরআন, কেননা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমেই মাটির মানুষ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হতে পারে।

ইমাম আহমদ (রঃ) স্বপ্নে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করেছিলেন, হে পরওয়ারদেগার! তোমার নৈকট্য লাভের মাধ্যম কি? তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, আহমদ আমার কালাম (পবিত্র কোরআন)। আর এ নেয়ামত কত বরকতময় তা বর্ণনাতীত। মানুষের সকল দুঃখ নিবারণের জন্যে যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, পথভ্রষ্টতার সকল অন্ধকার দূরীভূত করার জন্যে যে বাণী এসেছে, সমগ্র মানব জাতির জন্যে যে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান নাযিল হয়েছে তা হলো পবিত্র কোরআন, এই পবিত্র কোরআন নাযিল করার জন্যে যে সময় নির্বাচন করা হয়েছে তা হলো সর্বাধিক বরকতময়, কল্যাণকর এবং মূল্যবান। পবিত্র কোরআন তাকে 'মোবারক রজনী' বলে আখ্যা দিয়েছে।

এ মোবারক রজনী কোন্টি? এ সম্পর্কে অধিকাংশ তফসীরকার বলেছেন, এটি হলো শবে কদর। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), তফসীরকার কাতাদা (রঃ), এবনে যোবায়ের (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), এবনে যায়েদ (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ এ মতই পোষণ করতেন। আর তফসীরকার একরামা (রঃ) এবং আরো

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেন, এটি হলো শবে বরাত। যারা বলেছেন এটি লাইলাতুল কদর, তাঁরা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন কোরআনে করীমের অন্য আয়াত।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

'নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি পবিত্র কোরআন লাইলাতুল কদরে', আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

'নিশ্চয় আমি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি মোবারক রজনীতে'।

উভয় আয়াতে একই রজনীর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআন কোন্ মাসে নাযিল হয়েছে একথাও ঘোষণা করা হয়েছেঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)

'রমজানের মাস- যে মাসে পবিত্র কোরআন নাযিল করা হয়েছে'।

আর মাহে রমজানেরই শেষ দশকে আসে লাইলাতুল কদর। অতএব, আলোচ্য আয়াতে 'মোবারক রজনী' বলে 'লাইলাতুল কদর'কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব এবং বরকত সম্পর্কে অবহিত করতেই সূরা কদরে এভাবে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (সূরা ক্বদর ঃ)

আর তুমি কি জান লাইলাতুল কদর কি? এর বরকত ও মাহাত্ম কত বেশী? এরপর আল্লাহ পাক নিজেই জবাব দিয়েছেনঃ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (সূরা ক্বদর ঃ)

'লাইলাতুল কদর হলো হাজার মাসের চেয়েও উত্তম'।

হাজার মাস (৮৩ বছর ৪ মাস) একাধারে আল্লাহ পাকের এবাদত করলে যে সওয়াব পাওয়া যায় তার চেয়ে অধিক সওয়াব লাভ হয় এই এক লাইলাতুল কদরের এবাদতেই, কেননা এ বরকতময় রজনীতেই পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত জীব্রাঈল (আঃ) শবে কদরে পবিত্র কোরআনকে 'লওহে মাহফুজ' থেকে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে বায়তুল ইজ্জত পর্যন্ত একত্রে নিয়ে আসেন, এরপর আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক ২৩ বছরে কোরআনে করীমের কিছু কিছু অংশ নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হতে থাকেন।

إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

'নিশ্চয় আমি সতর্ককারী'।

করুণাময় আল্লাহ পাকের বন্দাদের প্রতি তাঁর করুণার কারণে যথাসময়ে বন্দাদেরকে তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, এ উদ্দেশ্যে যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং আসমানী গ্রন্থ সমূহ নাযিল করেছেন এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনও এ উদ্দেশ্যেই বরকতময় রজনীতে নাযিল করেছেন, যাতে করে মানব জাতি তার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে সরল সঠিক পথ গ্রহণ করে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে।

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ

'এ রজনীতে প্রত্যেক হেকমতপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা হয়'।

বর্ণিত আছে যে, এই রাত থেকে পরবর্তী এক বছরে সমগ্র সৃষ্টি জগতে যা কিছু ঘটবে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ফেরেশতাদেরকে তার নির্দেশ দেয়া। এজন্যে এ রাতকে 'লায়লাতুল হাকাম' বা সিদ্ধান্তের রাত বলা হয়। আর এ রাতকে 'লাইলাতুত তকদীর'ও বলা হয়। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, এ রাতেই মানুষের তকদীরের ফয়সালা হয়, বরং তকদীর সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত বহু পূর্বেই হয়ে গেছে– যা 'লওহে মাহফুজে' সংরক্ষিত রয়েছে। লাইলাতুল কদরে তার অনুলিপি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদেরকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। আল্লামা আলুসী (রাঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রূহুল মাআনীতে বলেছেনঃ

والمراد اظهار تقديره تعالى ذالك... بالحوادث الكونية

অর্থাৎ উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাক বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে যে তকদীর নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের নিকট শবে কদরে প্রকাশ করা হয়। আর বিভিন্ন বিষয়ের তকদীর, তা-তো আল্লাহ পাক আসমান জমীন সৃষ্টির পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তব্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ .

يكتب من ام الكتاب ما يكون فى السنة .....وموت حتى الحاج

শবে কদরে মানুষের জীবন, মৃত্যু, রিযক এবং বৃষ্টিপাত এমনকি, এর পরবর্তী হজ্জের মৌসুমের হাজীদের সংখ্যা সম্পর্কীয় সিদ্ধান্তের অনুলিপি ফেরেশতাদেরকে প্রদান করা হয়।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি বিবরণ দ্বারা জানা যায় যে, তকদীরের সিদ্ধান্ত শবে বরাতে গৃহীত হয় তবে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের নিকট লাইলাতুল কদরে তা কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

আর যাঁরা মনে করেন, 'লাইলাতুল মোবারাকা' দ্বারা লাইলাতুল বরাআতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

এ রাত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা.)-কে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ তুমি কি জান এ রাতে কি রয়েছে? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এ রাতে কি রয়েছে?

জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এ বছর পৃথিবীতে যত মানুষের আগমন ঘটবে আর যত মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে তাদের সকলের নাম এ রাতেই লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। এ রাতেই মানব জাতির আমলের বিবরণ আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পেশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত, আগামী এক বছর যাকে যে রিয্ক প্রদান করা হবে তার হুকুমও নাযিল হয় এ মহান রাতে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন অর্ধ শা'বানের রাত আসে, (শবে বরাত) তখন তোমরা রাত্রিতে এবাদত কর এবং দিনে রোজা রাখ, কেননা আল্লাহ পাক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ঘোষণা করেন, আছে কেউ ক্ষমা প্রার্থী? যাকে আমি ক্ষমা করবো, আছে কেউ রিয্ক প্রার্থী? যাকে আমি রিয্ক দান করবো, আছে কেউ বিপদগ্রস্ত? যাকে আমি বিপদমুক্ত করবো, আর এ ঘোষণা হতে থাকে ফজর পর্যন্ত।[১] (এবনে মাজা, বায়হাকী)

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ সম্পর্কে বলেছেনঃ মূলতঃ এখানে তিনটি স্বতন্ত্র কাজ রয়েছে। প্রথম কাজ হলো তকদীর নির্দিষ্ট হওয়া, অর্থাৎ কখন কি ঘটবে? কিভাবে ঘটবে? এর সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাক আসমান জমীন সৃষ্টির পূর্বেই গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় কাজ হলো, এ তকদীর সমূহকে লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করিয়ে ফেরেশতাদের নিকট প্রকাশ করা। এ কাজটি শবে বরাতে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। আর তৃতীয় কাজ হলো সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদেরকে এ তকদীর সমূহের বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা। আর এ কাজটি লাইলাতুল কদরে হয়ে থাকে।

হযরত মুজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করেনঃ যে সমস্ত ফেরেশতাদের প্রতি তকদীর বাস্তবায়নের বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁরা চারজন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ), হযরত মিকাঈল (আঃ) হযরত ইস্রাফিল (আঃ) এবং হযরত আজরাঈল (আঃ)। তাঁদের সহযোগী রয়েছেন অগণিত ফেরেশতা।

ইমাম জুহরী (র.) বর্ণনা করেনঃ এ রাতকে শবে কদর এজন্যে বলা হয় যে, এ রাত অত্যন্ত মূল্যবান, অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

১. তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১১১

শেখ আবু বকর ওয়াররাক বর্ণনা করেন, এ মহান রাতে এবাদতের কারণে এমন লোকেরও মর্যাদা এবং সম্মান বৃদ্ধি পায় ইতোপূর্বে যাদের কোন মর্তবা বা কদর ছিল না, তাই এ রাতকে শবে কদর বলা হয়।

হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেন, যেহেতু এ রাতে কোরআনে করীম নাযিল হয়েছে, আর কোরআনে করীম হলো সকল বরকত এবং সৌভাগ্যের মূল উৎস, আর এ শবে কদরে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হয় বিশেষ রহমত এবং ফেরেশতাদের আগমন ঘটে, দরবারে এলাহীতে দোয়া কবুল হয়, এজন্যে এ রাতকে মুবারক রাতও বলা হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ

'নিশ্চয় আমি কোরআনকে বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি'।

আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম এবং গুরুত্ব বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, 'নিশ্চয় আমি এই কিতাব নাযিল করেছি', এ বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা কোরআনে করীমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম প্রমাণিত হয়, দ্বিতীয়তঃ সময়ের দিক থেকে বরকতময় রজনীতে নাযিল করাও পবিত্র কোরআনের মাহাত্মেরই প্রমাণ। তৃতীয়তঃ পবিত্র কোরআনকে সুস্পষ্ট, আলোকময় গ্রন্থ বলে ঘোষণা দ্বারাও এর গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (নিশ্চয় আমি সতর্ককারী) বলে পবিত্র কোরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক করতে এবং জীবন সাধনার পথ-নির্দেশনার উদ্দেশ্যেই পবিত্র কোরআন নাযিল করা হয়েছে।[১]

দয়াময় আল্লাহ পাকের মর্জি হয়েছে যেন মানুষকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তাই পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন।

১. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২৩৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৯০
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১১০

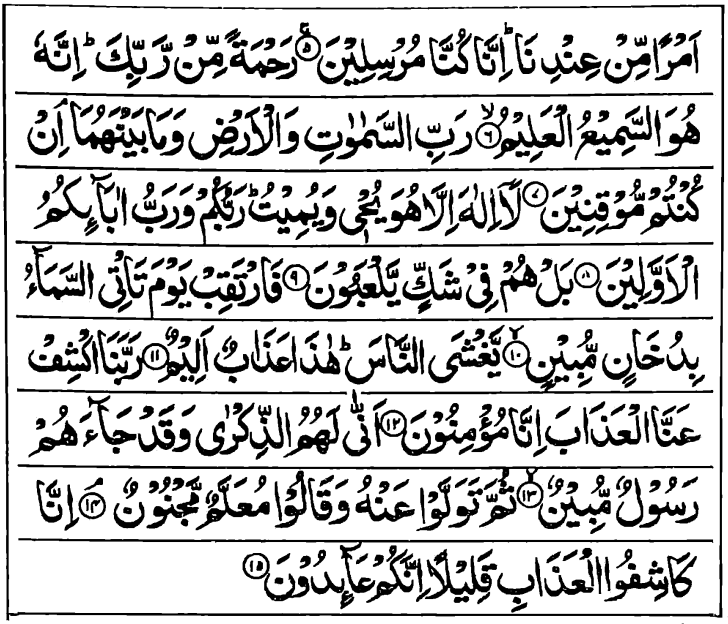
أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝٥ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٦ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِنْ
كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ۝٧ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ ۝٨ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَّلْعَبُونَ ۝٩ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝١٠ يَّغْشَى النَّاسَ ۖ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١١ رَبَّنَا اكْشِفْ
عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝١٢ أَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ
رَسُولٌ مُّبِينٌ ۝١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۝١٤ إِنَّا
كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۝١٥

তরজমা

(৫) আমার নির্দেশক্রমে, নিশ্চয় আমি রসূল প্রেরণ করে থাকি।

(৬) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের রহমত স্বরূপ, নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, তিনি মহাজ্ঞানী।

(৭) যিনি আসমান সমূহ, জমীন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা পূর্ণ বিশ্বাসী হও (তবে এসব প্রমাণই যথেষ্ট)।

(৮) তিনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যুমুখে পতিত করেন। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষেরও প্রতিপালক।

(৯) বস্তুতঃ তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খেলা-ধূলায় লিপ্ত রয়েছে।

(১০) অতএব (হে রসূল!) আপনি অপেক্ষা করুন সেদিনের, যেদিন আসমানে এক স্পষ্ট ধূম্ররাশির উৎপত্তি হবে।

(১১) ঐ ধূম্ররাশি মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। এটি একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(১২) তখন তারা আরজ করবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ শাস্তি থেকে রেহাই দিন, আমরা ঈমান আনবো।

(১৩) তারা কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে? অথচ তাদের নিকট স্পষ্টভাষী রসূল আগমন করেছেন।

(১৪) এরপর তারা তাঁকে অমান্য করলো এবং বললো, সে তো শেখানো বুলি আওড়ায়, সে-তো একজন উন্মাদ।

(১৫) নিশ্চয় আমি তোমাদের শাস্তি কিছুদিনের জন্যে রহিত করছি, নিশ্চয় তোমরা পুনরায় তাই করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, লাইলাতুল কদরে বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যা কিছু সিদ্ধান্ত হয় তা শুধু আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেকই হয়। তাঁর নির্দেশেই ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করা হয়, যেমন জীব্রাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক বিশ্বনবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআন প্রেরণ করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের اَمْرًا শব্দটির অর্থ আদেশ, যা আল্লাহ পাকের হেকমত মোতাবেক হয়।

اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ

'নিশ্চয় আমি রসূল প্রেরণ করে থাকি'।

অর্থাৎ যুগে যুগে নবী রসূল প্রেরণ করে আমি আমার বন্দাদেরকে পরকালীন জীবন সম্পর্কে সতর্ক করেছি এবং নবী রসূলগণকে আমি কিতাব দিয়ে প্রেরণ করেছি, আর এজন্যেই আমি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি।

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

'আপনার প্রতিপালকের রহমত স্বরূপ, নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, তিনি মহাজ্ঞানী'।

অর্থাৎ রসূল প্রেরণ, পবিত্র কোরআন সহ সমস্ত আসমানী গ্রন্থের অবতারণ-এসব মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, নবী রসূলগণকে প্রেরণ করা এবং আসমানী গ্রন্থ নাযিল করা করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণা স্বরূপ।

আর কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেও করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে, কেননা তিনি হলেন

রহমতুল্লিল আলামীন, তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতির নিকট হেদায়েতের বাণী পৌঁছিয়েছেন, আর হেদায়েত হলো চির শান্তি, চির নাজাত লাভের একমাত্র পন্থা।[১]

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, তিনি মহাজ্ঞানী'।

আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের সমস্ত কথা শ্রবণ করেন, তাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। বন্দাদের সকল প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল, কিসে তাদের কল্যাণ আর কিসে তাদের অকল্যাণ তা তিনিই সম্যক অবগত।

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ

'যিনি আসমান সমূহ, জমীন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা পূর্ণ বিশ্বাসী হও (তবে এসব প্রমাণই যথেষ্ট)'।

অথবা এর অর্থ হলো, তোমরা যখন একথা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ পাকই আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন তোমরা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন কর। আরও বিশ্বাস কর যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রসূল। সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, তাঁর কোন শরীক নেই, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۗىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ

'তিনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যুমুখে পতিত করেন, তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষেরও প্রতিপালক'।

কাফের মুশরেকরা আল্লাহ পাককে স্রষ্টা হিসেবে মেনে নিতে দ্বিধা করতো না; কিন্তু তিনিই একমাত্র উপাস্য একথা মেনে নিতে প্রস্তুত হতো না, তাই এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত এবাদত বন্দগীর যোগ্য কেউ নেই, তিনি এক, অদ্বিতীয়, নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক, সমগ্র সৃষ্টি জগতে তাঁর ক্ষমতা, তাঁরই আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হাতে, যাকে ইচ্ছা তিনি জীবন দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদের অস্তিত্ব, জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব এক আল্লাহ পাকেরই দান, অতএব এ কথার প্রতি বিশ্বাস কর যে, এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করাই তোমাদের কর্তব্য, তিনি ব্যতীত অন্য কারো সম্মুখে মাথানত করা, কারো পূজা-অর্চনা করা নিতান্ত অবিচার ব্যতীত আর কিছুই নয়।

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ

১. তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৯০

'বরং তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খেলা-ধূলায় লিপ্ত রয়েছে'।

পূর্বোল্লিখিত সমস্ত দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর কাফের মুশরেকদের কর্তব্য ছিল এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকর গুজার হওয়া, কিন্তু তারা আল্লাহ পাকের তৌহীদে বিশ্বাস করেনি, কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে, কোরআনে করীমের সত্যতায়ও বিশ্বাস করেনি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবিশ্বাস করেছে, তাঁকে বিদ্রুপ করেছে। তারা ভেবেছে জীবন এভাবেই অতিবাহিত হবে, কখনও তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবেনা, আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবেনা, এজন্যেই কোরআনে করীমে এ সম্পর্কে আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

(সূরা বাকারা ঃ ২৮১)

'আর ভয় কর সেদিনকে যেদিন তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ পাকের দরবারে, এরপর প্রত্যেককে তার যাবতীয় কর্মের বদলা পুরোপুরি দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবেনা'।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ○ يَّغْشَى النَّاسَ ۭ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ

'অতএব, (হে রসূল!) আপনি অপেক্ষা করুন সেদিনের, যেদিন আসমানে এক স্পষ্ট ধূম্ররাশির উৎপত্তি হবে, এ ধূম্ররাশি মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। এটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'।

কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী

যেহেতু মক্কাবাসী কোনভাবেই ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়নি, তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাদের ঈমানের ব্যাপারে অস্থির ও ব্যাকুল না হওয়ার কথা বলেছেন এবং কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেনঃ "(হে রসূল!) আপনি অপেক্ষা করুন সেদিনের, যেদিন আসমান থেকে ধূম্ররাশির উৎপত্তি হবে, এ ধূম্ররাশি মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, কাফেরদের জন্যে এটি হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। তখন তারা মর্মে মর্মে সত্য উপলব্ধি করবে এবং দ্বীন ইসলামের আবেদনে সাড়া না দেয়ার ও তাদের উদ্দেশ্যে কৃত উপদেশকে বিদ্রুপ করার ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করবে।

আলোচ্য আয়াতে যে ধূম্ররাশির কথা বলা হয়েছে, তা কোন্ ধূম্ররাশি? এ সম্পর্কে তফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে।

কেয়ামতের আলামত

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এবং হাসান (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণের মতে, এটি হলো কেয়ামতের আলামত যা কেয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাবে। এবনে জরীর, সালাবী এবং আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত হোজায়ফা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ সর্বপ্রথম কেয়ামতের আলামত হলো ধূম্ররাশি, ঈসা এবনে মরয়মের অবতরণ এবং একটি অগ্নি যা এডেনের কোন গর্ত থেকে বের হবে আর লোকদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে, দ্বিপ্রহরে লোকেরা যেখানে অবস্থান করবে, অগ্নিটিও সেখানে থেকে যাবে।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এ ধূম্ররাশিটি কেমন হবে? তখন তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এরপর এরশাদ করলেনঃ প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত ঐ ধূম্ররাশি আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে, ৪০ দিন পর্যন্ত তা স্থায়ী হবে। কেয়ামতের নিকট-পূর্বেই এ ধূম্র প্রকাশ পাবে, এর প্রতিক্রিয়া নেককার মোমেনদের উপর এমন হবে যেমন সর্দির সময় হয়। কিন্তু কাফের মুনাফেকদের মাথার ভেতর ঐ ধূম্র প্রবেশ করবে এবং তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে।

তেবরানী হযরত আবু মালেক আশআরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে তিনটি বিষয় সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেছেনঃ (১) ধূম্ররাশি যা মোমেনের উপর সর্দির ন্যায় প্রতিক্রিয়া করবে। আর কাফেরের অবস্থা হবে এই যে, সে ফুলে যাবে এবং ধূম্র তার কান দিয়ে বের হয়ে আসবে। (২) দাব্বাতুল আরদ (৩) দজ্জাল।[১]

অন্যদিকে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াতে যে ধূম্রের কথা রয়েছে তা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের ধূম্র নয়; বরং মক্কার কাফেরদের চরম জুলুম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে এ বদদোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফ (আঃ)-এর সময়ে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তেমনি দুর্ভিক্ষ এ কাফেরদের উপর আপতিত কর, আর এভাবে আমাকে সাহায্য কর। তখন সঙ্গে সঙ্গে মক্কার কোরায়শরা সাত বছরব্যাপী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়। তাদের অবস্থা এত শোচনীয় হয়েছিল যে, তারা মৃত জীব ভক্ষণেও বাধ্য হয়েছিল। জঠর-জ্বালায় তাদের অবস্থা এত কষ্টকর হয়েছিল যে, যখন তারা আসমানের দিকে তাকাত, তখন উপরে শুধু ধূম্র রাশি দেখত। আলোচ্য আয়াতে কোরায়শদের সে দুর্গতির কথাই বলা হয়েছে।

ইমামা এলাকার প্রধান বিখ্যাত সাহাবী হযরত সুমামা (রাঃ) ঐ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইমামা থেকে মক্কা শরীফে খাদ্য রফতানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন। পরিণামে মক্কাবাসী আরো দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ক্ষুধার জ্বালায় দৃষ্টি শক্তি যেন হ্রাস পায়,

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৯৩

চতুর্দিক তারা অন্ধকার দেখে, আসমান জমীনে সব কিছুই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখতে থাকে আর কোরআনে করীমে একথাটিকে يَغْشَى النَّاسَ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

আলোচ্য আয়াতে কোরায়শদের সে দুর্গতির কথাই বলা হয়েছে। তবে এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে আলোচ্য আয়াতের الناس শব্দটি দ্বারা মক্কার মানুষকে উদ্দেশ্য করা হবে, দুনিয়ার সব মানুষকে নয়। বর্ণিত আছে যে, কোরায়শের পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করেছিল যে, আপনার জাতি দুর্ভিক্ষের কারণে আজ ধ্বংসের পথে, আপনি তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন। রহমতুল্লিল আলামীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখনই তাদের জন্যে দোয়া করলেন, ফলে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত হলো এবং তাদের দুর্ভিক্ষের দুর্ভাগ্য দূরীভূত হলো।

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ

'হে পরওয়ারদেগার! আমাদের উপর থেকে এ আযাব দূর করে দাও, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনব'।

কাফেররা বিপদগ্রস্ত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করবে, "হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে এ আযাব থেকে রক্ষা করুন, আমরা অবশ্যই ঈমান আনবো।"

أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ

'(তখন) তারা কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে? অথচ (ইতোপূর্বে) তাদের নিকট স্পষ্টভাষী রসূল আগমন করেছিলেন'। কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেনি। আল্লাহ পাকের রসূলকে বিদ্রুপ করেছিল। শুধু তাই নয়; তাঁকে লক্ষ্য করে অশালীন মন্তব্য করেছে।

পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ

'এরপর তারা তাঁকে অমান্য করলো এবং বললো, সে-তো শেখানো বুলি আওড়ায়'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কাফেররা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বলতো, বনী সাকীফ গোত্রের এক অনারব গোলাম এসে তাঁকে এসব কথা শিখিয়ে যায়, আর কোন কোন কাফের বলতো, মূলতঃ সে উন্মাদ (নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক)।

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ

১. তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১১৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৯৫
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৯২

'নিশ্চয় আমি তোমাদের শাস্তি কিছু দিনের জন্যে রহিত করছি, তবে তোমরা পুনরায় তাই করবে'।

অর্থাৎ তোমাদের বিপদ দূরীভূত হলে তোমরা পুনরায় কুফর ও নাফরমানীতে লিপ্ত হবে। তোমাদের ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আয়াতের অর্থ হলো, কাফেররা যত কান্নাকাটিই করুক না কেন আর ঈমান আনার কথা যতভাবেই বলুক না কেন, বিপদ মুক্তির পর তারা পুনরায় কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হবে।

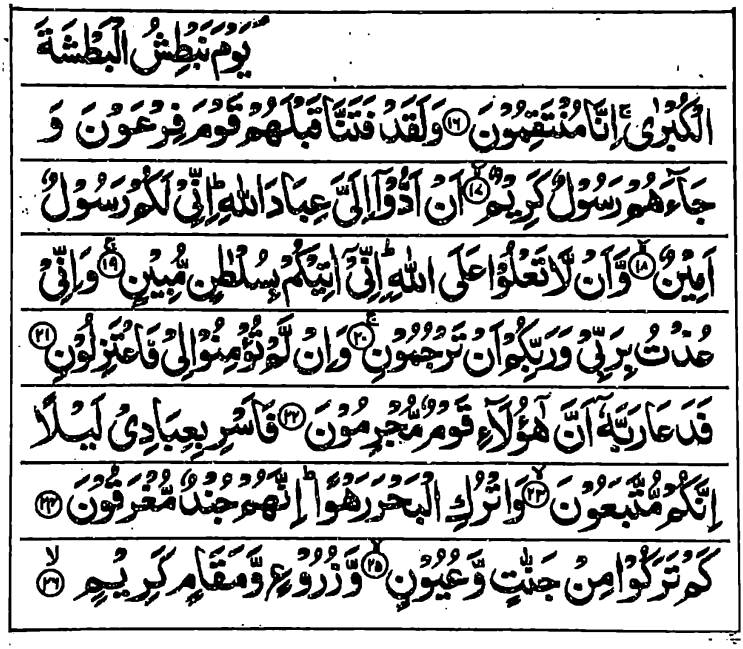
يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ
الْكُبْرٰى ۚ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ
جَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي
عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾
فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا
إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾
كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

তরজমা

(১৬) (স্মরণ কর সেদিনকে) যেদিন আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করবো ভীষণভাবে, সেদিন তোমাদের রক্ষা নেই। নিশ্চয় আমি প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

(১৭) নিশ্চয় তাদের পূর্বে আমি ফেরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকটও এসেছিলেন একজন সম্মানিত রসূল।

(১৮) (তিনি তাদেরকে বলেছিলেন) আল্লাহর বন্দাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ কর, আমি তোমাদের নিকট বিশ্বস্ত রসূল হিসেবে এসেছি।

(১৯) আর তোমরা আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে যেওনা, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করছি।

(২০) আর নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের এবং তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাতের মাধ্যমে হত্যা করতে না পার।

(২১) যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না-ও আন, তবে অন্তত আমার নিকট থেকে দূরে সরে থাক।

(২২) এরপর মূসা তার প্রতিপালকের নিকট এই বলে আরজী পেশ করলো, এরা তো এক অপরাধী জাতি।

(২৩) (আল্লাহর তরফ থেকে হুকুম হয়) তুমি আমার বন্দাদের নিয়ে রাত্রি বেলা বের হয়ে পড়, নিশ্চয় তারা তোমাদের পিছু ধাওয়া করবে।

(২৪) আর সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, নিশ্চয় তারা এমন এক বাহিনী যা নিমজ্জিত হবে।

(২৫) তারা ছেড়ে গেছে কত বাগান এবং কত ঝর্ণা।

(২৬) কত শষ্যক্ষেত্র এবং কত উত্তম বাড়ী-ঘর সমূহ।

তফসীরুল কোরআন

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ

'(স্মরণ কর সেদিনকে) যেদিন আমি পাকড়াও করবো তোমাদেরকে ভীষণভাবে, সেদিন তোমাদের রক্ষা নেই, নিশ্চয় আমি প্রতিশোধ গ্রহণকারী'।

কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যে দিনের কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তা কোন্ দিন? হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, এ দিন হল ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের দিন। যেহেতু মক্কাবাসী সুদীর্ঘ তেরটি বছর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বর্ণনাতীত জুলুম অত্যাচার করেছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে এ আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধের দিন কাফেরদের সমুচিত শাস্তি হয়েছিল, যদিও তারা সংখ্যায় ছিল মুসলমানদের থেকে অনেক বেশি, কিন্তু সত্য-অসত্যের এ লড়াইয়ের কাফেরদেরকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মতে, কাফেরদের এ পরাজয়ের কথা আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন হযরত উবাই এবেন কাব (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), আবুল আলীয়া (রঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ), মোহাম্মদ এবনে সিরীন (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং আতীয়্যা (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতে যেদিনের কথা বলা হয়েছে তা হল কেয়ামতের দিন। অর্থাৎ কেয়ামতের দিনই কাফেরকে পাকড়াও

করা হবে, সেদিন তাদের রক্ষা নেই। তিনি বলেছেন, যদিও বদরের দিন কাফেরদেরকে পাকড়াও করা হয়েছিল এবং তাদের শীর্ষস্থানীয় অনেক লোকই সেদিন নিহত হয়েছিল, আর সেদিন কাফেরদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন দিন ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু এর দ্বারা কেয়ামতের দিনকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা কাফেরদের জন্যে সবচেয়ে কঠিন দিন হবে কেয়ামতের দিন, সেদিন তারা আত্মরক্ষার কোন পথ পাবেনা। তফসীরকার একরামা (রঃ)-ও বলেছেন, এদিন হল কেয়ামতের দিন।[১]

পূর্ববর্তী আয়াতে মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করার পর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) কাফেরদের অন্যায়-আচরণ নতুন কিছু নয়, ইতোপূর্বে মূসা (আঃ)-কে ফেরাউন ও তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম, মক্কার কাফেরদের ন্যায় তারাও মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছিল, পরিণামে তাদের শাস্তি অনিবার্য হয়েছিল, তাই ফেরাউন ও তার দলবলকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ

'নিশ্চয় তাদের পূর্বে আমি ফেরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকটও এসেছিলেন একজন সম্মানিত রসূল'।

অর্থাৎ মক্কার মুশরেকদের পূর্বে মিশরের কিবতীদেরকে আমি পরীক্ষা করেছিলাম, তাদের রাজা ছিল ফেরাউন, তাদের নিকট মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, মূসা (আঃ)-এর প্রেরণ ছিল ফেরাউন ও তার দলবলের জন্যে এক বিরাট পরীক্ষা এ মর্মে যে, তারা রসূলের প্রতি ঈমান আনে কি-না? হযরত মূসা (আঃ) তাদের নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছিয়েছেন, কিন্তু ফেরাউন ও তার দলবল তাঁকে রসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) একথাও বলেছেনঃ

اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۭ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝ وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّىْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ.

(তিনি তাদেরকে বলেছিলেন), আল্লাহর বন্দাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ কর, একথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস কর যে, আমি আল্লাহ পাকের বিশ্বস্ত রসূল। যেহেতু ফেরাউন বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতো, ফেরাউন কর্তৃক সর্বদা বনী ইসরাঈল উৎপীড়িত হতো, তাই হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন, বনী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে যেতে দাও। তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করোনা, তাদেরকে দুঃখ দিওনা, কিন্তু

১. তফসীরে তাবারী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-৩০
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১২০
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৯৪
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩২

ফেরাউন ক্ষমতার মোহে মত্ত ছিল। ক্ষেত্রেবিশেষে ক্ষমতা মানুষকে অন্ধ করে রাখে এবং অপরিণামদর্শী ক্ষমতাবানরা তাদের ক্ষমতাকে স্থায়ী মনে করে, আর এ কারণে ক্ষমতার দাপট দেখায়, দম্ভ ও অহংকার তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, ক্ষমতার চরম অপব্যবহারেও তখন তারা দ্বিধারোধ করেনা। ফেরাউনের মধ্যেও এসব নৈতিক ব্যাধি দেখা দিয়েছিল, তাই হযরত মূসা (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দেয়ার স্থলে ফেরাউন তার দম্ভ প্রকাশ করতে থাকল, তখন মূসা (আঃ) বললেনঃ

তোমরা আল্লাহ পাকের বিদ্রোহী হয়োনা

আর তোমরা আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে যেওনা, তাঁর বিদ্রোহী হয়োনা, আর আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমার রেসালতের প্রমাণ পেশ করবো। আমি যে আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূল একথা নিঃসন্দেহে সত্য, আল্লাহ পাক আমাকে যে মোজেযা দান করেছেন তা আমি তোমাদেরকে দেখাব, যা দেখার পর কোন মানুষই ঈমান আনয়নে দ্বিধাগ্রস্ত থাকতে পারেনা। তফসীরকারগণ বলেছেন, "আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে যেওনা"র তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে দুর্বল মনে করে নিজেদেরকে শক্তিধর মনে করা, কেননা ব্যক্তি মূসা (আঃ) দুর্বল হতে পারেন, ফেরাউনকে তার সৈন্যসামন্ত সহ শক্তিশালী মনে হতে পারে, কিন্তু এটি ব্যক্তি মুসার প্রশ্ন নয়; বরং হযরত মূসা (আঃ) সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের রসূল হিসেবে আগমন করেছেন, তাঁকে দুর্বল মনে করার অর্থ হলো আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে দম্ভ প্রকাশ করা, যার শাস্তি অনিবার্য, তাই হযরত মূসা (আঃ) বলেছেন,

إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

'নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করছি'।

অর্থাৎ আমি যে আল্লাহ পাকের রসূল একথা সন্দেহাতীত, আল্লাহ পাক আমাকে যে মোজেযা (অলৌকিক শক্তি) সমূহ দান করেছেন, তা দেখলেই তোমরা আমার কথার সত্যতা অনুধাবন করবে।

হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনকে এসব কথা বললেন, তখন তারা বিশ্বাস করার স্থলে তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিল, তারা বললো, আমরা পাথর মেরে তোমাকে হত্যা করবো। তখন হযরত মূসা (আঃ) বললেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ

'আর নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাতের মাধ্যমে হত্যা করতে না পার'।

অর্থাৎ যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি পরাক্রমশালী, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, আমি তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করছি, আমি তাঁরই প্রেরিত রসূল, অতএব, তোমরা আমাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে পারবেনা, এ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত রয়েছি, কেননা আল্লাহ পাক যাকে রক্ষা করেন, কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারেনা, আর আল্লাহ পাক যাকে ধ্বংস করতে চান, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারেনা।

অতএব, তোমাদের হুমকি ধমকি ফলপ্রসূ হবেনা, আমার রেসালতের দায়িত্ব পালনেও আমাকে বিরত রাখতে পারবেনা, তবে এতটুকু কথা–

وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ

যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আন, তবে আমার নিকট থেকে দূরে সরে থাক, আমাকে কষ্ট দেয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়োনা, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু এতদসত্বেও যখন কাফেররা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়নে বিরত হলোনা, তখন তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন,

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ

'এরপর মূসা (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট এই বলে আরজী পেশ করলো, নিশ্চয় এরা তো এক অপরাধী জাতি'।

অর্থাৎ তারা মুশরেক, আর শেরক পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় অপরাধ, তাই এ অপরাধী জাতি শাস্তির যোগ্য।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এটি ছিল ফেরাউনীদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আঃ)-এর বদ দোয়া।

فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ

আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর এ আরজী কবুল করে এরশাদ করলেন, যখন ফেরাউনীদের এ অবস্থা, তখন আমার মোমেন বন্দাদেরকে সেখান থেকে রাতের মধ্যেই সরিয়ে নিয়ে যাও তবে মনে রেখ, ফেরাউন এবং তার দল তোমাদের পিছু ধাওয়া করবে।

আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক হযরত মূসা (আঃ) ছয় লক্ষ বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে বের হয়ে পড়লেন, লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছে গেলেন, আল্লাহ পাকের নির্দেশে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করলে পানি দু'দিকে সরে যায়, বরফে পরিণত হয়ে পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে যায়, মাঝে শুষ্ক পথ তৈরী হয়, আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে হযরত মূসা (আঃ) নিরাপদে সমুদ্র অতিক্রম করলেন, আর সে সময়ের জন্যেই আলোচ্য আয়াতে আদেশ রয়েছেঃ

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۭ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ

'এবং সমুদ্রকে স্থির ছেড়ে দাও, নিশ্চয় এ সৈন্যবাহিনী ডুবে মরবে'।

অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) যখন পার হয়ে গেলেন, তখন তাঁর এ আশঙ্কা হলো যে, ফেরাউন ও তার দলবল এ পথে চলে আসবে এবং বনী ইসরাঈলের উপর হামলা করবে, তাই তিনি ইচ্ছা করলেন যে, পুনরায় লাঠির আঘাত করবেন যাতে সমুদ্র পূর্বাবস্থায় আসে এবং ফেরাউন ও তার দলবল তাদের প্রতি হামলা করতে না পারে। সে মুহূর্তে আল্লাহ পাক আদেশ দিলেন যে, সমুদ্রকে স্থির ছেড়ে দাও। আল্লাহ পাকের হেকমত বুঝবার ক্ষমতা কারোই নেই, ফেরাউন তার লক্ষ লক্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে যখন লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত হলো, তখন সে দেখলো, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে নিয়ে সবেমাত্র

সমুদ্র পার হয়ে গেছেন। সমুদ্রের মধ্যে নির্মিত পথটি সম্পূর্ণ নিরাপদ, তাই সে নিঃশঙ্ক চিত্তে ঐ পথ ধরে অগ্রসর হলো। তার সৈন্যবাহিনীর সর্বশেষ ব্যক্তিটি যখন সমুদ্রে প্রবেশ করলো, তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে দুদিকের জমাট বরফ পানি হয়ে হঠাৎ সজোরে একত্রিত হলো, লোহিত সাগর আবার লোহিত সাগরে পরিণত হলো, ফলশ্রুতিতে দাম্ভিক ফেরাউন তার লক্ষ লক্ষ সৈন্য সহ সমুদ্র বক্ষে নিমজ্জিত হলো। আল্লাহ পাকের রহমতে হযরত মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল জাতি ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত পেল। ফেরাউন ও তার দলবলের বাড়ী-ঘর, সকল আসবাবপত্র যাবতীয় সুখ-সমগ্রী সবই তারা ছেড়ে গেল, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ·

'তারা ছেড়ে গেছে কত বাগান, কত ঝর্ণা, কত শষ্য ক্ষেত্র এবং কত উত্তম বাড়ী-ঘর সমূহ'।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, নীল দরিয়ার দু' তীরে সারি সারি বাগানগুলো এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করে, মিশরবাসী অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতো, তাদের রাজা ফেরাউন সুদীর্ঘ চারশ বছর ধরে রাজত্ব করছিল, ফলে দম্ভ অহমিকা হয়ে পড়েছিল তার মজ্জাগত। জুলুম অত্যাচার ছিল তার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু যখন সে হযরত মূসা (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত হলোনা, বরং জুলুম-নির্যাতনে উদ্যত হলো, তখন আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হলো, শুধু একটি রাতের ব্যবধানে ফেরাউন ও তার দলবলের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটলো, গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের সব কিছু ছিল কিন্তু পরের দিন তাদের কিছুই রইল না, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ كم تركوا কত বাগ-বাগিচা, কত ঝর্ণা, কত মনোরম স্থান এবং কত নেয়ামত সমূহ তারা ফেলে চলে গেছে, তারা কত নেয়ামত ভোগ করতো, কিন্তু কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি।

وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿٢٧﴾ كَذٰلِكَ ۖ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ
نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ ۚ اِنَّهٗ
كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ
لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾
فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾ اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ ۖ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(২৭) আর সেসব সুখ-সম্পদ যা তাদেরকে আনন্দ দিত।

(২৮) এমনই ঘটেছিল, আর আমি তাদের যাবতীয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য জাতিকে।

(২৯) আসমান জমীন তাদের দুঃখে কাঁদেনি, আর তারা অবকাশও পায়নি।

(৩০) আর আমি নিশ্চয় বনী ইসরাঈল জাতিকে অত্যন্ত লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করেছিলাম।

(৩১) ফেরাউন থেকে, নিশ্চয় সে ছিল পরাক্রান্ত এবং সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(৩২) আর আমি জেনে শুনেই তাদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর চেয়ে অধিক পছন্দ করেছিলাম।

(৩৩) এবং তাদেরকে দান করেছিলাম এমন অনেক নিদর্শন, যাতে ছিল প্রকাশ্য পরীক্ষা।

(৩৪) নিশ্চয় তারা বলেই থাকে।

(৩৫) আমাদের এ প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এটি আর কিছুই নয় এবং আমাদেরকে পুনরুত্থিত হতে হবেনা।

(৩৬) অতএব, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে নিয়ে আস তো দেখি।

(৩৭) জিজ্ঞাসা করি তারা কি শ্রেষ্ঠ? নাকি তুব্বা্য জাতি ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, কেননা তারা ছিল পাপীষ্ঠ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এ আয়াতেও ফেরাউন ও তার দলবল যেসব সুখ-সামগ্রী ফেলে গেছে, সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ

আর যেসব সুখ-সম্পদ তাদেরকে আনন্দ দিত সবই তারা ফেলে চলে গেছে, কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি, তাদের সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ থেকে তারা চিরতরে বঞ্চিত হয়েছে।

كَذٰلِكَ

এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে–

(১) তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, এভাবেই তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়।

(২) আর কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, এর অর্থ হলো "এমনই ঘটেছিল" যা কিছু ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, ফেরাউন ও তার দলবলের সঙ্গে এমনই ঘটেছিল, অর্থাৎ তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল।

وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ

'আর আমি তাদের যাবতীয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য জাতিকে'। অর্থাৎ ফেরাউন ও তার দলবলের যাবতীয় সম্পদ এবং ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য এক কথায় সব কিছুই আমি বনী ইসরাঈলকে দান করি।

বর্ণিত আছে, ফেরাউন ও তার দলবল ধ্বংস হওয়ার পর বনী ইসরাঈল পুনরায় মিশরে ফিরে আসে এবং ফেরাউনীদের সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ

'আসমান জমীন তাদের দুঃখে কাঁদেনি, আর তারা অবকাশও পায়নি'।

অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সঙ্গীদের এ শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয় দেখে কারোই তাদের জন্যে আক্ষেপ হয়নি এবং তাদের ধ্বংসের জন্যে নির্ধারিত সময়েই তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, ক্ষণিকের জন্যেও তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি। তাদের জীবনেরও কোন গুরুত্ব ছিলনা, আর মরণেও তাদের জন্যে কারো আক্ষেপ হয়নি।

মোমেনের মৃত্যুতে আসমান জমীনের ক্রন্দণ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসে রয়েছে যে, যখন কোন মোমেনের মৃত্যু হয় তখন আসমান জমীন তার জন্যে কাঁদতে থাকে।

তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেন বন্দার জন্যে আসমানে দু'টি দ্বার রয়েছে, একটি দিয়ে মোমেন বন্দার নেক আমল উত্থিত হয়, আর একটি দিয়ে তার রিযক অবতীর্ণ হয়। যখন কোন মোমেনের মৃত্যু হয়, তখন ঐ দু'টি দ্বারই তার শোকে কাঁদতে থাকে, এমনিভাবে যে স্থানে মোমেন বন্দা নামায আদায় করে এবং আল্লাহ পাকের জিকর করে, জমীনের সে অংশ যখন তাকে না পায় তখন তার শোকে সে কাঁদে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকেও এ মর্মের হাদীস বর্ণিত আছে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, ৪০ দিন পর্যন্ত জমীন মোমেন ব্যক্তির জন্যে কাঁদতে থাকে। মুজাহেদ (রঃ) যখন এই হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন এক ব্যক্তি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করলো। মুজাহেদ (রঃ) বললেন, সোবহানাল্লাহ! এতে বিস্ময়ের কি আছে? যে বন্দা রুকু সেজদা দ্বারা জমীনকে আবাদ করতো, যে বন্দার তকবীর এবং তসবীহের আওয়াজ আসমান সর্বদা শ্রবণ করতো, যখন সে ব্যক্তির মৃত্যু হয় তখন আসমান জমীন সে ব্যক্তির জন্যে কাঁদতে থাকে। আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, ফেরাউন ও তাঁর দলবলের জন্যে আসমান জমীন কাঁদেনি, কেননা তাদের কোন নেক আমল আসমানে উত্থিত হয়নি। তফসীরকার কাতাদা (রঃ) একথাই বলেছেন, যদি ফেরাউন ও তার সঙ্গীদের কোন নেক আমল থাকত, তবে আসমান জমীন তাদের জন্যেও কাঁদত।[১]

এবনে জরীর হযরত শোরায়েহ এবনে উয়াইনাহ হাজরমীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ভ্রমণরত অবস্থায় যখন কোন মোমেনের ইন্তেকাল হয়, তখন কোন আপনজন তার কাছে থাকেনা, এমন অবস্থায় আসমান জমীন তার জন্যে ক্রন্দণ করে, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে এরশাদ করেন, কাফেরদের জন্যে আসমান জমীন ক্রন্দণ করেনা।

---

১. তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৫৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৮৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১২৪-২৫

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ○ مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ

'আর নিশ্চয় আমি বনী ইসরাঈলকে অত্যন্ত লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করেছি– ফেরাউন থেকে, সে অত্যন্ত বেশী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সে সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল'।

পূর্ববর্তী আয়াতে পাপীষ্ঠ ফেরাউন এবং তার দূরাত্মা দলবলের ধ্বংসের বিবরণ ছিল। আর এ আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথী বনী ইসরাঈল জাতির নাজাতের কথা রয়েছে। আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণের অনুসরণের মধ্যেই যে নাজাত এবং কল্যাণ রয়েছে তা ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

বনী ইসরাঈল জাতির নাজাত

ফেরাউন বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি সর্বদা জুলুম-অত্যাচার করতো, তাদেরকে বেগার খাটাতো, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রেখে দিত, অপমান-লাঞ্ছনা ছিল তাদের নিত্যসাথী। ফেরাউনের দোর্দন্ড প্রতাপের কারণে মজলুম বনী ইসরাঈলের ফরিয়াদ জানাবারও কোন স্থান ছিলনা। অকথ্য নির্যাতনের হাত থেকে আত্মরক্ষার কোন পথ ছিলনা, কেবল মৃত্যুর মাধ্যমেই ফেরাউনের জুলুম থেকে তারা নাজাত পেত। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের নাজাতের কথা ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ.

(নিশ্চয় আমি বনী ইসরাঈল জাতিকে এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করেছি।)

এটি ছিল বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। কেননা ফেরাউন ছিল অত্যন্ত অহংকারী, সীমা লঙ্ঘনকারী, জালেম, আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতিকে তার জুলুম থেকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনীদের চিরতরে ধ্বংস করেছেন।

মানুষের কল্যাণ সাধনের দু'টি পথ রয়েছে (এক) সকল প্রকার ক্ষতি ও অপকার থেকে রক্ষা করা। (দুই) তার উপকার করা। উপকারের চেয়ে অপকার থেকে রক্ষা করা উত্তম, আর এজন্যেই আল্লাহ পাক প্রথমে বনী ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের জুলুম অত্যাচার থেকে রক্ষা করার কথা ঘোষণা করেছেন এবং পরবর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির মর্যাদা বৃদ্ধির কথা এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.

'আর আমি জেনে শুনেই তাদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর চেয়ে অধিক পছন্দ করেছিলাম'।

বনী ইসরাঈল জাতি দু' হাজার বছর যাবত পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল। এ সময়ে তাদের মধ্যে চার হাজার নবী রসূল আগমন করেছিলেন। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

(সূরা বাকারাহ ঃ ১২২)

'হে বনী ইসরাঈল জাতি! আমি যে তোমাদেরকে নেয়ামত দান করেছি তা স্মরণ কর এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর ফজিলত দান করেছি'।

وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ

(এবং আমি তাদেরকে দান করেছিলাম এমন অনেক নিদর্শন যাতে ছিল প্রকাশ্য পরীক্ষা) যেমন লোহিত সাগরকে ফাঁক করে তাদের জন্যে পথ তৈরী করে দেয়া এবং ফেরাউনের জুলুম থেকে তাদের নাজাতের ব্যবস্থা করা এবং লোহিত সাগরের মাঝে প্রত্যেক গোত্রের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পথ করে দেয়া। সমুদ্র-গর্ভে নির্মিত বারটি পথের যাত্রীরা যেন একে অন্যকে দেখতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এমনিভাবে "তীহ" নামক উন্মুক্ত প্রান্তরে তাদের জন্যে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষার জন্যে ছায়ার ব্যবস্থা করা এবং তাদের খাবার হিসেবে 'মান্না সালওয়া'র আয়োজন করা।

আলোচ্য আয়াতের بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ বাক্যটির অর্থ হলো সুস্পষ্ট নেয়ামত। এ ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা (রঃ)।

এবনে যায়েদ বলেছেন, এর অর্থ হলো আনন্দ ও বিপদ উভয়টি দ্বারাই তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেনঃ

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৫)

'আর আমি তাদেরকে পরীক্ষা করবো ভাল ও মন্দ দ্বারা'।

কেননা বন্দার অবস্থা ভাল হলে তার কর্তব্য হলো আল্লাহ আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করা, আর অবস্থা মন্দ হলে সবর অবলম্বন করা। এই শোকর এবং সবরের জন্যে আল্লাহ পাক বন্দাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন। আর যদি নেয়ামত পেয়ে নেয়ামত দাতাকে কেউ ভুলে যায়, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে এবং বিপদে সবরও না করে তবে তা হবে চরম ব্যর্থতা।

অতএব, প্রকৃত বন্দার কাজ হলো কোন প্রকার নেয়ামত লাভ হলে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর আদায় করা, আর নেয়ামতের অভাব হলে সবর অবলম্বন করা এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের অপেক্ষায় থাকা, আদবের সঙ্গে দরবারে এলাহীতে হাযির হওয়া, কখনো অভিযোগ না করা।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ

'নিশ্চয় তারা বলেই থাকে',

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ

'আমাদের এ প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এটি আর কিছুই নয় এবং আমাদেরকে পুনরুত্থিত হতে হবেনা'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রসঙ্গক্রমে হযরত মূসা (আঃ) এবং বনী ইসরাঈলের কথা বর্ণিত হয়েছে আর এ আয়াত থেকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মুশরেকদের প্রসঙ্গ পুনরায় আলোচিত হয়েছে। কেননা, মক্কায় কাফের এবং ফেরাউনের দলবলের অবস্থা একই প্রকার ছিল, উভয় দলই পথভ্রষ্ট, উভয়ই আল্লাহর নবীর বিরোধিতায় তৎপর, তাই ফেরাউনের ধ্বংসের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে তাদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলতেন, এ জীবনই শেষ নয়; বরং এরপর আসবে আরেকটি জীবন, সে জীবনে প্রত্যেকটি মানুষকে তাদের এ জীবনের কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে, আর মৃত্যুই জীবনের শেষ পরিণতি নয়, এরপর পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কাফেররা একথা মেনে নিতে প্রস্তুত হতো না, তারা বলতো, এ মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদের জীবনের সকল সুখ দুঃখের অবসান ঘটবে, পুনরায় জীবিত হওয়ার কথা ভিত্তিহীন। তাই তারা মুসলমানদেরকে বলতো, যদি তোমাদের পুনরুত্থানের কথা সত্য হয় তবে আমাদের মৃত পূর্ব পুরুষদের জীবিত করে দেখাও। এরশাদ হয়েছেঃ

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আমাদের মৃত পূর্ব পুরুষদের জীবিত করে হাযির কর'।

মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্য একথা বলেছিল। পরবর্তী আয়াতে এর জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

'জিজ্ঞাসা করি তারা কি শ্রেষ্ঠ? নাকি তুব্যা জাতি ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, কেননা তারা ছিল পাপীষ্ঠ'।

মক্কার কাফেররা পুনর্জীবনকে অস্বীকার করে যে অহমিকাপূর্ণ মন্তব্য করেছে তারই জবাবে এরশাদ হয়েছে যে, ইয়ামনের অধিবাসী শক্তিধর তুব্যা জাতি, যাদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দিয়েছেন, তাদের চেয়ে কি মক্কাবাসী অধিকতর শক্তিশালী? অথচ আল্লাহ পাক তুব্যা জাতিকে তাদের অন্যায়-অনাচারের কারণে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তুব্যা জনৈক ব্যক্তির নাম ছিল, তার অনুসারী ছিল অনেক লোক, এজন্যেই তার এ নামকরণ করা হয়েছে।

কোন কোন ইতিহাস-বেত্তা বলেছেন, তুব্যা নামের অনেক লোক ছিল, যেহেতু একের পর এক তারা ক্ষমতাসীন হয়, এজন্যেই তাদেরকে 'তুব্যা' বলা হয়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তুব্যা মুসলমান ছিল সেজন্যে আল্লাহ পাকের মহান বাণীতে তার কোন সমালোচনা নেই, সমালোচনা রয়েছে তার জাতির, তারা ছিল অপরাধী।

وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ

আর যারা তাদের পূর্বে ছিল অর্থাৎ আদ ও সামুদ জাতি, এরা সকলেই কোপগ্রস্ত হয়েছে, আল্লাহ পাকের আযাব তাদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

কেননা তারা ছিল পাপীষ্ঠ। এমনিভাবে যদি মক্কার কাফেররাও পাপাচারে লিপ্ত থাকে তবে তাদের ধ্বংসও হবে অনিবার্য। যেমন ফেরাউন ও তার দলবল, তুব্যা জাতি এবং আদ ও সামুদ জাতি আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়েছে, তেমনি মক্কার কাফেরদেরকেও একই পরিণতি ভোগ করতে হবে।

وَمَا
خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا
بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ
مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا
هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾
اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ
فِي الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ
الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾

তরজমা

(৩৮) আর আমি আসমান সমূহ ও জমীন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি।

(৩৯) আর আমি উভয়কে কোন হেকমতের কারণেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

(৪০) নিশ্চয় মীমাংসার দিনই সকলের (বিনিময় প্রাপ্তির) নির্ধারিত সময়।

(৪১) যেদিন কোন বন্ধুই বন্ধুর কাজে আসবেনা, আর তারা কোন প্রকার সাহায্যও পাবেনা।

(৪২) তবে আল্লাহ পাক যার প্রতি দয়া করবেন, শুধু সে-ই রক্ষা পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, পরম করুণাময়।

(৪৩) নিশ্চয় জাক্কুম বৃক্ষই হবে

(৪৪) পাপীষ্ঠদের খাদ্য।

(৪৫) গলিত তাম্রের ন্যায় তা পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে।

(৪৬) ফুটন্ত পানির ন্যায়।

(৪৭) তাকে ধর এবং দোযখের মধ্যস্থলে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাও।

(৪৮) এরপর তার মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে তাকে শাস্তি দিতে থাক।

তফসীরুল কোরআন

মক্কার কাফেররা পুনরুত্থান ও কেয়ামতে বিশ্বাস করতো না, তাদের ধারণা ছিল এ জীবনের শেষ পরিণতি হলো মৃত্যু, এরপর আর কিছু নেই। তাই আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের এ ভুল ধারণা নিরসন-কল্পে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

'আর আমি আসমান সমূহ ও জমীন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক আসমান জমীন তথা সমগ্র বিশ্বকে অহেতুক ও অনর্থক সৃষ্টি করেননি; এ বিশাল সৃষ্টির পেছনে রয়েছে বিরাট উদ্দেশ্য, যদি কেয়ামত না হয়, যদি ভাল-মন্দের বিচারই না হয় তবে বিশ্ব-সৃষ্টি অহেতুক মনে হবে। স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা, তাঁর বন্দেগী করা হলো বিশ্ব মানবের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, এ প্রমাণ দেখার পরও যারা বিশ্বাস করেনা তাদের হবে শাস্তি, আর যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তাদের শুভ-পরিণতিই সুনিশ্চিত রয়েছে। ভাল মন্দের এ মূল্যায়নই হবে কেয়ামতের দিন। এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا.

'তোমরা কি একথা মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অযথাই সৃষ্টি করেছি? আদৌ তা নয়'। অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

'আর আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যে সৃষ্টি করেছি'। অতএব, কে বন্দেগী করলো? আর কে অবাধ্য হলো? তার বিচার হবে কেয়ামতের দিনে। যে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করে জীবন-যাপন করে তাকে সওয়াব প্রদান, আর যে নাফরমানী করে তার ব্যাপারে আযাবের বিধান কার্যকর করার জন্যেই কেয়ামতের ব্যবস্থা।

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা) এ সত্য উপলব্ধি করেনা এমনকি, এসব বিষয় চিন্তাও করেনা। অধিকাংশ লোক এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-সামগ্রীর সংগ্রহে এত ব্যস্ত থাকে যে পরকালীন জীবনের কথা কখনো স্মরণও করেনা। অথচ এ বিশাল আসমান জমীনের সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করলে, রাত ও দিনের ধারাবাহিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করলে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়, তাঁর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে মন আকৃষ্ট হয়। প্রতিনিয়ত দুনিয়াতে মানুষ আগমন করে এবং এখান থেকে বিদায়ও গ্রহণ করে, এ দৃশ্য দেখে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করা এবং পরকালীন জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে তৎপর হওয়া কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

চূড়ান্ত ফয়সালা হবে কেয়ামতের দিন

(নিশ্চয় মীমাংসার দিন সকলের (বিনিময় প্রাপ্তির) নির্ধারিত সময়) জীবন-সাধনার সাফল্য এবং ব্যর্থতা সেদিনই নির্ধারিত হবে। কোরআনে করীমে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে যা কিছু ঘোষণা করা হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিন সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, তাঁর প্রত্যেকটি কথার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হবে, কিন্তু সেদিন তাদের কোন উপায় থাকবে না।

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.

সেদিন এক বন্ধু আরেক বন্ধুর কাজে আসবে না, কেউ কারো কোন সাহায্য করতে পারবেনা, সেদিন হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা হবে। বাতিলপন্থীদেরকে সত্যপন্থীদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে, সেদিন তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

তবে যার প্রতি আল্লাহ পাক দয়া করেন, যে আল্লাহ পাকের রহমত লাভে ধন্য হয়, কেয়ামতের কঠিন দিনে তার ভাগ্যই সুপ্রসন্ন হবে। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেবেন অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআতে মাগফেরাত লাভ হবে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি যাকে আযাব দিতে ইচ্ছা করবেন, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবেনা, আর তিনি যাকে ক্ষমা করতে মর্জি করবেন কেউ তাকে বিপদগ্রস্ত করতে পারবেনা। তিনি পরম করুণাময়, তাঁর দয়া মায়ার কোন সীমা নেই।

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ○ طَعَامُ الْأَثِيمِ.

'নিশ্চয় জাক্কুম বৃক্ষই হবে পাপীষ্ঠদের খাদ্য'।

শানে নুযুল

সাঈদ এবনে মানসুর আবু মালেক (রহঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, 'আবু জেহেল মাখন এবং খেজুর নিয়ে তাদের মজলিশে আসতো এবং বলতো, 'জাক্কুম খাও' (খেজুর আর মাখনকে একত্রিত করে তাকে জাক্কুম বলা হতো)। এটি সেই জাক্কুম যার সম্পর্কে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে'। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। মূলতঃ জাক্কুম হলো দোযখের একটি বৃক্ষের নাম আর এটিই হবে দোযখবাসীদের খাদ্য।

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ○ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ.

'গলিত তাম্রের ন্যায় তা পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত পানির ন্যায়'।

কাফেরদের শাস্তির বিবরণ

আলোচ্য আয়াতে দোযখীদের শাস্তির কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। দোযখীরা যখন জাক্কুম খাবে তখন ফুটন্ত পানির ন্যায় তা পেটের ভেতর ফুটতে থাকবে, তাদের নাড়ি-ভুঁড়িগুলো পুড়ে শেষ করে ফেলবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যতখানি ভয় করা উচিত, যদি জাক্কুমের একটি ফোটা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয় তবে সমগ্র বিশ্ববাসীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাবে, তখন কি অবস্থা হবে সেসব লোকের, যাদের খাদ্যই হবে জাক্কুম, এতদ্ব্যতীত তাদের আর কোন খাদ্য থাকবে না।[১] (তিরমিজী, নাসায়ী এবনে মাজা)

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪০৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৫৭

তফসীরকার সাঈদ এবনে যোবায়ের বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে الاثيم (পাপীষ্ঠ) শব্দটি দ্বারা আবু জেহেলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ○ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ.

'তাকে ধর এবং দোযখের মধ্যস্থলে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাও, এরপর তার মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে তাকে শাস্তি দিতে থাক'।

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে দোযখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের প্রতি এ আদেশ হবে যে, কাফেরদেরকে দোযখের মধ্যস্থলে পৌঁছাও, এরপর তাদের মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দাও, এভাবে তাদেরকে শাস্তি দিতে থাক। আর একথাও বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাগণ লোহার হাতুড়ি দিয়ে তাদের মাথায় আঘাত করতে থাকবে।

ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ
تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥١﴾ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٢﴾
يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ
بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ
فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ
بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

তরজমা

(৪৯) (বলা হবে) আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে অত্যন্ত বড় সম্মানিত ক্ষমতাবান ব্যক্তি!

(৫০) নিশ্চয় এটি সেই দোযখ, যে সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করতে।

১. তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৬
জাক্কুম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১০৩-০৬

(৫১) নিশ্চয় পরহেযগার লোকেরা থাকবে নিরাপদ স্থানে।

(৫২) উদ্যান এবং ঝর্ণামালায়,

(৫৩) তারা সূক্ষ্ম, গাঢ় রেশমী পোষাক পরিধান করবে এবং একে অন্যের সম্মুখে বসবে।

(৫৪) এমনই হবে, অধিকন্তু আমি তাদেরকে ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা হুরীদেরকে জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে দান করবো।

(৫৫) নিশ্চিন্ত মনে তারা জান্নাতে সকল প্রকার ফলমূল আনতে বলবে।

(৫৬) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবেনা। আল্লাহ পাক তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন।

(৫৭) এসব কিছু আপনার প্রতিপালকের দান, এটিই বিরাট সাফল্য।

(৫৮) (হে রসূল!) আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(৫৯) অতএব, আপনি অপেক্ষা করুন, নিশ্চয় তারাও রয়েছে অপেক্ষমান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে দোযখের আযাবের বিবরণ ছিল, এ আয়াতেও একটু নতুন ভঙ্গীতে দোযখের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

'(বলা হবে) দোযখের শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে অত্যন্ত বড় সম্মানিত ক্ষমতাবান ব্যক্তি'।

আল্লামা বগভী (রঃ) তফসীরকার মোকাতেল (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, দোযখে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ কাফেরদের মাথায় এত জোরে আঘাত করবে যে, তাদের মাথা ফেটে যাবে এবং মগজ দেখা যাবে, তার উপর ফুটন্ত পানি ঢালবে এবং বলবে,

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

'আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো বড় সম্মানিত ব্যক্তি ছিলে'।

বর্ণিত আছে আবু জেহেল এভাবে দম্ভোক্তি করতো যে, আমি এ এলাকার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তি।

একরামা (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু জেহেলকে বলেছিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন তোমাকে জানিয়ে দেই যে, তোমার ধ্বংস অনিবার্য। আমি আবারো বলি, তোমার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আবু জেহেল তার আস্তিন গুটিয়ে বলেছিল, তুমি এবং তোমার সাথী (অর্থাৎ আল্লাহ

পাক) আমার কিছুই করতে পারবেনা, তুমি জান এ এলাকায় আমি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং সম্মানিত ব্যক্তি। অবশেষে আবু জেহেল বদরের যুদ্ধে নিহত হয়, আল্লাহ পাক তাকে অপমানিত করেন, তার দম্ভোক্তির জবাবে তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।[১]

إِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ

'এ হলো সেই শাস্তি যে সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করতে এবং ঝগড়া করতে'।

কাফেরদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করার পর ফেরেশতাগণ তাদেরকে একথা বলবেন। কেননা দুনিয়ার জীবনে তার হিসাব নিকাশের কথা; কেয়ামতের দিনের কথা এবং দোযখের শাস্তির কথা বিশ্বাস করতো না। আজ সে শাস্তি ভোগ কর, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ. (সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত-৬৩)

'এটিই সেই দোযখ, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে'।

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (পূর্বোক্ত ঃ আয়াত-৬৪)

'আজ তোমরা তাতে প্রবেশ কর, কেননা দুনিয়ার জীবনে তোমরা তাকে অবিশ্বাস করতে'।

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ

'নিশ্চয় পরহেযগার লোকেরা নিরাপদ স্থানে থাকবে'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেক বে-দ্বীন মুনাফেকদের শাস্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে, পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, যেখানে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয় সেখানে তার পাশাপাশি নেককার মোমেনদের পুরস্কারের সুসংবাদও দেয়া হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

জান্নাতের সুখ-সামগ্রী

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ

যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করে জীবন-যাপন করবে, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করবে, যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে সর্বদা বিরত থাকবে এক কথায় আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বন্দা হিসেবে জীবন-যাপন করবে তাদের জন্যে আলোচ্য আয়াতে এ সুসংবাদ রয়েছে যে, তারা অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে তথা জান্নাতে অবস্থান করবে। দুনিয়ার জীবনে সুখ-সামগ্রী সংগ্রহ করা যায়, আরাম-আয়েশের ব্যবস্থাও হয় কিন্তু কোন স্থানই নিরাপদ

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-২৫

নয়, বালা-মসিবত, দুঃখ দুর্দশা এখানে নিত্য সাথী, কিন্তু জান্নাতে কোন প্রকার ভয়-ভীতি থাকবেনা, এ নেয়ামত শুধু জান্নাতেরই বৈশিষ্ট্য।

فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ○ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ.

জান্নাতবাসীগণ সর্বদা মনোরম বাগানে বাস করবে, সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে, ঐ মনোরম পরিবেশে জান্নাতবাসীগণ রেশমী পোষাক পরিধান করবে। প্রত্যেকেই অন্যের প্রতি থাকবে সন্তুষ্ট, দুনিয়ার জীবনের ন্যায় হিংসা-বিদ্বেষ-শত্রুতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কলহ-দ্বন্দ্ব, অশান্তি-অকল্যাণ বলতে কিছুই থাকবেনা এবং শয়তানের ধোকার ভয়ও থাকবে না। একে অন্যের প্রতি থাকবে তারা প্রসন্ন। পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে, গল্প-গুজব করবে।

জান্নাতবাসীদের পোষাক

এবনে আবি হাতেম এবং এবনে আবিদ্দুনিয়া কা'বে আহবার (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জান্নাতের কোন পোষাক যদি দুনিয়ার কেউ পরিধান করে, তবে যে তা দেখবে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, কেননা এ চর্ম চক্ষু তার চমক সইবার শক্তি রাখেনা।

একরামা (রঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসীকে যে পোষাক পরিধান করানো হবে, তা ক্ষণিকের মধ্যে সত্তর বার বর্ণ পরিবর্তন করবে।

وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ

আর জান্নাতীবাসীগণকে ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা হুরীগণকে জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে দান করবো।

হুর প্রসঙ্গে

হুর এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক, যাদের সৌন্দর্য দেখলে চোখ ঝলসে যায়। عين অর্থাৎ ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা স্ত্রীলোক।

তেবরানী হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হুরদেরকে জাফরান দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকেও এ মর্মের হাদীস বর্ণিত আছে।

এবনে মোবারক (রঃ) যায়েদ এবনে আসলামের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক হুরদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেননি; বরং তাদের সৃষ্টির মাল-মশলা ছিল কস্তুরী, কাফুর এবং জাফরান।

এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন হুর সমুদ্রে থুতু নিক্ষেপ করে, তবে সমুদ্রের পানি মিষ্ট হয়ে যাবে।

এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যদি হুর তার হাত আসমান জমীনের মধ্যে প্রকাশ করে, তবে তার সৌন্দর্যের কারণে সমগ্র বিশ্ববাসী পাগল হয়ে যাবে। যদি হুর তার চেহারা দেখায় তবে আসমান জমীনের মধ্যকার পরিবেশ চমকদার হয়ে যাবে।[১]

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ

'তারা নিশ্চিন্ত মনে জান্নাতে সকল প্রকার ফলমূল আনতে বলবে'।

জান্নাতে সর্ব প্রকার পানাহারের প্রচুর ব্যবস্থা থাকবে, জান্নাতীগণ তাদের পছন্দনীয় ফলমূল আনতে বলবে। তারা নিশ্চিন্ত থাকবে, অর্থাৎ ফলমূল বা অন্য কোন নেয়ামত শেষ হয়ে যাওয়ার কোন আশঙ্কা থাকবেনা।

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার কোন কোন খাদ্য-দ্রব্য দ্বারা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত তথা অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিন্তু জান্নাতের কোন নেয়ামত দ্বারা এমন কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকবেনা, এ ব্যাপারে জান্নাতীগণ নিশ্চিন্ত থাকবে।

এবনে আবি হাতেম এবং এবনুল মুনজের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, দুনিয়াতে যত প্রকার ফল রয়েছে তা সুমিষ্ট হোক বা টক, এমন নয় যে তা জান্নাতে নেই (অর্থাৎ জান্নাতে সর্বপ্রকার ফলমূল রয়েছে)।

এবনে আবি হাতেম, এবনে জরীর এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জান্নাতে যেসব ফলমূল রয়েছে, দুনিয়াতে তা শুধু নাম মাত্রই রয়েছে।

জান্নাতীগণ যখনই যে কোন ফলের আকাঙ্খা করবে, সে সময় তা মওজুদ পাবে। একদিকে কোন কিছুর ইচ্ছা হবে, অন্যদিকে তা দেখতে পাবে।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

'প্রথম মৃত্যুর পর তারা আর সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবেনা, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন'।

জান্নাতবীগণ জান্নাতে চিরঞ্জীব হবে, কখনও তাদের মৃত্যু হবেনা।

জান্নাতীগণ চিরঞ্জীব হবে

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে চলে যাবে এবং দোযখীদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জান্নাত ও দোযখের মধ্যস্থলে মৃত্যুকে একটি দুম্বার আকৃতি দিয়ে হাযির করে জবেহ করা হবে। এরপর ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা চিরদিন জান্নাতে থাকবে,

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪০৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৫৯

তোমাদের নিকট কখনও মৃত্যু আসবেনা। আরও ঘোষণা করা হবে, হে দোযখীরা! তোমরা চিরদিন দোযখে থাকবে, আর কোন দিন মৃত্যু আসবেনা।[১]

জান্নাতীগণ চিরদিন সুস্থ থাকবে

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, জান্নাতীদেরকে বলা হবে, তোমরা চিরদিন সুস্থ থাকবে, কখনও অসুস্থ হবে না। সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনও তোমাদের মৃত্যু হবেনা। সর্বদা নেয়ামত লাভ করতে থাকবে, কখনও তা কম হবেনা। সর্বদা যুবক থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, (দুনিয়ার জীবনে) যে আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকবে সে জান্নাতে যাবে, সেখানে অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভ করবে। কখনও সে কারো মুখাপেক্ষী হবেনা, যেখানে সে চিরদিন বেঁচে থাকবে, কখনও তার মৃত্যু হবেনা, যেখানে তার পোষাক-পরিচ্ছদ কখনও ময়লা হবেনা এবং জান্নাতী ব্যক্তির যৌবন কখনও শেষ হবেনা।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করা হলো, জান্নাতী কি নিদ্রিত হবে? তিনি এরশাদ করেনঃ নিদ্রা হলো মৃত্যুর ভগ্নি, তাই জান্নাতবাসীগণ নিদ্রিত হবেনা, সর্বদা তারা আরাম-আয়েশে, আনন্দ-আহলাদে ব্যস্ত থাকবে।

وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

এ সমস্ত নেয়ামতের পাশাপাশি সব চেয়ে বড় নেয়ামত হলো আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীগণকে দোযখের আযাব থেকে নাজাত দিয়েছেন।

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ

এসব কিছু (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের দান। অর্থাৎ নেককার পরহেযগারদের জন্যে জান্নাতে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করা হবে, তা শুধু আল্লাহ পাকের দানই হবে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ পাকের প্রতি কারো কোন হক্ব নেই, বন্দার প্রতি সবই তাঁর দান।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন লোক তার আমলের কারণে জান্নাতে যাবেনা এবং দোযখ থেকেও পানাহ পাবেনা এমনকি, আমিও আমার আমলের কারণে জান্নাতে যাব না, শুধু আল্লাহ পাকের রহমতেই হবে জান্নাতে প্রবেশের তৌফিক। (মুসলিম শরীফ)

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

(এটিই বিরাট সাফল্য) কেননা সকল ক্ষতিকর বস্তু থেকে চির নাজাত পাওয়া এবং চির কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা এক মহান সাফল্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

---

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৫৯
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

'(হে রসূল!) আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহীদের দলিল বর্ণিত হয়েছে, এরপর যারা তৌহীদকে অবিশ্বাস করে তাদের উদ্দেশ্যে দোযখের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি জান্নাতীদের জন্যে অনন্ত অসীম নেয়ামতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর এ সূরার পরিসমাপ্তিতে পুনরায় পবিত্র কোরআন প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কোরআনের বিবরণ দ্বারা এভাবেঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

'নিশ্চয় আমি কোরআনে করীমকে নাযিল করেছি এক মোবারক রাতে'।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

যারা সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআন পেয়েছে অর্থাৎ আরববাসীগণ, তারা যাতে সহজে পবিত্র কোরআনকে বুঝতে পারে, তাই আমি কোরআনকে (হে রসূল!) আপনার ভাষায় (তথা আরবী ভাষায়) নাযিল করেছি, যেন তারা পবিত্র কোরআন দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, লাভ করতে পারে জীবন-চলার পথ-যা হলো সরল সঠিক পথ, যদি তারা পবিত্র কোরআন নির্দেশিত পথ গ্রহণ করে, তবে তা হবে তাদের বিরাট সাফল্য।

পক্ষান্তরে, যদি তারা পবিত্র কোরআন নির্দেশিত পথ গ্রহণ না করে, তবে তাদের ভাগ্য-বিপর্যয় অবধারিত, তবে এর জন্যে হয়তো কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ

'অতএব, (হে রসূল!) আপনি অপেক্ষা করুন, নিশ্চয় তারাও রয়েছে অপেক্ষমান'।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

অর্থাৎ (হে রসূল!) যেহেতু কাফেররা আপনার আহ্বানে সাড়া দেয়না, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা, তাই যেদিন তাদের প্রতি আযাব আপতিত হবে সেদিনের অপেক্ষা করুন, আর তারাও আপনার বিপদগ্রস্ত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো, (হে রসূল!) আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত, মক্কা বিজয় এখন শুধু সময়ের ব্যাপার, অতএব আপনি সে সময়ের অপেক্ষা করুন, তারাও তাদের ধারণায় অপেক্ষা করছে।

এ আয়াতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা এ মর্মে যে, (হে রসূল!) আপনার বিজয় অবশ্যম্ভাবী, আমি আমার নবী রসূলগণকে সাহায্য করে থাকি, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ. (সূরা মুজাদেলা ঃ ২১)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক লিখে দিয়েছেন যে, আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হবে।

আর অন্য আয়াতে রয়েছে,

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا (সূরা মোমেন ঃ ৫১)

'নিশ্চয় আমি আমার রসূলগণকে সাহায্য করবো'।

আর সেদিনের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

অবশেষে আল্লাহ পাকের সাহায্য এসেছিল বদরের যুদ্ধের ঐতিহাসিক দিনে এবং চূড়ান্ত বিজয় এসেছিল অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিনে। এভাবে আল্লাহ পাকের ওয়াদা মোতাবেক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম বিরাট সাফল্য লাভ করেছিলেন, কাফের মুশরেকরা সেদিন অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হয়েছে, পবিত্র কোরআনের ঘোষণা সেদিন বাস্তবে রূপ নিয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১৫/৬/৯৬ইং তারিখে বেলা ১১.০০টায় সূরা দুখানের তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! দয়া করে কবুল কর এ সাধনা এবং এ মহান তফসীর গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর, আমীন।

وصلي الله تعالي علي خير خلقه محمد وعلي اله واصحابه اجمعين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা জাসিয়াহ

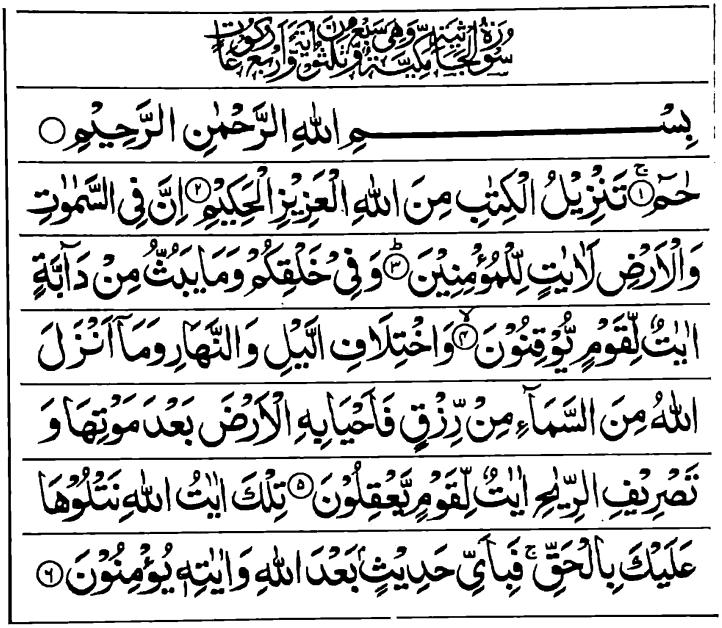
سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ وَثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ① تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ② اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ③ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ
اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ④ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ
تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑤ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ⑥

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

(১) হা-মীম।

(২) পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এই কিতাব অবতীর্ণ।

(৩) নিশ্চয় আসমান সমূহে ও জমীনে মোমেনদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

(৪) আর তোমাদের সৃজণে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে বহু নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকদের জন্যে যারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

(৫) আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আসমান থেকে তিনি যে বারি বর্ষণ করেন, যা দ্বারা মৃত ধরণীকে তিনি জীবিত করেন তাতেও এবং বায়ু পরিচালনার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

(৬) এসব আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ যা আমি (হে রসূল!) আপনার নিকট সঠিকভাবে আবৃত্তি করছি, অতএব আল্লাহ পাক এবং তাঁর আয়াতের স্থলে এমন কোন্ কথা রয়েছে যা তারা বিশ্বাস করবে?

সূরা জাসিয়াহ প্রসঙ্গে

একটি আয়াত ব্যতীত এ সূরা মক্কা অবতীর্ণ। এতে ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু, ৬৪৪ বাক্য এবং ২,৬০০ অক্ষর রয়েছে।

নামকরণ

এ সূরাকে 'সূরাতুস শরীয়াহ'ও বলা হয়।[১]

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে সূরা জাসিয়াহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এবনে মরদবিয়া হযরত যোবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরাতুস শরীয়াহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ সূরাকে 'সূরাতুস শরীয়াহ'ও বলা হয়।[২]

সূরা জাসিয়ার আমল

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে "সূরা জাসিয়াহ" লিপিবদ্ধ করে যদি তার দেহে বেঁধে রাখা হয়, তবে সর্ব প্রকার কষ্টদায়ক বস্তু থেকে নবজাত শিশুর হেফাজত করা হয়।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি এ সূরাকে স্বপ্নে পাঠ করতে দেখে, তার মধ্যে দুনিয়া-ত্যাগী ভাব সৃষ্টি হবে এবং সে পরহেযগার হবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার শেষে এমন গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে যা মানব জীবনের সাফল্যের কারণ হয়। এরপর একথা ঘোষণা করা হয় যে, কোরআনে করীমকে আরবী ভাষায় সহজ করে নাযিল করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, এরপরও যদি কেউ হেদায়েত কবুল না করে তবে তা সে ব্যক্তির দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আর এ প্রেক্ষিতেই সূরা জাসিয়ার প্রারম্ভে পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি সৃষ্টি জগতে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের যেসব বিস্ময়কর নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে ঈমান আনয়নের আহ্বান জানানো হয়েছে।

---

১. তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১৩৮
২. তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮

তফসীরুল কোরআন

حٰمٓ ○ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

হা-মীম। এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন।

পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি পরাক্রমশালী, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের পরিচালনার ব্যবস্থা করে থাকেন, যিনি সর্ব শক্তিমান তাঁর পক্ষ থেকেই মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

অতএব, পবিত্র কোরআনের গুরুত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা একান্ত কর্তব্য এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকর গুজার হওয়া পরিণামদর্শী মানুষ মাত্রেরই পবিত্র দায়িত্ব।

اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

'নিশ্চয় আসমান সমূহে ও জমীনে মোমেনদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে'।

মানুষ যদি ইচ্ছা করে যে সে সত্য উপলব্ধি করবে, অসত্যকে বর্জন করবে এবং সত্যের অনুসরণ করবে, তবে সমগ্র সৃষ্টি জগতে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের এবং তাঁর একত্ববাদের বহু নিদর্শন দেখতে পাবে। যারা সত্যকে মেনে নিতে চায়না, তারা আল্লাহ পাকের কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন সমূহও দেখতে পায়না, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ.

(সূরা আলে-এমরান ঃ ১৯০)

'নিশ্চয় আসমান জমীনের সৃজণে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে'।

এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, মোমেনদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে, অর্থাৎ যে মানতে চায়, যে সত্য উপলব্ধি করতে চায়, তার জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, শুধু বুদ্ধিমান হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং বুদ্ধির সঠিক প্রয়োগও একান্ত জরুরী, তদুপরি সত্যকে গ্রহণ করার আন্তরিক প্রয়াস অবশ্য কর্তব্য। যদি মানুষ আন্তরিকভাবে সত্যকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় তবে ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলে আল্লাহ পাকের কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন সে দেখতে পায়।

وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

'আর তোমাদের সৃজণে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে বহু নিদর্শন রয়েছে, সেসব লোকদের জন্যে, যারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে'।

স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের জীবন্ত সাক্ষী হলো বিশ্ব সৃষ্টি। স্বয়ং মানব সৃষ্টিও আল্লাহ পাকের অনন্ত ক্ষমতা, অসীম কুদরত হেকমতের জীবন্ত সাক্ষী। কিন্তু যদি কেউ এতদসত্ত্বেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক না হয়, তবে তা ঐ ব্যক্তির দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমনিভাবে সারা পৃথিবীতে যে জীব-জন্তু ছড়িয়ে রাখা হয়েছে এবং তাতে যে প্রকারভেদ রাখা হয়েছে এসবও আল্লাহ পাকের কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন। যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কেয়ামতের দিনের কথাও স্মরণ রাখে, তাদের জন্যে সমগ্র বিশ্ব-চরাচরে আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ও একত্ববাদের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

আর রাত ও দিনের পরিবর্তনেও রয়েছে আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন। যথা সময়ে, যথা নিয়মে আবহমানকাল থেকে এ পরিবর্তন সূচিত হয়ে আসছে, কখনও এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়না, সময়েরও কোন পরিবর্তন হয়না, কেননা এসব কিছু পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা সব কিছুই আল্লাহ পাকের অনুগত, তাঁর নির্দেশ পালনে ব্যস্ত, অতএব দিন ও রাতের পরিবর্তনে কখনও কোন প্রকার অনিয়ম হতে পারেনা। এসব কিছু দেখেও বুদ্ধিমান মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে পারে। এতে ঈমান আনয়নের সুযোগ রয়েছে, যে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সে ভাগ্যবান হয়, আর যে এসব দেখেও দেখেনা, যে সত্য উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়না, তার ভাগ্য-বিড়ম্বিত হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকেনা।

وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

'এবং আসমান থেকে তিনি যে বারি বর্ষণ করেন, যা দ্বারা মৃত ধরণীকে তিনি জীবিত করেন তাতেও এবং বায়ু পরিচালনার মধ্যেও বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে'।

আলোচ্য আয়াতের 'রিযক' শব্দটি বৃদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আল্লাহ পাকের হুকুমে আসমান থেকে জমীনে বৃষ্টিপাত হয়। আর বৃষ্টির ঐ পানি জমীনে জীবনী শক্তি আনয়ন করে, আল্লাহ পাকের হুকুমে বায়ু পরিচালিত হয়, ফলে মৌসুমের উষ্ণতা তাতে সামঞ্জস্য বিধান করে। মানুষ তো বীজ বপন করেই ক্ষান্ত হয়, কেবল বীজ বপনের মাধ্যমেই তার খাদ্য-দ্রব্য তৈরী হয়না, যেভাবে পানি সিঞ্চনে জমীন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি সূর্যের আলোকরশ্মি তাতে তাপ পৌঁছায়, এরপর আল্লাহ পাকের হুকুমে ঐ বীজটি গলে মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং চারা গাছে রূপ নেয় এবং মাটির বুক চিরে সে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, ডালা মেলে এবং তাতে ফলমূলের চিহ্ন দেখা দেয় এবং অবশেষে মানুষ জমীন থেকে উৎপন্ন ঐ বৃক্ষ থেকে তার খাদ্য গ্রহণ করে। এসব কিছু মানুষ আল্লাহ পাকের দানেই লাভ করে। যদি জমীন আল্লাহ পাকের হুকুমের অনুগত

না হতো, যদি আল্লাহর হুকুমে আসমান থেকে বৃষ্টিপাত না হতো, তবে মানুষের ফেলে আসা ঐ বীজ কি ফলপ্রসূ হতো? এসব বিষয়েই চিন্তা করে এবং আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত এবং নেয়ামত দেখে ঈমান আনয়নের আহ্বান জানানো হয়েছে।

اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

যারা বুদ্ধিমান, তারা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ পাকের কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পায় এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, কিন্তু যারা নির্বোধ তারা এসব দেখেও আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা।

সৃষ্টি জগতে স্রষ্টার নিদর্শন

আলোচ্য আয়াত সমূহে মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টির মাঝে তৌহীদের যে বিস্ময়কর নিদর্শন দেখা যায়, তা লক্ষ্য করার এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ রয়েছে। প্রথমেই এরশাদ হয়েছেঃ আসমান জমীনের নিদর্শনগুলোর প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর যেমন জমীনে আকাশচুম্বি পর্বতমালা, নদ-নদী, সমুদ্র এসব কিছু আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ (সূরা যারিয়াত ঃ ২০)

'আর জমীনে রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যে বহু নিদর্শন'।

এমনিভাবে, আসমানেও রয়েছে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বহু নিদর্শন। আধুনিককালে মহাশূণ্য সম্পর্কে গবেষণা চলছে, মহাশূণ্যচারী মানুষ চন্দ্রে অবতরণ করেছে এবং বৈজ্ঞানিকরা মঙ্গল গ্রহের চিত্র তুলে এনেছে। এ গবেষণা যত বেশী হতে থাকবে, ততই আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন দেখা যাবে।

বস্তুতঃ বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, বিশ্ব বস্তুর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে গবেষণা করে যা পাওয়া যায়, তাহলো সর্বত্র এক মহাশক্তির অদৃশ্য ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে, তিনি মহান আল্লাহ পাক, তাঁর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমেই মানুষ কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং এ সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, আসমান জমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের দান। এ দানের জন্যে মহান দাতা আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ

এসবই আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ, যা আমি (হে রসূল!) আপনার নিকট সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দিচ্ছি, যদি তারা এসব কিছু না মানে, তবে এরপর আর কিসের উপর ঈমান আনবে? এসব ব্যতীত আর কোন্ কথা রয়েছে, যার প্রতি তারা ঈমান আনবে? তাদেরকে বলা হয়েছে আসমান জমীনের উপর দৃষ্টিপাত কর, বলা হয়েছে

বিশাল বিস্তৃত আকাশকে অবলোকন কর, আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা সমূহ দেখ এবং এর পাশাপাশি নিজের সৃষ্টির প্রতিও লক্ষ্য কর।

وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ ، اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ.

'এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের, একত্ববাদের বহু নিদর্শন রয়েছে, তা কি তোমরা দেখছ না'?

মানব জীবনের শৈশব-কৈশোর-যৌবন এবং বার্ধক্যের এ পরিবর্তন কার হুকুমে হয়? এতে মানুষের কি কোন ইচ্ছা কার্যকর হয়? যদি তা হতো, তবে হয়তো কেউ যৌবন ছেড়ে বার্ধক্য বরণ করতে প্রস্তুত হতো না।

আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, একটি মানব শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে কত অসহায় থাকে, তার বাকশক্তি, শ্রবণ শক্তি, বিবেক বুদ্ধি, দৈহিক শক্তি কিছুই তো থাকেনা, সে অবুঝ এবং দুর্বল থাকে এবং মল-মূত্র ত্যাগ করা পর্যন্ত তার পক্ষে সম্ভব হয়না, এমন অসহায় অবস্থা থেকে আল্লাহ পাকই তাকে নাজাত দেন; ধীরে ধীরে তাকে শক্তিশালী করেন, আল্লাহ পাকের করুণা-বৃষ্টির কারণেই ঐ অসহায় শিশুটি একদিন বিখ্যাত গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মানব জাতির এ ধারাবাহিক উন্নতি-অগ্রগতি, প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি যে এক আল্লাহ পাকেরই দান এবং করুণাময়ের করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়, এ সত্য উপলব্ধি করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। পবিত্র কোরআন কত সুন্দরভাবে একথাটি বলেছে–

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. (সূরা নাহল ঃ ৭৮)

'এবং আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে মাতৃ-গর্ভ থেকে বের করে আনেন, এমন অবস্থায় যে, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। এরপর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে শ্রবণের জন্য কর্ণ, দর্শনের জন্য চক্ষু দান করেছেন এবং উপলব্ধি করার জন্য অন্তর দান করেছেন, হয়তো তোমরা তাঁর হুজুরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে'। মূলতঃ এমনিভাবেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাকের কৃপা ও দয়ায় শূণ্যের তিমিরান্ধকার থেকে অস্তিত্ব ও বাস্তবতার আলোর জগতে আগমন করে।

এমনিভাবে সূরা মূলকে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ، قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ.

'(হে রসূল!) ঘোষণা করুন, নিখিল সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদেরকে শ্রবণের জন্য কর্ণ এবং দর্শনের জন্য চক্ষু এবং

উপলব্ধি করার জন্য অন্তর দান করেছেন। তোমাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ'।

এমনিভাবে সূরা বালাদে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ○ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ○ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ.

অর্থাৎ "আমি কি মানুষের চক্ষুদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বা সৃষ্টি করে ভাল ও মন্দ এবং ডান বাম উভয় পথের পরিচয় দান করিনি"?

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের এসব কুদরত হেকমত দেখার পর, তাঁর এত সব দান ভোগ করার পর কোন বিবেকবান মানুষের পক্ষে তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হওয়া সম্ভবই নয়, আর এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ.

'অতএব, আল্লাহ পাকের এসব নিদর্শন দেখার পর এমন কোন্ কথা রয়েছে, যার প্রতি তারা ঈমান আনবে'?

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝٧ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا
كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٨ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا
اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٩ مِّنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ
وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١٠ هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ
عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝١١

তরজমা

(৭) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীষ্ঠের জন্যে দুর্ভোগ,

(৮) আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ শ্রবণ করে, যা তার সম্মুখে পঠিত হয়, এতদসত্বেও সে দম্ভ-ভরে হঠকারিতা করে, যেন সে তা শ্রবণই করেনি, তাকে সুসংবাদ দাও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

(৯) আর যখন সে আমার কোন আয়াত সম্পর্কে অবগত হয় তখন সে তা নিয়ে পরিহাস করে, এমন লোকদের জন্যেই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

(১০) তাদের পেছনে রয়েছে দোযখ, তাদের কৃতকর্ম কোন উপকারেই আসবেনা। যাদেরকে তারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে অভিভাবক স্থির করেছিল, তারা কাজে আসবেনা, তাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি।

(১১) এটি (পবিত্র কোরআন) হেদায়েত মাত্র, আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত ভয়ংকর শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রথমে বিশ্ব-সৃষ্টিতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের যেসব নিদর্শন রয়েছে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে, এরপর জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, এ সমস্ত নিদর্শন সমূহ দেখেও যারা ঈমান আনেনা, তারা আর কী দেখে ঈমান আনবে? কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাফেররা ঈমান আনেনি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করা এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি বিদ্রুপ করাই যেন ছিল তাদের কাজ। তাই আলোচ্য আয়াতে এ দূরাত্মা কাফেরদের সম্পর্কে কঠিনতম শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

শানে নুযুল

সে যুগে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নজর এবনে হারেস নামক এক ব্যক্তি ছিল। সে পুরনো কিচ্ছা-কাহিনীর বই-পুঁথি সংগ্রহ করতো এবং মক্কাবাসীকে নিয়ে বৈঠক করে ঐ কল্প-কাহিনীগুলো শুনিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রাখত। তার উদ্দেশ্য ছিল, এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে লোকেরা যেন পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতে না পারে। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টায় সে এ অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। নজর এবনে হারেস সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবু জেহেল অথবা নজর এবনে হারেস সম্পর্কে, সে পবিত্র কোরআনকে উপহাস করতো।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে যে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তা শুধু নজর এবনে হারেস বা আবু জেহেলের জন্যে নয়; বরং এ পৃথিবীতে যখন এবং যেখানে, যে বা যারা পবিত্র কোরআনকে উপহাস করবে, তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই এ কঠিনতম শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। এ জঘন্য অপরাধের শাস্তি অবধারিত।[১]

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

১. তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১৪২
তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২৬১
তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪২০
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪১১

প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীষ্ঠের জন্যেই দুর্ভোগ, কঠিনতম শাস্তি।

ويل শব্দটির অর্থ কঠিনতম শাস্তি, দোযখের একটি স্থানের নাম।

যারা পবিত্র কোরআনের প্রতি উপহাস করে, দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে, তাদের জন্যে "ওয়াইল" দোযখের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

যারা মিথ্যাবাদী, পাপীষ্ঠ, দ্বীন-দ্রোহী, সত্যের দুশমন, পবিত্র কোরআনের প্রতি বিদ্রুপকারী, অহংকারী তাদের জন্যে দোযখের কঠিনতম শাস্তি অপেক্ষা করছে।

يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

'আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণ করে যা তার সম্মুখেই পঠিত হয়, এতদসত্বেও দর্পভরে সে হঠকারিতা করে যেন সে তা শ্রবণই করেনি, অতএব তাকে সুসংবাদ দাও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির'।

নজর এবনে হারেস বা এমনি অন্যান্য দূরাত্মা কাফেরদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম শ্রবণ করতো এবং সত্যের উপলব্ধিও ছিল, কিন্তু তবু তারা অহংকারের কারণে এবং জেদের বশবর্তী হয়ে শ্রবণ না করার এবং না জানার ভান করতো। এমন দূরাত্মা কাফেরদেরকে কঠিনতম শাস্তির সুসংবাদ দাও।

যদিও শাস্তির সুসংবাদ হয়না, কিন্তু তাদের দুর্গতির অবস্থা ব্যক্ত করার জন্যে এবং দূরাত্মা কাফেরদের প্রতি উপহাস স্বরূপ।

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ .

'আর যখন সে আমার আয়াতের কোন কিছু জানতে পারে তখন তাকে বিদ্রুপ করে, এমন লোকদের জন্যেই রয়েছে অপমানজনক শাস্তি'।

যদি কোরআনে করীমের কোন অংশ তারা পেয়ে যায় তার তা মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকেনা, তখন তারা পবিত্র কোরআনের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে থাকে। তাদের মনে রাখা উচিত, যেভাবে তারা দুনিয়াতে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার অবমাননা করেছে, ঠিক তেমনি আখেরাতে হবে তাদের অপমানজনক শাস্তি।

مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

'তাদের পেছনে রয়েছে দোযখ, তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন উপকারে আসবেনা, আর আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে তারা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছিল, তারাও উপকারী হবেনা, তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর আযাব'।

কাফেরদের গন্তব্যস্থল-দোযখ

যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে তার অবমাননা করে, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের পেছনে দোযখ রয়েছে, দুনিয়া থেকে বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। মৃত্যু-পথের যাত্রীকে মানুষ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিতে দেখে, কিন্তু তার গন্তব্যস্থল কোথায় তা কেউ জানেনা, প্রত্যেকে তার আপনজনকে বিদায় করে শোক-সন্তপ্ত অবস্থায়, সকলেই তখন শোকে মুহ্যমান থাকে, এদিকে যাত্রীর পরিণতি কী হয় তার খবর কেউ রাখেনা, রাখতে পারেনা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, কাফেরদের গন্তব্যস্থল হলো দোযখ। দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করাই তাদের কাজ, আর তখন কেউ তাদের কোন সাহায্য করতে পারবেনা। তাদের জীবনের কৃতকর্ম, তাদের অর্জিত সম্পদ, তাদের সঞ্চিত বৈভব এককথায় কোন্ কিছুই তাদের জন্যে উপকারী হবেনা। এমনকি, তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত যেসব ঠাকুর-দেবতাদেরকে ডাকত তারাও কোন কাজে লাগবেনা, আর এমন কাফেরদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।

পূর্বোল্লেখিত আয়াতে রয়েছে, "তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি"। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে "ভয়ংকর শাস্তি"। এর তাৎপর্য হলো কাফেরদের শাস্তি শুধু অপমানজনকই হবেনা, বরং অত্যন্ত ভয়ংকরও হবে।

هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ

'এটি (কোরআন) হেদায়েত মাত্র, আর যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত ভয়ংকর শাস্তি'।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআন হলো সম্পূর্ণ হেদায়েত, সরল সঠিক পথের সন্ধান দেয় পবিত্র কোরআন। এটি চির-শান্তি, চির নাজাতের পথ-নির্দেশনা দেয়, মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করে পবিত্র কোরআন। এটি হলো শান্তি ও কল্যাণ-পথের দিশারী। কিন্তু এতদসত্বেও যারা পবিত্র কোরআন মানবেনা, আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন সমূহকে দেখেও অস্বীকার করবে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করবে তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ع اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ
فِیْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا
فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ
لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾ قُلْ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَغْفِرُوْا لِلَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ
اَیَّامَ اللّٰهِ لِیَجْزِیَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۱۴﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَیْهَا ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ
اٰتَیْنَا بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ
وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۶﴾ ع وَاٰتَیْنٰهُمْ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْۤا
اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًۢا بَیْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ
یَقْضِیْ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیْمَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۷﴾

তরজমা

(১২) আল্লাহ পাকই সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন যেন তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ সমূহ চলাচল করতে পারে এবং তোমরা যেন তাঁর দানের অন্বেষণ করতে পার, আর যাতে তোমরা তাঁর শোকর গুজার হও।

(১৩) আর তিনিই আসমান জমীনের সব কিছুকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে।

(১৪) (হে রসূল!) আপনি মোমেনদেরকে বলে দিন, তারা যেন সেসব লোককে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ পাকের মোয়ামেলায় বিশ্বাস রাখেনা, তিনি যে একটি জাতিকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করতে চান।

(১৫) যে সৎ কাজ করে তা সে তার কল্যাণের জন্যেই করে, আর যে মন্দ কাজ করে তার পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে, এরপর তোমাদের সকলকে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে।

(১৬) আর আমি নিশ্চয় বনী ইসরাঈল জাতিকে কিতাব, কর্তৃত্ব এবং নবুওয়্যত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে উত্তম রিযক দিয়েছিলাম, আর তাদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর অধিকতর মর্যাদা দান করেছিলাম।

(১৭) আর তাদেরকে আমি দ্বীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম, কিন্তু তারা জেনে শুনেই হিংসাবশতঃ পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করেছে। (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক কেয়ামতের দিন সেসব বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহের বিবরণ ছিল যা দ্বারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ প্রমাণিত হয়। এরপর যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদকে অস্বীকার করে, দ্বীন ইসলামের বিরোধিতা করে পবিত্র কোরআনকে উপহাস করে তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে পুনরায় আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের আলোচনা করা হয়েছে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ

মহান আল্লাহ পাক বিশাল সমুদ্রগুলোকে মানুষের আয়ত্বে এনে দিয়েছেন, মানুষ আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়ে সমুদ্রের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করছে, সাগরের বুক চিরে উত্তাল তরঙ্গের মোকাবেলা করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, পণ্য-সম্ভার নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমনা-গমন করছে। সমুদ্রের অতল-গর্ভ থেকে মৎস্যসহ অনেক সামুদ্রিক জীব-জন্তু শিকার করছে এবং অনেক মূল্যবান মণি-মুক্তা আহরণ করছে। এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান আর এ সমস্ত দানের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য, আর এ কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"হয়তো তোমরা শোকরগুজার হবে" –আর একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে যে, আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যেই রয়েছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ। আসমান-জমীনে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ পাক সব কিছুকেই মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ

আর তিনি আসমান জমীনের সব কিছুকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা মানুষের কল্যাণার্থে যথা নিয়মে যথা সময়ে আল্লাহ পাকের হুকুমে পরিভ্রমণ করে

চলেছে, ঠিক এমনিভাবে পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের উপকারার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর মানুষকে আধিপত্য দান করেছেন, নিঃসন্দেহে এসব কিছুই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান, আর এসবের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ পাকের অসংখ্য কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন, তাই মানুষের কর্তব্য হলো মহান দাতা আল্লাহ পাকের দানকে উপলব্ধি করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও অনুগত হওয়া। এ সমস্ত কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রিয় এবং পছন্দনীয় হতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের যে অসংখ্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে তা উপলব্ধি করে শুধু চিন্তাশীল লোকেরা। যারা কোন বিষয় চিন্তা করতে পারেনা, যারা নির্বোধ তারা এসব কিছু দেখে কিছুই শেখে না, কিছুই বোঝেনা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে, যারা চিন্তা করে, যারা ভেবে দেখে। অবশ্য এ চিন্তা করার তৌফিকও আল্লাহ পাকের দানেই লাভ করা যায়।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি মোমেনদেরকে বলে দিন, তারা যেন সেসব লোককে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ পাকের মোয়ামেলায় বিশ্বাস রাখেনা, তিনি যে একটি জাতিকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করতে চান'।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় গিফারী গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-কে গালি দিয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তার উপর হামলা করার ইচ্ছা করেছিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি মোমেনদেরকে বলুন, যারা আল্লাহ পাকের মোয়ামেলায় বিশ্বাস রাখেনা, তাদেরকে যেন মাফ করে দেয়, যেন আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে তাদের কার্যাবলীর প্রতিফল দান করেন'।

অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহর রহমতের আশা রাখেনা, আল্লাহর আযাবের পরোয়াও করেনা, বিশেষতঃ মোমেনদের জন্যে আল্লাহ পাক যে সাফল্য রেখে দিয়েছেন সে সম্পর্কেও তারা বিশ্বাসী নয়। আর এটিই হলো আল্লাহ পাকের মোয়ামেলা।

যারা আল্লাহ পাকের এ মোয়ামেলায় বিশ্বাস করেনা, তাদের বিচার আল্লাহ পাকের হাতে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আল্লাহ পাকই তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দেবেন এবং যথাযোগ্য বিচার করবেন, তাই মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে গালি দেয় বা নির্যাতন করে, তাদের থেকে তাৎক্ষণিকভাবে যেন প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হয় এবং তাদের বিচার আল্লাহ পাকের নিকট সোপর্দ করা হয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বগভী (রঃ) তফসীরকার কারযী এবং সুদ্দী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জেহাদের আদেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে মক্কায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থান কালে কাফেররা মুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতো, এ পরিস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমীপে বিষয়টির উল্লেখ করেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এরপর জেহাদের হুকুম আসে, ফলে এ আয়াত মনসুখ হয়ে যায়, কেননা দুশমনদের বিরুদ্ধে যখন জেহাদের হুকুম হয় তখন তাদেরকে আর ক্ষমা করার অবকাশ ছিলনা।[১]

لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

কাফেরদের নির্যাতনে মুসলমানগণ যে সবর অবলম্বন করছিলেন, এজন্যে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে অশেষ সওয়াব দান করতে মর্জি করেছেন। এজন্যে কাফেরদেরকে ক্ষমা করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

অথবা এর অর্থ হলো, কাফেরদেরকে ক্ষমা করার নির্দেশ এজন্যে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে পুরোপুরি শাস্তি দিতে চান, তাই নির্দেশ হয়েছে তোমরা তাদের জুলুমের প্রতি-উত্তর দিয়োনা। তোমরা যদি দুনিয়াতে তাদের শাস্তি বিধান কর, তাহলে আখেরাতে তাদের শাস্তি হালকা হয়ে যাবে। অতএব, দুনিয়াতে তাদের শাস্তি দিয়োনা।

অথবা আলোচ্য আয়াতের قوم শব্দ দ্বারা মুসলমান ও কাফের উভয় জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমন অবস্থায় অর্থ হবে, যে ভাল কাজ করে, আল্লাহ পাক তাকে পুরস্কৃত করবেন, আর যে মন্দ কাজ করবে, তাকে শাস্তি দেবেন। এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো, لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ বাক্যটির অর্থ কি?

তফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেররা সে সময়ের আশা করেনা, যে সময়ে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে সাহায্য করার জন্যে নির্ধারিত করেছেন। এমন এক দিন আসবে, যেদিন মক্কার বুকে কাফেরদের হাতে নির্যাতীত এ মুসলমানগণই আল্লাহর রহমতে দেশের ক্ষমতা লাভ করবেন। কিন্তু কাফেররা সেদিনের আগমনে বিশ্বাস করেনা, তাই আল্লাহ পাক তখনকার মত কাফেরদেরকে ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪১৩

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে বনীল মোস্তালিকের যুদ্ধের সময়। মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এবনে উবাই তার একটি গোলামকে কূপ থেকে পানি আনার জন্যে প্রেরণ করে। কূপে তখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর গোলাম সহ অনেক মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। এবনে উবাইয়ের গোলামের পানি নিতে তাই বিলম্ব হয়।

আবদুল্লাহ এবনে উবাই তাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে কারণ দর্শায়, তখন আবদুল্লাহ এবনে উবাই হযরত ওমরের (রাঃ) নাম ধরে গালি দেয়। হযরত ওমর (রাঃ) যখন তা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তরবারি হস্তে তাকে সমুচিত শাস্তি দেয়ার জন্যে বের হলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, "যারা একথা বিশ্বাস করেনা যে একদিন আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন এবং বিজয় দান করবেন, তাদেরকে মাফ করে দাও"।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, মক্কার একজন কাফের হযরত ওমর (রাঃ)-কে গালি দিয়েছিল, হযরত ওমর (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

মায়মুন এবনে মেহরান বর্ণনা করেন, যখন এ আয়াত–

مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا (সূরা বাকারা ঃ ২৪৫)

(কে আল্লাহ পাককে করজে হাসানা দেবে, তথা কে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সৎ কাজে ব্যয় করবে) নাযিল হয়, তখন ফখাজ নামক এক ইহুদী অত্যন্ত বেআদবীপূর্ণ মন্তব্য করে বলেছিল, احتاج رب محمد মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিপালক অভাবগ্রস্ত হয়েছে (নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক)।

দূরাত্মা ইহুদীর এ আপত্তিকর মন্তব্যের খবর পেয়ে হযরত ওমর (রাঃ) তরবারি হস্তে বের হয়েছিলেন, যেন তার সঠিক বিচার করেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লোক মারফত তাঁকে ফিরিয়ে আনেন।

لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ মোমেনদেরকে একথা বল যে, তারা কাফেরদেরকে যেন আপাততঃ কোন শাস্তি না দেয়। কেননা আল্লাহ পাক তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন।[১]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا

যে ভাল কাজ করবে, সে তার উপকারার্থেই করবে। আর যে মন্দ কাজ করবে, তার শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। যারা আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করে অন্যায়কারীকে ক্ষমা করবে, তার শুভ পরিণতি সে লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যারা প্রিয়নবী

১. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২৯৩

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দেয় তারা অবশ্যই তার শাস্তি ভোগ করবে।

নেক আমলই উপকারী হবে

আলোচ্য আয়াতে এ মূলনীতি ঘোষণা করা হল যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তার ঈমান ও নেক আমলই উপকারী হবে। আর কুফরী ও নাফরমানী হবে তার জন্যে চরম ক্ষতির কারণ। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে নেক আমলের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং বদ আমলের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. (সূরা বাকারা ঃ ২৪৫)

'এরপর সকলকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে'।

দুনিয়ার জীবনে সুখ বা দুঃখ, সম্পদ বা দারিদ্র্য যে অবস্থাই থাকুক না কেন কোনটাই স্থায়ী নয়, প্রত্যেককে এখানকার সব কিছু ফেলে যেতে হবে আল্লাহ পাকের দরবারে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব হবে সেখানে, পরিণামদর্শী মানুষ মাত্রকে এ সত্যটি স্মরণ রাখার তাগিদ করেছে পবিত্র কোরআন।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

'আর আমি নিশ্চয় বনী ইসরাঈল জাতিকে কিতাব, কর্তৃত্ব এবং নবুওয়্যত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে উত্তম রিযক দিয়েছিলাম, আর তাদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর অধিকতর মর্যাদা দান করেছিলাম'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহের বিবরণ ছিল। মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের উল্লেখ ছিল। আর তা এজন্যে ছিল, যেন মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

আর এ আয়াতে বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, দিয়েছেন অনেক নেয়ামত, কিন্তু এ হতভাগা জাতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে কৃতজ্ঞ হয়নি, তাঁর প্রদত্ত হেদায়েত গ্রহণ করেনি এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীকেই তাদের জাতীয় চরিত্র হিসেবে অবলম্বন করেছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

আর নিশ্চয় আমি বনী ইসরাঈলকে দান করেছি কিতাব অর্থাৎ তৌরাত, কর্তৃত্ব, সাম্রাজ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং দান করেছি তাদেরকে নবুওয়্যত অর্থাৎ তাদের মধ্যে

অনেক নবী রসূল প্রেরণ করেছি। শুধু তাই নয়; তাদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছি।

আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহকে দু' ভাগে বিভক্ত করা যায় (১) দুনিয়ার নেয়ামত, (২) আখেরাতের নেয়ামত। দুনিয়ার নেয়ামত থেকে আখেরাতের নেয়ামত উত্তম, এজন্যে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম আখেরাতের নেয়ামতের উল্লেখ করেছেন। আসমানী কিতাব তৌরাত, এলম, হেকমত, আল্লাহ পাকের মারেফাত এবং নবুওয়্যত। এরপর দুনিয়ার নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেনঃ

وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ

'আমি তাদেরকে দান করেছি উত্তম রিযক'।

আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন ও তার দলবলের সমস্ত সম্পত্তি ও সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেছেন, আর ময়দানে তীহে অবস্থান কালে তাদের রিযক হিসেবে আসমান থেকে "মান্না সালওয়া" অবতরণ করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, এরশাদ হয়েছেঃ

وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

'আর আমি তাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর অধিকতর মর্যাদা দান করেছি'।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকারগণ এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, সে যুগের মানুষের উপর তাদেরকে ফজিলত দেয়া হয়েছে। কেননা তাদের আমলে তারাই ছিল সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। আসমানী কিতাব হিসেবে তৌরাত, ইঞ্জিল তাদেরই নিকট নাযিল হয়েছে, তাদের ওলামাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। দু' হাজার বছরে তাদের মধ্যে চার হাজার নবী এসেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তাদের যুগে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তারাই ছিল পছন্দনীয় এবং সম্মানিত।

কোন কোন তফসীরকার একথাও বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الْعٰلَمِيْن শব্দটির মধ্যে ফেরেশতাগণ অর্ন্তভুক্ত রয়েছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের নবীগণকে ফেরেশতাদের উপরও মর্যাদা দান করেছেন।[১]

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۢ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ

আর তাদেরকে আমি দ্বীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম, কিন্তু তারা জেনে শুনেই হিংসাবশতঃ পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলকে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দান করেছেন, বহু মোজেযা তাদেরকে দেখানো হয়েছে, এমনকি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব এবং তাঁর যাবতীয় নিদর্শন সম্পর্কে

১. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২৬৪-৬৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪১৪

তাদেরকে অবগত করানো হয়েছে। তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। তাদের সন্তান-সন্ততি যেমন তাদের নিকট পরিচিত ছিল, ঠিক এমনি পরিচিত ছিলেন সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বনী ইসরাঈল তাদের হিংসা-বিদ্বেষ, জেদ ও হঠকারিতা অব্যাহত রাখে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে, তারা তাঁর শত্রু হয়ে যায়। তাদের এ শত্রুতা ছিল হিংসা-প্রসূত, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যে দলাদলি ফেরকাবাজী হয়, তা কোন সুদৃঢ় দলিলের ভিত্তিতে ছিলনা, বরং পরস্পরের জেদ, স্বার্থরপরতা-লোভ-লালসা, আত্মম্ভরীতাই ছিল এর কারণ। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

'(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক কেয়ামতের দিন সেসব বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো'।

অর্থাৎ কে সত্যের উপর রয়েছে, আর কে মিথ্যার উপর তার চূড়ান্ত ফয়সালা হবে কেয়ামতের দিন। আল্লাহ পাক হক্ব-পন্থীদেরকে সওয়াব দান করবেন, আর বাতিল পন্থীদের দেবেন শাস্তি। যারা আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে, তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় ছটোছুটি করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদের বিচার করবেন।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَ
اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾
هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْ
حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢١﴾

তরজমা

(১৮) (হে রসূল!) এরপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের একটি বিধানের উপর, অতএব আপনি তার অনুসরণ করুন এবং মূর্খ লোকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।

(১৯) নিশ্চয় তারা আল্লাহ পাকের মোকাবেলায় আপনার কোন উপকারই করতে পারবেনা, আর নিশ্চয় পাপীষ্ঠরা একে অন্যের বন্ধু, আর আল্লাহ পাক পরহেযগার লোকদের অভিভাবক।

(২০) এই পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুস্পষ্ট দলিল, আর যারা আল্লাহ পাকের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে তাদের জন্যে এই কোরআন হলো হেদায়েত এবং রহমত।

(২১) যারা মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে, তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে জীবনে মরণে সেসব লোকদের ন্যায় করে দেব, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে? তারা কত জঘন্য দাবী করছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, বনী ইসরাঈল জেনে শুনে শুধু জেদের বশবর্তী হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করেছে, তারা ভালভাবেই জানত যে তিনি সত্য নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাদের নিকট প্রেরিত আসমানী গ্রন্থ তৌরাত, ইঞ্জিলে তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে, তবু তারা তাঁর বিরোধিতা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। এরপর তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের মতবিরোধের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে।

আর আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

'(হে রসূল!) এরপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের একটি বিধানের উপর তথা শরীয়তের উপর, অতএব আপনি তার অনুসরণ করুন এবং মূর্খ লোকদের প্রবৃত্তির অনুসারী হবেন না'।

অর্থাৎ (হে রসূল!) অন্যান্যরা পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ এবং ফেরকাবন্দীতে লিপ্ত রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ পাক আপনাকে একটি শরীয়ত বা বিধানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ জীবন-বিধানই মানব জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে তথা শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। জীবন-সাধনার সার্থকতার জন্যে, জীবন সংগ্রামে পরিপূর্ণ সাফল্যের জন্যে, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত শরীয়ত বা জীবন বিধানের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন অপরিহার্য কর্তব্য।

فَاتَّبِعْهَا

(হে রসূল!) আপনি আল্লাহ পাক প্রদত্ত এই বিধানের বাস্তবায়ন করুন, আক্ষরিক ভাবে তা পালন করে চলুন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আদেশটি যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু মূলতঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে উম্মতকে, কেননা আল্লাহ পাকের নবী কখনো তাঁর আদেশ অমান্য করেন না, তাই তাঁকে বলে প্রকারান্তরে উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর এজন্যে পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

'এবং মূর্খ লোকদের ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির অনুসারী হবেন না'।

অর্থাৎ দূরাত্মা কাফেররা আপনাকে দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করতে থাকবে, কিন্তু আপনি কখনও এ মূর্খ লোকদের কথায় কর্ণপাত করবেন না, আপনি আপনার মহান আদর্শের উপর অটল-অবিচল থাকুন।

বর্ণিত আছে যে, কোরায়শ সর্দাররা কখনো কখনো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বলতো, আপনার পূর্ব পুরুষদের ধর্মে ফিরে আসুন, আমরা পূর্বেও আপনাকে মানতাম, এখনও মানবো। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের এসব প্রতারণামূলক কথাবার্তা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যে, (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের এসব কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, আপনি আল্লাহর তরফ থেকে আপনার জন্যে নির্দেশিত পথে সুদৃঢ় থাকুন।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

(নিশ্চয় তারা আল্লাহ পাকের মোকাবেলায় আপনার কোন উপকারই করতে পারবেনা) তাই তাদের কথা মেনে চলা আপনার জন্যে চরম ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

وَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

'আর নিশ্চয় পাপীষ্ঠরা একে অন্যের বন্ধু'।

যারা আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে, যারা সীমা লঙ্ঘন করে এবং যারা পাপীষ্ঠ, তারা পরস্পরের বন্ধু, তারা প্রকৃত মোমেনের বন্ধু নয়, প্রকৃত মোমেনের বন্ধু হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ

'আর আল্লাহ পাকই মোত্তাকী পরহেযগার লোকদের বন্ধু, অভিভাবক'। যেমন সূরা বাকারায় (আয়াত ঃ ২৫৭) এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'যারা ঈমানদার, আল্লাহ পাক তাদের বন্ধু'। মোত্তাকী পরহেযগারদের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকেরই সাথে, যার বন্ধু বা অভিভাবক এক আল্লাহ পাক, তার কোন ভয় নেই, তার কোন দুশ্চিন্তা নেই।

তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ.

(সূরা ইউনুস ঃ ৬২)

'সতর্ক হও, যারা আল্লাহর বন্ধু হয়, যারা বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বন্ধুত্ব লাভের গৌরব অর্জন করে তাদের কোন ভয় নেই, তাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই'।

মানব-জীবনে শরীয়তের বিধানের প্রয়োজনীয়তা

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ.

আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানব জীবনের জন্যে একটি বিধান প্রবর্তন করেছেন। এ বিধানের নামই "শরীয়ত" আর এ বিধানের পরিপূর্ণ অনুসরণের নির্দেশই দিয়েছেন আল্লাহ পাক। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানব জীবনে শরীয়তের এ বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা ব্যক্তি-মানুষের আশা-আকাঙ্খা এবং প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন, স্বভাবগত কারণেই যখন প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে তার লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হবে, তখন পরস্পরের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহও হওয়া অস্বাভাবিক নয়, তাই মানব-জীবনে শান্তি-শৃংখলা এবং সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজন হলো এমন বিধানের যা ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে রচিত হবে, যা হবে পরিপূর্ণ রহমত এবং যা সর্বপ্রকার ব্যক্তি-স্বার্থের স্পর্শ থেকে পবিত্র থাকবে। আর একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে যে এমন বিধান মানুষের দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভব নয়, কেননা মানুষের দুর্বলতা প্রতি পদে পদে। মানুষ তার নিজের প্রবৃত্তির তাড়না থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও মুক্ত হতে পারেনা, তাই এমন বিধান আসতে হবে শুধু স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে।

যুগে যুগে নবী রসূলগণ মানব জাতির কল্যাণের জন্যে আল্লাহ পাকের এমন বিধানই এনে দিয়েছেন। বিশেষতঃ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ও বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ ও উন্মেষ সাধনের প্রয়োজনে এ বিধানই নিয়ে এসেছেন, যা পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নায় বিধৃত রয়েছে, আর এটিই ইসলামী শরীয়ত যার বাস্তবায়নে মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয় এবং জীবন-সাধনার সাফল্য হয় সুনিশ্চিত।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর মদীনা মোনাওয়্যারার জীবনের দশটি বছরে শরীয়তের এ বিধান জারি

করেছিলেন, ফলে মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান হয়েছিল। এরপর খোলাফায়ে রাশেদীন শরীয়তের ঐ বিধানের পুরোপুরি অনুসরণে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, ফলে তদানীন্তন পৃথিবীর এক চতুর্থাংশে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছিল, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মানবতার বিকাশ সাধিত হয়েছিল, এটি ছিল ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়নের বরকত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনসুরণের এবং পবিত্র কোরআনের অনুশীলনের বাস্তব ফলশ্রুতি।

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

'এই কোরআন মানব জাতির জন্যে সুস্পষ্ট দলিল এবং যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হেদায়েত এবং মানব জাতির প্রতি তাঁর রহমত'।

পরম সাফল্য লাভের চাবিকাঠি

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনেই রয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়, এতেই রয়েছে মানবতার উৎকর্ষ সাধনের কথা, জ্ঞান এবং বুদ্ধির কথা, জীবন-সাধনার পরম সাফল্যের কথা। যারা পবিত্র কোরআনের অনুশীলন করে, যারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে তারাই হেদায়েত লাভ করে তথা সরল সঠিক পথ লাভ করে এবং তারাই আল্লাহ পাকের রহমত লাভে ধন্য হয়। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে পরম সাফল্য লাভের এটিই হলো চাবিকাঠি।

ইমাম তাবারী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ

هٰذا الكتٰب الذى انزلنٰه اليك.

(হে রসূল!) আমি আপনার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছি, এর মাধ্যমে মানুষ হক্ব ও বাতিল তথা সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাবে এবং হেদায়েতের পথ পাবে।

তফসীরকার এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো এ মহান গ্রন্থে রয়েছে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ, যাবতীয় শিক্ষা এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হেদায়েত এবং তাঁর অফুরন্ত করুণা ও রহমত। যারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে গ্রহণ করবে, তারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্য লাভ করবে, অবশ্য এর জন্যে পূর্বশর্ত হলো একীন বা নিশ্চিত বিশ্বাস। বলাবাহুল্য ঈমান এবং একীন ব্যতীত পবিত্র কোরআন দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়না। পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত পেতে হলে, এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের রহমত লাভে ধন্য হতে হলে ঈমান ও একীন পূর্বশর্ত।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۭ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

'যারা মন্দ কাজ লিপ্ত হয়েছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে জীবনে মরণে সেসব লোকদের ন্যায় করে দেব, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে? তারা কত জঘন্য দাবী করছে'।

শানে নুযূল

মক্কার কাফেরদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমানদেরকে বলেছিল, যেভাবে তোমরা বলছো যে কেয়ামত হবে, যদি কেয়ামত হয়ই তবে তোমরা দেখবে যে, আখেরাতেও আমরা তোমাদের চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকব, যেমন দুনিয়াতে রয়েছি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লামা আলুসী (রঃ) তফসীরকার কালবী (রঃ)-এর সূত্রে এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কাফেরদের মধ্য থেকে ওতবা, শায়বা এবং ওলীদ এবনে ওতবা হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আমীরে হামজা (রাঃ) সহ কয়েকজন মোমেনের নিকট উপরোক্ত উক্তি করেছিল।[১]

মোমেন ও কাফেরের পরিণতি এক হতে পারেনা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের বিধানের একটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে, তা হলো সৎ ও অসৎ, ভাল ও মন্দ, পাপীষ্ঠ এবং পূণ্যাত্মা কখনও এক হতে পারেনা। উভয়ের সঙ্গে একই ব্যবহার হওয়া সম্ভব নয়, এ জীবনেও নয়, পরজীবনেও নয়। পাপীষ্ঠ এবং পূণ্যাত্মার জীবন ধারা এক নয়, তাই তাদের কর্মফল বা পরিণতিও এক হতে পারেনা। যেমন কর্ম তেমনই হয় ফল। এর ব্যতিক্রম হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়ছে, যারা পাপীষ্ঠ, যারা সর্বদা থাকে মন্দ কাজে লিপ্ত, তারা কি এই ধারণা করেছে যে আল্লাহ পাক নেককার মোমেনদের সঙ্গে যে ব্যবহার করবেন, তাদের সঙ্গেও তা করা হবে? যদি করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা হবে অবিচার, আর আল্লাহ পাক কখনো অবিচার করেন না। এটি আল্লাহ পাকের শানের বরখেলাফ। দুনিয়াতে অর্থ-সম্পদ, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য প্রভৃতিতে ক্ষেত্রবিশেষে কাফের ও মোমেন এক সমান হতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর পর তথা আখেরাতে সম্মান এবং নাজাত লাভে মোমেন ও কাফের কখনও এক সমান বিবেচিত হবেনা, মোমেন আল্লাহ পাকের প্রিয়, কাফের অপ্রিয় এবং কোপগ্রস্ত, অতএব উভয়ে কখনও এক সমান হতে পারেনা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহেদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কাফেররা কি এই ধারণা করেছে যে, তাদের জীবন ও মৃত্যু মোমেনদের জীবন ও মরণের ন্যায় হবে? তা কখনো হতে পারেনা, কেননা কাফেররা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ অবস্থায় জীবন-যাপন করে আর ঐ অবস্থায়ই হয় তাদের মৃত্যু। কিন্তু মোমেন যত দিন দুনিয়াতে থাকে, আল্লাহ পাকের অনুগত এবং তাঁর বন্দেগীরত অবস্থায় থাকে, আল্লাহ পাকই হন তার বন্ধু এবং অভিভাবক, অতএব পরকালীন জীবনে কখনো কাফেরদের অবস্থা মোমেনদের ন্যায় হবে না।[২]

---

১. তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১৫১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩২১
২. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২৬৭

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যেভাবে 'ববুল' বৃক্ষে (কাঁটাযুক্ত একটি বৃক্ষ) আঙ্গুর ধরেনা, এমনিভাবে বদকার লোক কখনও নেককার লোকের মর্তবা পায়না।

এবনে এসহাক তাঁর সীরাত গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কা'বা শরীফের ভিত্তি স্থাপনের সময় একটি শিলাখন্ড পাওয়া গিয়েছিল, তাতে লিপিবদ্ধ ছিল, তোমরা মন্দ কাজ করে শুভ পরিণতির আশা কর এর দৃষ্টান্ত হলো এমন, যেমন কেউ কোন কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ থেকে আঙ্গুর পেতে চায়।

তেবরানীতে সংকলিত বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত তামীমে দারী (রাঃ) একবার সারা রাত নামাযের মধ্যে আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করতে থাকেন এবং রুকু সেজদা করতে থাকেন, আর ক্রন্দণ করতে থাকেন। এরপর বলেন, আল্লাহ পাক আসমান জমীনকে ন্যায়-বিচারের সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন, তিনি প্রত্যেককে তাঁর কর্মের বিনিময় দান করবেন, তাঁর পক্ষ থেকে সামান্যতম জুলুমও করা হবেনা।[১]

سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

'তারা কত জঘন্য দাবী করছে'।

কাফেররা আখেরাতে মোমেনদের চেয়ে ভাল অবস্থানে থাকবে বলে যে ভিত্তিহীন উক্তি করে, তা কত জঘন্য এবং কত অবাস্তব, অলীক, ভিত্তিহীন এবং কল্পনা-প্রসূত তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা।

অর্থাৎ যা তারা কল্পনা করছে তা অত্যন্ত মন্দ এবং জঘন্য।

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৬৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪১৭

وَ
خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ
عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ
يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ
مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ
مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

তরজমা

(২২) আর আল্লাহ পাকই আসমান সমূহ এবং জমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল লাভ করে, আর তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবেনা।

(২৩) (হে রসূল!) আপনি কি সে ব্যক্তির অবস্থা লক্ষ্য করেছেন? যে নিজের প্রবৃত্তিকে তার উপাস্য সাব্যস্ত করেছে, আর আল্লাহ পাক তাকে (সত্য-উপলব্ধির) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, তার কর্ণ ও অন্তরের উপর মোহর করে দিয়েছেন, আর তার চক্ষুর উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহ পাক গোমরাহ করার পর কে তাকে হেদায়েত করবে? তবু কি তোমরা ভেবে দেখনা?

(২৪) এবং তারা বলে, আমাদের এ জীবন ব্যতীত আর কিছুই নেই, আমরা মরি, আমরা বাঁচি, কালের হাতেই আমাদের মৃত্যু ঘটছে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা তো শুধু মনগড়া কথা বলে।

(২৫) আর যখন তাদের সম্মুখে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের এতদ্ব্যতীত কোন যুক্তি থাকেনা যে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে উপস্থিত কর।

(২৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, এরপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন যেদিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ নেক ও বদ, সৎ ও অসৎ কখনও এক সমান হতে পারেনা, ঠিক তেমনি মোমেন ও কাফেরের পরিণতিও এক প্রকার হতে পারেনা। মোমেন লাভ করবে তার ঈমান ও নেক আমলের শুভ-পরিণতি, আর কাফের ভোগ করবে তার কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি, এটিই স্রষ্টার অমোঘ বিধান, এটিই চিরন্তন নিয়ম, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের জন্যে এ নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, এ বিশাল বিশ্ব জগৎকে তিনি অহেতুক সৃষ্টি করেননি এবং প্রত্যেকটি মানুষকে তার ভাল বা মন্দ কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

(আর আল্লাহ পাকই আসমান সমূহ এবং জমীনকে সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে) অর্থাৎ সব কিছু যেমনটি হওয়া উচিত ছিল, তেমনই তিনি সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ এ বিশাল বিশ্বকে আল্লাহ পাক অযথা সৃষ্টি করেননি, এ সৃষ্টির পেছনে রয়েছে হেকমত-নিগূঢ় রহস্য, যারা সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে, দিন ও রাতের পরিবর্তনকে লক্ষ্য করে, এ বিশাল নীলাভ আকাশ কিভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে তা দেখে বিস্মিত হয়, তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا. (সূরা আলে-এমরান ঃ ১৯১)

'হে পরওয়ারদেগার! তুমি এ বিশ্ব জগৎকে অহেতুক সৃষ্টি করনি'।

তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব জগৎকে। সুনীল আকাশের ছাদ থেকে আরম্ভ করে, ধরার ধূসর শয্যা পর্যন্ত সব কিছুতেই রয়েছে সেই মহান স্রষ্টার বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের অগণিত জ্বলন্ত প্রমাণ, উজ্জ্বল নিদর্শন। চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, আলো-বাতাস, আগুন-পানি, দিবা-রাত্রি, সকাল-সন্ধ্যা এর কোন্‌টিতে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ নেই? এর কোন্‌টি আল্লাহ পাকের অপূর্ব সৃষ্টি-নৈপূণ্যের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত নয়? এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

'আর আল্লাহ পাকই আসমান সমূহ এবং জমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন'।

হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! তোমাদের বন্ধ চক্ষু উন্মীলিত কর, মনের কপাট উম্মুক্ত কর, সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং একত্ববাদে বিশ্বাস কর, সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টি যেভাবে আল্লাহ পাকের অনুগত হয়ে আছে, ঠিক তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর। আসমান জমীনের কোন কিছুই আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিধান অমান্য করেনা, অতএব হে আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতি! তুমিও আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করোনা, মনে রেখ এমন সময় আসবে, যখন প্রত্যেককে তার কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তাই পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

'যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল লাভ করে, আর তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবেনা'।

বস্তুতঃ এ জীবন ও জগৎ অহেতুক নয়; আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার কর্মের বিনিময় দান করবেন, আর তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবেনা, অর্থাৎ নিরপরাধীকে শাস্তি দেয়া হবেনা বা যার যে শাস্তি প্রাপ্য, তার চেয়ে অধিকতর শাস্তি তাকে দেয়া হবেনা, এমনিভাবে কারো প্রাপ্য সওয়াব কম দেয়া হবেনা, প্রত্যেককে সওয়াব বা আযাব ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে, কারো প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবেনা।

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ

'(হে রসূল!) আপনি কি দেখেছেন সে ব্যক্তির অবস্থা? যে তার প্রবৃত্তিকেই উপাস্য সাব্যস্ত করেছে, আর আল্লাহ পাক তাকে (সত্য-উপলব্ধির) জ্ঞান থাকা সত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, তার কর্ণ ও অন্তরের উপর মোহর করে দিয়েছেন, আর তার চক্ষুর উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ) এবং কাতাদা (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন, কাফেররা তাদের প্রবৃত্তিকে নিজেদের প্রভূ রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে, তাদের মন যা চায় তাই তারা করে, ভাল-মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা। জ্ঞান বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, কুপ্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়েই তারা জীবন-যাপন করে, আল্লাহ পাকের প্রতি তাদের ঈমান নেই, তাই আল্লাহ পাককে তারা ভয় করেনা, আর যে কাজ থেকে আল্লাহ পাক মানুষকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তারা তা থেকে বিরত থাকেনা। এবনে জরীর এবং এবনে মনসুর বর্ণনা করেন এবং আল্লামা বগভী (রহঃ) সাঈদ এবনে যোবায়ের (রহঃ)-এর তরফ থেকেও এ বর্ণনার

উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আরবরা পাথরের পূজা করতো, কখনো স্বর্ণ রৌপ্যের পূজাও করতো, যখন পূর্বের পূজনীয় পাথর থেকে সুন্দর কোন পাথর দেখতো তখন পূর্বের পাথরটিকে ফেলে দিতো এবং নতুনটির পূজা আরম্ভ করতো, এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

عَلٰى عِلْمٍ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলেন যে, তাদের মধ্যে হেদায়েত গ্রহণ করার যোগ্যতা নেই, তাই তিনি তাদেরকে হেদায়েত থেকে মাহরূম করেছেন।

অথবা এর অর্থ হলো তাদের সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ পাক জানতেন তারা পথভ্রষ্ট হবে।

হযরত আবু আবদুল্লাহ (রাঃ) যখন মৃত্যু-শয্যায় তখন লোকেরা তাঁকে দেখতে গেলেন, তিনি তখন ক্রন্দনরত ছিলেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছিঃ আল্লাহ পাক কিছু রুহকে ডান হাতে নিয়েছেন আর কিছু রুহকে বাম হাতে নিয়েছেন, এরপর এরশাদ করেছেন, এগুলো এর জন্যে (জান্নাতের জন্যে) আর এগুলো এর জন্যে অর্থাৎ দোযখের জন্যে, আর আমি কারো পরোয়া করি না। সাহাবী আবু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি জানিনা আমি কোন্ মুঠোয় ছিলাম।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে ব্যক্তির অবস্থা বর্ণিত হয়েছে সে হলো নজর এবনে হারেস। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ কুখ্যাত ব্যক্তিটি হলো আবু জেহেল। আর কারো কারো মতে, সে ছিল হারেস এবনে কায়েস।[২]

যে পথভ্রষ্ট ব্যক্তির কথা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তার আরো দুর্গতির কথা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ

অর্থাৎ তার কর্ণ এবং অন্তরের উপর মোহর করে দেয়া হয়েছে এজন্যে সে হক্ব কথা শ্রবণই করেনা, তার অন্তর মোহরাঙ্কিত থাকার কারণে সত্য কথা সম্পর্কে সে চিন্তাও করেনা।

وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً

আর তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন, তাই সে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের নিদর্শন সমূহ দেখতে পায় না।

কান এবং অন্তর মোহরাঙ্কিত হওয়া বা চক্ষুর উপর পর্দা পড়া সূচনাতেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হয়নি; বরং যেহেতু তারা সত্য গ্রহণের এসব মাধ্যমকে ব্যবহার

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪১৮-১৯
২। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪২১

করেনি, কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজেকে পরিচালিত করেছে, যে দৃষ্টিতে দেখলে সত্যকে গ্রহণ করা যায় সে দৃষ্টিতে দেখেনি, যেভাবে শ্রবণ করলে সত্য উপলব্ধি করা যায় সেভাবে শ্রবণ করেনি, তাই বলা হয়েছে যে তাদের কর্ণকে মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে। কখনো অন্তর দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেনি তাই ঘোষণা করা হয়েছে তাদের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে। যখন তাদের অবস্থা এমন, তখন কে তাদেরকে হেদায়েত করবে? আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে এমন অবস্থায় কে তাদেরকে হেদায়েত করবে?

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

তবু কি তোমরা ভেবে দেখেবে না? মানুষ যদি দেখেও না দেখার ভান করে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা শ্রবণ না করে, কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, নিজের সর্বনাশ যে পথে রয়েছে সে পথই অবলম্বন করে, এতে এমন ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য কিন্তু তবু কি তোমরা এ বিষয়টি ভেবে দেখবে না?

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

'আর তারা বলে, আমাদের এ জীবন ব্যতীত আর কিছুই নেই, আমরা মরি, আমরা বাঁচি। কালের ঘূর্ণিচক্রেই আমাদের মৃত্যু ঘটছে, বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো শুধু মনগড়া কথা বলে'।

শানে নুযুল

এবনে জরীর এবং এবনুল মুনজের হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বর্বরতার যুগে কাফেররা বলতো, কালের ঘূর্ণিচক্রের কারণেই মানুষের মৃত্যু হয়, আমাদের এ জীবনই সব কিছু, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং আখেরাতের জীবন বলতে কিছুই নেই। জীবন ও মরণ সব কিছু এখানেই, কাফেরদের এ ভিত্তিহীন কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। বস্তুতঃ কাফেররা জীবনের তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাদের ভ্রান্ত ধারণা হলো কালের ঘূর্ণিচক্রেই মানুষ পৃথিবীতে আসে, জীবন লাভ করে এবং ঐ একইভাবে মানুষের জীবনের অবসান ঘটে।

যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে, যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হয়না এবং এ জীবনকেই সব কিছু মনে করে তারাই এমন ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে। তারা কালের দোহাই দেয়, তাদের বিশ্বাস কালই সব কিছু করে অথচ এটি অত্যন্ত ভিত্তিহীন কথা, কেননা জীবন ও মৃত্যু একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিতেই হয়ে থাকে। পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই হয় এমনকি, কালের বিবর্তনও আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই হয়, যেমন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কালচক্রকে মন্দ বলোনা, কেননা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকই কাল। (মুসলিম শরীফ)

আল্লামা বগভী (রহঃ) একখানি হাদীসে কুদসীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে বনী আদম, তুমি কখনো কালকে গালি দিওনা প্রকৃতপক্ষে কালতো আমিই, রাত এবং দিনকে আমিই পরিচারনা করে থাকি, যদি আমি ইচ্ছা করি তবে এ দিন রাতের গতিকে বন্ধ করে দিতে পারি।

এই হাদীসের তাৎপর্য হলো, কোন যুগকে মন্দ বলার কারণ এই যে, সে যুগে বিপদাপদ আসে অথচ যুগের কারণে কোন বিপদ আসেনা, বিপদাপদ আসে আল্লাহ পাকের হুকুমে, অতএব যুগকে মন্দ বলা মূলতঃ আল্লাহ পাককেই মন্দ বলা হয় আর এজন্যেই যুগকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

'আর যখন তাদের সম্মুখে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের এতদ্ব্যতীত কোন যুক্তি থাকে না যে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্ব পুরুষদের উপস্থিত কর'।

কাফেরদের সম্মুখে যখন পবিত্র কোরআনের আয়াত পাঠ করা হতো, অথবা কেয়ামতের কথা আলোচনা করা হতো তখন তারা তা অস্বীকার করতো, তাদের বক্তব্যের পক্ষে কোন যুক্তি প্রমাণও হাযির করতে পারতো না এমন অবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে তারা বলতো, তোমরা যে পুনরুত্থান ও কেয়ামতের কথা বলছো তা যদি সত্য হয় তবে ইতোপূর্বে আমাদের যে পূর্ব পুরুষদের মৃত্যু হয়েছে তাদেরকে পুনর্জীবন দান করে আমাদের সম্মুখে হাযির কর, শুধু তখনই আমরা বুঝবো যে তোমাদের কথা সত্য এবং আখেরাতের জীবনও সত্য।

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন আল্লাহ পাকই জীবন দান করেন আর যখন ইচ্ছা তখন তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, আর কেয়ামতের দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, কেননা এটি আল্লাহ পাকের ঘোষণা যা অবশ্যই ঘটনায় পরিণত হবে। যিনি ইতোপূর্বে সৃষ্টি করেছেন, জীবন দান করেছেন তিনি পুনরুজ্জীবন দানেও সক্ষম। তাঁর হাতেই রয়েছে সকলের জীবন ও মরণের ক্ষমতা, আর তাঁর মহান দরবারেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে সকলকে, কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য উপলব্ধি করেনা, আর তারা এ কথাও বোঝে না যে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করতে পারবেন।[১]

১. তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২৭১

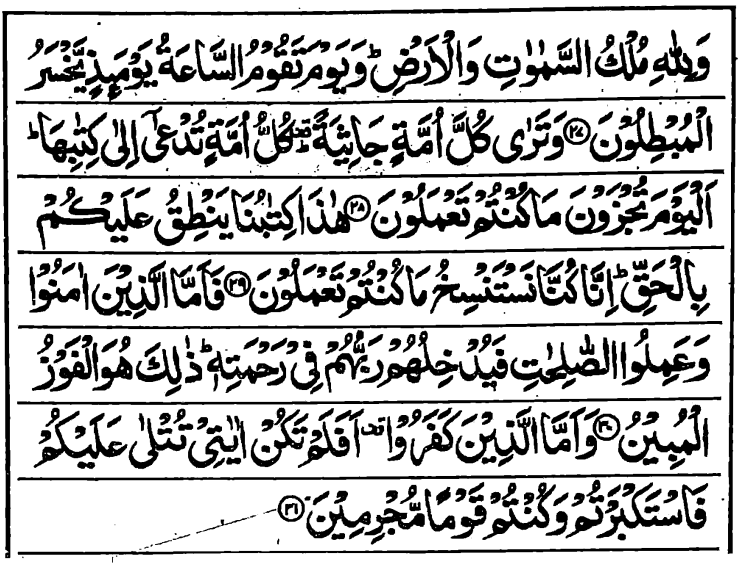
وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ
الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ؕ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ
اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ
بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۟ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ
فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾

তরজমা

(২৭) এবং আসমান জমিনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, আর যেদিন কেয়ামত হবে সেদিন মিথ্যা পরায়ণরা হবে সর্বস্বান্ত।

(২৮) (হে রসূল!) আপনি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবেন, ভয়ে নতজানু অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার নিজের আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে এবং বলা হবে, আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ফলই ভোগ করতে হবে।

(২৯) এটি আমার কিতাব, যা তোমাদের কার্যকলাপ ঠিক ঠিক বলে দেবে। নিশ্চয় আমি তোমাদের কৃতকর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম।

(৩০) তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের প্রতিপালক তাঁর রহমতের মধ্যে তাদেরকে দাখিল করবেন। এটিই বিরাট সাফল্য।

(৩১) আর যারা কাফের তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়নি? কিন্তু তোমরা তখন অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক মানুষকে জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যুমুখে পতিত করেন, আর তিনিই কেয়ামতের দিন তাদেরকে পুনর্জীবন দান

করবেন। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ পাক, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাঁর একচ্ছত্র কতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'আর আসমান জমীনের রাজত্ব বা মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই'।

নিখিল বিশ্বের প্রভূত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই

নিখিল বিশ্বের কতৃত্ব এবং প্রভূত্ব তাঁরই, এমনিভাবে কেয়ামতের দিনের আধিপত্যও একমাত্র আল্লাহ পাকেরই। তাঁর ইচ্ছা ও মর্জিকে কেউ বাধা দিতে পারেনা, যেমন সমগ্র বিশ্বের মানুষ একত্রিত হয়েও বাতাসের গতিকে পরিবর্তন করতে পারেনা, চন্দ্র-সূর্যের পরিভ্রমণকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনা, তেমনি আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটি ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়, কেউ বাধা দিতে পারেনা, কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাই পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করা এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকা। কিন্তু যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করে, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন বিধানকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, জেদ ও অহংকারের বশীভূত হয়ে আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণকে অমান্য করে, আসমানী গ্রন্থ সমূহকে অবিশ্বাস করে, কেয়ামতের দিন তারা তাদের পরিণতি দেখতে পাবে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ

যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন বাতিলপন্থীরা সর্বস্বান্ত হবে। সেদিন তারা হবে প্রকৃত সর্বহারা। তারা উপলব্ধি করবে যে, আসমান জমীনের একমাত্র মালিকানা আল্লাহ পাকেরই, দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে তাঁরই ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব। নাফরমানদের দুর্গতির দৃশ্য সেদিন দেখা যাবে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ۭ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবেন, ভয়ে নতজানু অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার নিজের আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে এবং বলা হবে, আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ফলই ভোগ করতে হবে'।

বস্তুতঃ যারা দুনিয়াতে কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে, তারা সেদিন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন হবে তাদের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক, প্রত্যেকেই ভয়ে নতজানু অবস্থায় থাকবে, সে সময় দোযখকে সম্মুখে আনা হবে, ঐ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সকলেই ভয়ে কম্পমান হবে এমনকি, হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ

(আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর কণ্ঠ থেকেও সেদিন 'নফসি' 'নফসি' আওয়াজ বের হতে থাকবে। তাঁরা বলতে থাকবেন, হে পরওয়ারদেগার! আজ আর কিছু চাইনা, শুধু তোমার দরবার থেকে নিজের নিরাপত্তা চাই।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "আমি যেন তোমাদেরকে দোযখের পার্শ্বে নতজানু অবস্থায় দেখছি"। আর একথাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا

'(হে রসূল!) আপনি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবেন, ভয়ে নতজানু অবস্থায় রয়েছে, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার নিজের আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে'। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ (সূরা কেয়ামাহ ঃ ১৩)

'(প্রত্যেকটি মানুষকে অবগত করানো হবে সে সম্পর্কে, যা কিছু সে পরকালের জন্যে প্রেরণ করেছে অথবা পেছনে রেখে এসেছে) তার জীবনের যাবতীয় কর্মের বিবরণ পাওয়া যাবে আমলনামায়'।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ..... (সূরা যুমার ঃ ৬৯)

(আর আমলনামা সম্মুখে রাখা হবে এবং নবীগণ ও সাক্ষীগণকে হাযির করা হবে) আর বলা হবে, আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেয়া হবে। তখন প্রত্যেকে একথা বলবে, হায়! আক্ষেপ এ কিতাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ছোট বড় কোন কিছুই ছাড়েনি যা কিছু তারা করেছিল, সবই তারা দেখতে পাবে। (হে রসূল!) আপনার পরওয়ারদেগার কারো প্রতি জুলুম করেন না'।

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ○ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ○ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ○ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ○ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۔

'আর নিশ্চয় তোমাদের জন্যে রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ, সম্মানিত লেখকবৃন্দ, তারা জানে তোমরা যা কিছু কর। নিশ্চয় নেককারগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে আর পাপীষ্ঠরা থাকবে দোযখে (সূরা ইনফিতার, আয়াত-১০-১৪)'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ফেরেশতাগণ বন্দাদের আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে আসমানে নিয়ে যান, আর ঐ আমলনামাকে ফেরেশতাগণ "লওহে মাহফুজে" সংরক্ষিত বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন যা বিশ্ব জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বস্তুতঃ এ কারণেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'এটি আমার কিতাব, যা তোমাদের কার্যকলাপ ঠিক ঠিক বলে দেবে। নিশ্চয় আমি তোমাদের কৃতকর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম'।

যদিও আল্লাহ পাকের জ্ঞানে সবই রয়েছে, কিন্তু মানুষ যেন অস্বীকার করতে না পারে, তাই মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডের বিবরণ ফেরেশতাদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়।

যেমন সূরা বনী ইসরাঈলে এরশাদ হয়েছেঃ

وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ۝ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۚ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا. (আয়াত ঃ ১৩-১৪)

'আর আমি কেয়ামতের দিন বের করবো এক কিতাব যা সে পাবে উম্মুক্ত, (তাকে বলা হবে) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্যে যথেষ্ট'।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন এমন একটি সময় আসবে, যা দশ বছর কাল দীর্ঘ হবে, এ সময় সমস্ত লোক নতজানু অবস্থায় থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক নবীর উম্মত তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে।

বায়হাকীতে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "সে দৃশ্যটি আমার সম্মুখে রয়েছে, যখন জাহান্নাম থেকে একটু দূরে "করম" নামক স্থানে আমি তোমাদেরকে একত্রিত দেখছি"। বর্ণনাকারী এরপর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

হাফেজ এবনে হাজার আসকালানী (রঃ) লিখেছেন, "করম" হলো সেই উচ্চ স্থান যেখানে উম্মতে মোহাম্মদিয়া একত্রিত হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সমস্ত আমলনামা আরশের নীচে একত্রিত করা হবে, যখন হিসাবের সময় আসবে তখন একটি বায়ু প্রবাহিত হবে, যা প্রত্যেকের আমলনামাকে তার ডান বা বাম হস্তে পৌঁছে দেবে। আর আমলনামায় সর্ব প্রথম লিপিবদ্ধ থাকবে এ আয়াতখানিঃ

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۚ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا. (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৪)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ

তবে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং সেই ঈমান মোতাবেক নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে তার রহমতের মধ্যে তথা বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। আর এটিই হলো সুস্পষ্ট সাফল্য-তথা মহা সাফল্য।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ

পক্ষান্তরে, যারা দুনিয়াতে কাফের অবস্থায় জীবন-যাপন করে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়নি? তোমাদেরকে কি ঈমান আনয়নের জন্যে আহ্বান করা হয়নি? অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু তোমরা তা গ্রহণ করোনি, কেননা তোমরা ছিলে অহংকারী, তোমাদের অহংকারই সরল সঠিক পথ গ্রহণে তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিল, আদতেই তোমরা ছিলে পাপীষ্ঠ, তোমাদের দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুফরী ও নাফরমানী প্রবেশ করেছিল, তাই তোমাদের শাস্তি অনিবার্য।

وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ
اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا
عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَقِيْلَ الْيَوْمَ
نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ
مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾
فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾
وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩২) আর যখন বলা হয়, নিশ্চয় আল্লাহ পাকের ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই, তখন তোমরা বলেছ, কেয়ামত কি? তা আমরা জানিনা, আমরা মনে করি, এটি নিছক একটি ধারণা মাত্র, আর এর উপর আমাদের বিশ্বাস হয় না।

(৩৩) আর তাদের নিকট তাদের মন্দ কাজগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর যে আযাব সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে।

(৩৪) আর তাদেরকে বলা হবে, যেভাবে তোমরা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে, ঠিক তেমনি আমি তোমাদেরকে ভুলে থাকব। এবং তোমাদের আবাস-স্থল হলো দোযখ, আর তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

(৩৫) এ শাস্তি এজন্যে যে, তোমরা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের প্রতি বিদ্রুপ করেছিলে এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল, অতএব আজ তাদেরকে দোযখ থেকে বের করা হবেনা এবং তাদেরকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করার সুযোগ দেয়া হবে না।

(৩৬) অতএব, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যেই, যিনি আসমান সমূহ ও জমীনের প্রতিপালক এবং যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক।

(৩৭) আর তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং রাজত্ব আসমান জমীনে এবং তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনি মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অহংকার এবং পাপাচারের উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াতেও তাদের অন্যায়-অনাচারেরই বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ

আর যখন কাফেরদেরকে বলা হয় যে, আখেরাতে নেক আমলের সওয়াব দেয়া হবে এবং মন্দ কাজের জন্যে আযাব হবে। এটি আল্লাহ পাকের ওয়াদা আর এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে, কিন্তু তখন কাফেররা তা মানত না এবং কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে বলা হবে, দুনিয়াতে তোমরা বলেছ, কেয়ামত কি তা আমরা জানিনা, আমরা মনে করি এটি নিছক একটি ধারণা মাত্র।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

কেয়ামতের কঠিন দিনে কাফেরদের মন্দ কর্মকান্ড তাদের সম্মুখে প্রকাশ পাবে, দুনিয়াতে যা তারা করেছে, তা কত নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য ছিল তা তাদের নিকট আর

গোপন থাকবে না, এতদ্ব্যতীত কেয়ামতের দিনের যে আযাবকে তারা বিদ্রুপ করতো সে আযাব তাদের প্রতি আপতিত হবে, তখন তারা দুনিয়ার জীবনে যে অপরাধ করেছিল তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

'আর তাদেরকে বলা হবে, যেভাবে তোমরা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে ঠিক তেমনি আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে থাকব। তার তোমাদের আবাস-স্থল হলো দোযখ এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।'

কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা

অর্থাৎ কাফের মুশরেকদেরকে সেদিন বলা হবে, দুনিয়ার জীবনে কেয়ামতের দিনের কথা বললে তোমরা তার প্রতি বিদ্রুপ করতে, এমনকি তোমরা কখনও একথা স্মরণ করোনি যে, অবশেষে তোমাদেরকে একদিন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে, জীবনের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হয়ে তোমরা কেয়ামতের দিনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলে। যেভাবে সেদিন তোমরা এ সত্যকে ভুলে গিয়েছিলে, ঠিক তেমনি আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে থাকব, আর তোমাদের কোন সাহায্যকারীও নেই যে তোমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার জন্যে সাহায্য করতে পারে।

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তাঁর বন্দাদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করবেনঃ আমি কি দুনিয়াতে তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করিনি? আমি কি তোমাদের জন্যে উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতিকে অনুগত করে দেইনি? আমি কি তোমাদের জন্যে তোমাদের বাড়ী-ঘরে আরাম-আয়েশে জীবন-যাপনের সুযোগ দান করিনি? তখন বন্দারা আরজ করবে, অবশ্যই হে পরওয়ারদেগার! ঐ সমস্ত কিছু তোমার নেয়ামতই ছিল, যা আমরা ভোগ করেছি, এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, যেভাবে দুনিয়াতে তোমরা আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, আজ আমি তোমাদেরকে সেভাবে ভুলে থাকব।[১]

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে যে, তাদের আবাস-স্থল হবে দোযখ, আর এ আয়াতে তাদেরকে এ শাস্তি প্রদানের কারণ বর্ণনা করা হয়েছেঃ

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৫, পৃষ্ঠা-৬৮

অর্থাৎ কাফেরদেরকে দোযখের শাস্তি এজন্যে দেয়া হবে যে, তারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের প্রতি বিদ্রুপ করেছিল এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল। তারা ভেবেছিল, দুনিয়ার জীবন চিরদিন ভোগ করবে, কখনও তাদেরকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির করা হবেনা, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের সে জীবনের অবসান ঘটেছে এবং আখেরাতের এ জীবনে তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর তা হলো দোযখের শাস্তি। আর এ শাস্তি থেকে তারা কখনো রেহাই পাবেনা এবং তওবা করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদেরকে দেয়া হবে না।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মৃত্যুর পর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের কোন সুযোগ থাকবে না। কেননা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ নির্ভর করছে ঈমান ও নেক আমলের উপর, আর মৃত্যুর মাধ্যমে আমলের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তাই আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার কোন পথ খোলা থাকবে না।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অতএব, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আসমান জমীনের প্রতিপালক, আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু লাভ করেছে অস্তিত্ব, তাঁরই আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, আর তিনিই নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক, অতএব সমস্ত প্রশংসা শুধু এক আল্লাহ পাকের জন্যেই। বন্দা মাত্রেরই কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁর বন্দেগীতে মশগুল থাকা।

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আর তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং রাজত্ব আসমান জমীনে, একমাত্র তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। অহংকার শুধু তাঁরই সাজে, আর কারো নয় এবং তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই সর্বত্র বিরাজমান, তিনিই মহাজ্ঞানী, তিনিই প্রজ্ঞাময়, তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অতএব, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২রা জুন ১৯৯৬ মোতাবেক ১০ আষাঢ় ১৪০৩, ৬ সফর ১৪১৭ হিঃ রোববার রাত ১১.০০ টাকায় তফসীরে নূরুল কোরআনের ২৫তম খন্ডের রচনা সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর অধমের এ সাধনা, পবিত্র কোরআনের আলো বিকিরণের তৌফিক দান কর, তফসীরে নূরুল কোরআনকে কবুল কর এবং সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, হে আল্লাহ! সকল ভুল-ত্রুটি, যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিও, আমাদের সকলের প্রতি রহমত নাযিল কর। তোমার শোকর গুজারীর তওফিক দান কর। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين